সহমরণ।

(উপন্যাস)

শ্রীসত্যচরণ মিত্র।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

সহমরণ।

ধর্ম্মোপন্যাস।

শ্রীসত্যচরণ মিত্র প্রণীত।

(সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত।)

মন গরিবের কি দোষ আছে ?
তুমি বাজীকরের মেয়ে গো শ্যামা !
যেমনি নাচাও তেমনি নাচে।
—রামপ্রসাদ।

(তৃতীয় সংস্করণ।)

কলিকাতা।

বরাহনগর পালপাড়া "হিন্দু-সৎকর্ম্মমালা" যন্ত্রে
শ্রীকুঞ্জবিহারী দত্ত দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০৬ সাল। মাঘ।

মূল্য এক টাকা মাত্র।

সহমরণ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

হুগলির নিকট মহেশপুর গ্রাম! হুগলি হইতে একটী লাল সুরকির রাস্তা, মানুষ, গরু, ঘোড়া, গাড়ি প্রভৃতির পদচিহ্নে পরিপূর্ণ হইয়া উক্ত গ্রাম অতিক্রম করিয়াছে। লাল রাস্তার দুধারে বাবলা গাছের সারি,—মাঝে মাঝে দুই একটা খেজুর ও শিমুল গাছ আছে। রাস্তার দুই পার্শ্বে সবুজ ঘাসের আচ্ছাদন, রাস্তার লাল রং মাখিয়া রহিয়াছে। সেই আচ্ছাদনে বাবলা ও খেজুর গাছের নিকটে—দূরে দুই একখানা ভাঙা লাল বা আধ কাল ইট লাল ধুলায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়া আছে। রাস্তার দুধারে বাবলা গাছের কাছে কোথায় বা একটা খেজুরের চারা কোথায় বা একটা আকন্দর ঝাড় রাস্তার রাঙাধুলা মাখিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কোথায় বা বাবলা বা খেজুর গাছের গোড়ার কাছে উইএর ঢিপি মাথা তুলিয়াছে। কোথায় বা বাবলা বা খেজুর গাছের গোড়ার কিয়দংশ উইএর মাটীতে আচ্ছন্ন হওয়ায় বোধ হইতেছে, যেন গাছটা রাস্তার ধুলার ভয়ে একটা মাটীর কারিকুরিকরা জামা পরিয়াছে। কোন কোন গাছের ডাল

অবলম্বনে মাকড়সা বড় জাল বুনিয়াছে। কোথায় বাবলার ডালে বসিয়া ফিঙা পুচ্ছ নাড়িতেছে; কোথায় কাক গম্ভীর ভাবে গলা ফুলাইয়া ক্ক ক্ক শব্দে ডাকিতেছে। কোথায় বা দয়েল ফুড়ুৎ করিয়া উড়িয়া গেল; কোথায় বা একটা গাছের পল্লব খসিয়া পড়িল। মাথার উপরে আকাশে পাখী উড়িতেছে, মাঠে জলা-শয়ে পানকৌড়ি ডুব দিতেছে, দূরে বনে ঘুঘু ডাকিতেছে। পথে ঘোড়ার গাড়ী ধুলিরাশি উড়াইয়া দ্রুত ছুটিতেছে—গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান গরুকে চৌদ্দ পুরুষান্ত করিয়া চাবুক মারিতেছে—গরুর গাড়ী মাঝে মাঝে বাঁশীর মত শব্দটীকে সাধিতে সাধিতে গম্ভীর ভাবে চলিতেছে। কোন হিন্দুস্থানি দরোয়ান আঁটু পর্য্যন্ত ধুলার মোজা পরিয়া, নাগরা জুতার মস্ মস্ শব্দ করিতে করিতে লাঠী ঘাড়ে করিয়া হিন্দী ভজন গাইতে গাইতে চলিয়াছে। কোন খানে তিন চারিজন কাবুলি একত্রে পৈশাচিক ভাষায় বকিতে বকিতে চলিয়াছে। অন্যান্য পথিক সকল নানা বেশে নানা ভঙ্গিমায় যাতায়াত করিতেছে। হয়তঃ একটা কুকুর ঊর্দ্ধ-লাঙ্গুলে পথে ছুটিতেছে—অথবা একটা নেউল সড়াৎ করিয়া পথ পার হইয়া মাঠে নামিয়া গেল।

গ্রামের ভিতরে রাস্তার বাম দিকে একটী বড় ডোবা। সেই ডোবার ধারে কয়খানি মাটির দেওয়ালঘেরা বাড়ী—সেই দেও-য়াল ঘুটের গহনা পরিয়াছে—কোনখানে সারি সারি ঘুটে—মাঝে মাঝে ঘুটে নাই—ঘুটের দাগ মাত্র আছে। সেই বাড়ী কয়টির চারিদিকে বড় মাঝারি ছোট নারিকেল গাছ—ডোবার একটী ঘাটের ধারে একটি বড় পাঁশগাদা—সেই গাদার পাশে একটি বড় কাঁঠাল গাছ—তার তলায় ভাঙ্গা হাঁড়ি কলসী বাড়ীর

আবর্জ্জনা রাশি। সেই ডোবা অতিক্রম করিলে একটি মেটে রাস্তা। রাস্তার দুধারে মেটে ঘর—খানিকটা ক্ষুদ্র বৃক্ষসমাচ্ছন্ন বন. পরেই একটি মৃত্তিকাময়ী বাটি ;—এইরূপে সেই রাস্তাটি ক্ষুদ্রায়াতন বন ও মৃত্তিকাময়ী বাটি দুধারে ধরিয়া মৃতভাবে পড়িয়া আছে।

গ্রামের মাঝখানে সেই সুরকির বড় রাস্তা। তাহার উপর দিয়া দিবারাত্রি মানুষ, গরু, গাড়ি, ঘোড়া যাতায়াত করিতেছে। গভীর নিশীথসময়েও সেই রাস্তায় গরুর গাড়ির চাকার ভিতর হইতে কতকটা বাঁশীর মত শব্দ শুনা যায়। সেই রাস্তার ধারে মহেশপুরের বাজার। কয়েকখানি মুদির—কয়েক খানি ময়রার ও একখানি কামারের দোকান ঘর সেই পাকা রাস্তার ধারে বহু কাল ধরিয়া অবস্থিত রহিয়াছে। কর্ম্মকারের দোকানে হাতুড়ির ঢিপ ঢিপ শব্দ রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিক্ষিপ্ত করিয়া এবং হাপরের শোঁ শোঁ রব অগ্নি রাশিকে রুদ্রমূর্ত্তিতে লৌহ নরম করাইয়া পরিশ্রমের একটা উত্তেজক কাহিনী গাহিতে থাকে। গ্রামের অনেক লোক সেই দোকানে বসিয়া তামাকু খায়—গল্প করে—হাসির রোলে কর্ম্মকারের পরিশ্রান্ত মনে অমৃত সঞ্চার করিয়া থাকে।

পাকা রাস্তার উত্তর দিকে ফুলবাগানবিশিষ্ট একটি বৃহৎ কোটা বাড়ী; মাঠ হইতে তাহার সাদা চিলের ছাদ দেখা যায়। বাড়ীর চারি দিকে ইটের প্রাচীর। প্রাচীরের গায়ে মাঝে মাঝে ঘাস গজাইয়াছে—শেহলা ধরিয়াছে—গোড়ায় আগাছা জন্মিয়াছে—মাথায় স্থানে স্থানে অশ্বত্থ বট ও শিমুলের চারা মাথা তুলিয়াছে। বাড়ীর সম্মুখে একদিকে ফুলের বাগান—তাহাতে জবা বেল জুই করবী প্রভৃতির ঝাড় অতি সতেজভাবে শোভা

চালিতেছে। অন্য দিকে লম্বা লম্বা সারিবাঁধা সুপারি গাছ, এক স্থানে কয়েকটি লিচু গাছ—কলমের আম গাছ। বাগানের একটী কোণে বাটির আবর্জ্জনা রাশি—তাহার উপরে একটা শেহলা ধরা কাঠ পড়িয়া আছে। এই বাড়ী হইতে কিয়দ্দূর উত্তরে মাঠের ধারে বড় দীঘি। সেই দীঘি গ্রামের চৌদ্দ পুরুষকে স্নিগ্ধ করিয়া আসিতেছে। স্বচ্ছ সলিল পদ্ম পাতায় ও পদ্ম ফুলে অলঙ্কৃত। দীঘির উচ্চ উচ্চ পাড়। পাড়ে মাঝে মাঝে অশ্বত্থ বটবৃক্ষ সকল আপনাদের বিশাল শাখা বিস্তার করিয়া নানা পক্ষীর আশ্রয়রূপে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। পাড়ে মাঝে মাঝে বেল খেজুর তাল ও ছাতিমাদি বৃক্ষ আছে। একটি পাড়ের একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের কাছে একটি বড় কেয়াবন আছে। বর্ষায় সেই বনে কেয়া ফুল ফুটিয়া চারিদিক গন্ধে আমোদিত করে। সাপ, বেঙ, উইচিঙ্গড়া ও নানাবিধ কীট পতঙ্গ সেই বনে বাস করে। পুকুরে পদ্ম ফুল ফুটে বলিয়া উহার নাম “পদ্মদীঘি।” নিকট ও দূর হইতে, অনেক লোক পদ্ম ও কেয়া ফুল তুলিবার জন্য সেই পুকুরে আনন্দের সহিত আসিয়া পুষ্প চয়ন করে। মহেশপুর ও নিকটবর্ত্তী কয়েকখানি গ্রামের দেবদেবীমূর্ত্তি সেই পদ্মদীঘির গভীর জলে বিসর্জ্জিত হয়। গ্রামের লোক সেই দীঘির জল পান করে—সেই জলে অবগাহন করিয়া মনের সুখে স্নান করে—দীঘির এক কোণে ধোপা হুস্ হুস্ শব্দে কাপড় আছড়াইয়া থাকে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

জ্যৈষ্ঠ মাস। বেলা প্রায় তৃতীয় প্রহর। ভীম রৌদ্র। মাঠে আকাশ বিশ্বের স্রোত হন্ হন্ ছুটিয়া জগতের মায়ার চিত্র দেখা ইতেছে। সূর্য্য ভীষণ মূর্ত্তিতে ভীষণ উত্তাপে পৃথিবীকে শুষ্ক করিতেছে। বায়ু সে উত্তাপস্পর্শ অসহ্য বোধে আপনার চাঞ্চল্য বৃক্ষপত্রসঞ্চালনে, সরোবরের সলিলান্দোলনে কক্ষ বিশেষে রমণীর অলকরাশির দোলনে প্রকাশ করিতেছে। মানুষের গা দিয়া পঞ্চনদী বহিতেছে। প্রকৃতি বহু ক্লেশে সেই রবিযৌবনের ভার সহিতেছে। গ্রামবাসীদিগের অনেকেই ঘরের কবাট বন্ধ করিয়া বিছানায় শুইয়াছে। কেহ পাখার বাতাস খাইতেছে—কেহ ছট্‌ফট্ করিতেছে—কেহ গা চুলকাইতেছে। কেহ বিছানায় শুইয়া পুথি পড়িতেছে, প্রণয়িণী কাছে বসিয়া বাতাস করিতে করিতে তাহা শুনিতেছে। কোন বৃদ্ধা ঘরের ছায়ায় বসিয়া শিকা বুনিতেছে—কোন রমণী পা মেলিয়া কাপড় শিঙাইতেছে—কোন যুবতী আসির সম্মুখে বসিয়া নির্জ্জনে আদুড় গায়ে আদুড় সৌন্দর্য্যে এক হাতে চুলের কৃষ্ণরূপরাশি ধরিয়া অন্য হাতে চিরুণী লইয়া মাথায় তাহা সঞ্চালন করিতেছে; কোথায় বা কোন রমনী একপাশে শুইয়া পাখা নাড়িয়া ছেলেকে স্তন্য দান করিতে করিতে নিদ্রাকর্ষিতা হইতেছে। রান্না ঘরে যো পাইয়া বিড়াল কড়ার ঢাকা খুলিয়া দুধ খাইতেছে—কোথায় বা মাছের হাঁড়ি হইতে মাছ জয় করিতেছে; কোনরান্না

ঘর হইতে কুকুর বাড়ীর গৃহিণীর তাড়া পাইয়া চমকিত প্রাণে হাঁড়ির অর্দ্ধভুক্ত অন্নরাশি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া অতৃপ্ত মনে পলায়ন করিতেছে। কোথায় বা বালক বালিকা সকল রৌদ্রে রুদ্র মুর্ত্তিতে আম পাড়িয়া খাইতেছে—দুই একটি স্ত্রীলোক খিড়কী পুকুরে একটু ছায়ায় বসিয়া বাসন মাজিতেছে। কোথায় বা রমণীগণ ঘরের ভিতরে তাস খেলিতেছে—কাছে বসিয়া কোন বালিকা দেখিয়া শিখিতেছে—কোন যুবতী ঘোমটার ভিতর হইতে শাশুড়ীকে খেলায় সামলাইয়া দিতেছে। কোন বুড়ি শুইয়াছে—নাতিনী পাকা চুল উপড়াইতেছে—কোন বুড়া বৈঠকখানায় তাকিয়া ঠেস দিয়া শুইয়া তামাকু খাইতে খাইতে ঢুলিতেছে ও মাঝে মাঝে নাসিকাধ্বনি করিতেছে। আর সেই নাসিকাধ্বনি শুনিয়া বৈঠকখানার কোণে একটা বিড়াল তাহার দৃষ্টিস্থিত শীকারে লাফাইয়া পড়িতে বড়ই শঙ্কিত হইতেছে—বড়ই বাধা পাইতেছে।

এরূপ সময়ে পদ্মদীঘির তীরে দুটি যুবা গাছের আড়ালে কি করিতেছিল? এক জনের বয়স পঁচিশ। এক হারা, ছিপ্‌ছিপে, লম্বা লম্বা হাত পা। পা দুটাকে পা না বলিয়া ঠ্যাং বলিলেই ঠিক হয়। লম্বা লম্বা সরু সরু হাত পার আঙ্গুল। ক্ষুদ্র কোটরের মত দুটি মিটমিটে চক্ষু। তাহাদের উপরে পাতলা চুলযুক্ত ভ্রূদুটি অস্পষ্টভাবে যেন কালের দুটা অস্পষ্ট পদচিহ্নের মত তেজোহীন ভাবে কুদৃষ্টির উৎপাত সহিতে সহিতে লোপ পাইবার মত হইয়াছে। নাকটি লম্বা—ব্রণজ ক্ষুদ্রছিদ্রে পূর্ণ—ভিতরে পিপীলিকা বাস করিলেও করিতে পারে। কপাল অতি ক্ষুদ্র—বানরের মত। মাথার চুল পাতলা, চিরুণী দিয়া আঁচড়ান

আঁচড়ান চুলের কোলে কোলে মরা উকুনের শুষ্ক দেহ সংলগ্ন রহিয়াছে। যুবা আপনার সর্প সদৃশ দেহখানি বটবৃক্ষের একটি হেলান ডালে রক্ষা করিয়া বাঁকা ভাবে দাঁড়াইয়া আছে।

অপরটির বয়স তদনুরূপ। কিন্তু তাহাতে শ্রীছাঁদ আছে। সুপুরুষ। শরীর সুগঠিত। মুখ চোক ভদ্র সন্তানের উপযুক্ত। সে দেহে ভক্তি পুণ্য বাস করিলেই শোভা পায় কিন্তু এখন সেটী কুচিন্তায় সতত পরিপূর্ণ। দুটি চক্ষুর কোল সর্ব্বদা অবনত—কাল দাগ যুক্ত। একটা উন্মাদক ভীষণ জ্যোতি সর্ব্বদা কামাগ্নি প্রকাশ করিতেছে। চোখের জ্যোতিতে রমণীরূপতৃষ্ণা ধক্ ধক্ জ্বলিতেছে। চাহনি, চলন ও কথোপকথনে অশ্লীলতার তেজ সর্ব্বদাই ফুটিতেছে।

প্রথমের নাম ধীরেন্দ্র। দ্বিতীয়ের নাম অনুপম। ধীরেন্দ্র ডুবিয়া জল খায়—ভাল ছেলেকে মজায়। নিজে সাবধানে থাকে। গাছে তুলিয়া দিয়া মই কাড়িয়া লয়।

অনুপম মা বাপের সবে ধন নীলমণি। বাপের টাকা কড়ি আছে। ধীরেনের সঙ্গে পাঠশালা হইতে সে সহপাঠী। এণ্ট্রান্স ক্লাসে উঠিয়া ধীরেন্দ্রের সঙ্গে পড়া শুনায় ইস্তবা দিয়া বিদ্যা-সুন্দর মুখস্থ করে, থিয়েটারের গান গাহে। ছড়ি হাতে, বুট পায়ে, এলবার্ট টেড়ির বাহারে, আতর পমেটমের গন্ধে যৌবন লীলা ভোরপুর গুলজার করিয়া যৌবনমদে উন্মত্ত। কাহাকেও মানে না ডরে না। আপনার খেয়ালে—গরবে—হামমস্ত হইয়া চুরুট টানিয়া জগৎটাকে সারহীন করিবার প্রয়াস পায়। অনু-পমের এতটা বিকৃতি ধীরেন্দ্রের কুসংসর্গে। তাহা ক্রমশঃ বাড়ীতে থাকে।

পাপিষ্ঠ ধীরেন্দ্র পাপদৃষ্টিতে পাপাগ্নি বিকীর্ণ করিয়া সেই শান্তি পুণ্যময় বনভূমিকে কলঙ্কিত করিয়া একটি হেলা ডালে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। আর অনুপম, হেলা ডালের তলায়, ঘাস বনে, কাপড়ের খুঁট পাতিয়া বসিয়া, ধীরেন্দ্রের মুখের দিকে তাকাইয়া ধীরেন্দ্রের কথা শুনিতেছে।

তাহাদের কত কথা হইল। নরকের কত অগ্নি শিখা, নীচ-তার কত দুর্গন্ধ, ব্যভিচারের কত ঝঙ্কার,তাহাদের কথায়, হাস্যে, আমোদে পরিব্যক্ত হইল। সকল কথা লিখিব না, লিখিতে লজ্জা করে। শেষ কথা কয়টি লিখিলাম।

ধীরেন্দ্র বলিল--"কাল সন্ধ্যার পূর্ব্বে আমি বাগানে বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছি। গায় কাপড় ছিল না—নির্ল্লজ্জভাবে বসিয়া কি ভাবিতেছিল—কখন মুচকিয়া হাসিতেছিল। ধরণ দেখিলে বোধ হয় যৌবনভারে অভিভূতা—স্বামী না কাছে থাকিলে যুবতীর যা হয় তাই হ'য়েছে।"

অনুপম কহিল—নিকুঞ্জ ত নিরুদ্দেশ নয়। চিঠিপত্র লেখে তোকে, তুই তার পরম বন্ধু, তার ভাব গতিক কি রকম ভাবিস্। শুনি তার সেখানে একটি আছে, সেটিকে পেয়ে ভুলে গেছে। সে আর দেশে আসবে না।

ধী। আসুক আর নাই আসুক—তাতে কি? কাদম্বিনীর যে রকম ভাব গতিক দেখছি—তাতে বোধ হয়, বড় ভাল নয়।

অ। কেউ কি—ওকে—ধরেছে নাকি?—

ধী। না, ধরেনি—ধরার যোগাড় ক'রলেই হয়।

অ। অমন রূপের ছটা, আমাদের ভাগ্যে জোটা,
শতজন্ম তপস্যার ফলে যদি হ'য়রে।

ধী। আমোদে যে ছড়া ধ'র্‌লি—সেও খুব ছড়া জানে।

অ। তবে ছড়ায় আলাপচারি ক'র্‌বো।

ধী। পার্‌বি?

অ। ছড়ারূপ চারে, ফেলিয়া তাহারে,
দৃষ্টি বড়শীতে গাঁথিব।

ধী। তার পর ক্রমে ক্রমে হৃদাসনে বসাব।

অ। সেই ফুল্ল শতদলে, প্রবেশিয়া কলে বলে
অনুপম স্বর্গসুধা একা পান করিবে।

ধী। অবশেষে মধুচক্রে ধনে প্রাণে মজিবে।

অ। ওসব রহস্য ছাড়—এখন আসল কথা বল। কি প্রকারে বাগান যায়।

ধী। তবে রোস একটু ভাবি।

ধীরেন্দ্র কিছুক্ষণ ভাবিয়া বলিল, "হয়েছে—আজ সন্ধ্যার সময় এই পুকুরের ঘাটে একলা জল ল'তে আসবে, সেই সময়ে তার অঙ্গ ভঙ্গিমাটী তোকে দেখাব। দেখ্‌লে বুঝ্‌তে পারিবি, তার মনের ধরণটাই বা কি প্রকার দাঁড়য়েছে।"

অ। সন্ধ্যার সময় আস্‌বে না, বিকালে আস্‌বে?

ধী। তা যখনি আসুক—একটু পরিশ্রম ক'ত্তে হবে।

অ। যতন নহিলে কোথা মিলয়ে রতন,
একা যাব বর্দ্ধমান করিয়ে যতন,
যতন নহিলে কোথা মিলয়ে রতন।

ধী। কিন্তু একটি ভয় হয়—যদি আমাদের আঁচে ভুল হয়।

অ। আচ্ছা দেখ্‌লেই বুঝতে পার্‌বো—আমি দেখেছি, তবে ভালক'রে নয়।

ধী। তবে তোর গোজন্ম। যাক্। এখন আমরা এক কাজ করি আয়। ঝোঁপের আড়ালে চ; সব দেখ্‌বো এখন।

অ। দেখিব হৃদয় ভ'রে—প্রণয়ের মজাদার,

রমণীর রূপশোভা,—যুবকের পাঠাগার।

ধী। তোর কবিতা রাখ। তোর চেয়ে সে ভাল কবিতা জানে—তোর পরের জিনিস মুখস্থ, তার নিজের রচিত।

অ। আচ্ছা, তাই চ—একটু গোনে গাছের ঝোঁপেই চ।

ধী। ভয় নাই।

অ। ভয় কি? যে ডরে সে মূঢ়।

অবশেষে দুই জনে সেই স্থান পরিত্যাগ করিল। ঝোঁপের আড়ালে বসিয়া আবার গুজ গুজ করিতে থাকিল। সেই "গুজ গুজুনিতে" অশ্লীলতার স্রোত বহিল।

পাপিষ্ঠদিগের কথোপকথন, সেই বনদেশে বৃক্ষ সকল, ছায়া সকল শুনিতে শুনিতে আপনাদের অবয়ব সঞ্চালনে 'না' 'না' বলিয়া নিষেধ করিয়াছিল। অদূরে একটি উইঢিপির ধারে—খেঁজুর তলে একটি নেউল উঁকি মারিয়া, মিটি মিটি দেখিতে দেখিতে, লোমভরা মোটা লেজ নাড়িয়া প্রতিবাদ করিতেছিল। নিকটে একটি বাঁশ ঝাড় কড় কড় শব্দে তাহাদিগকে বাড়াবাড়ি করিতে নিষেধ করিল। কিন্তু তাহারা উহা শুনিল না—প্রবৃত্তির খরতর স্রোতে ভাসিয়া গেল। একটা ভয়ানক প্রতিজ্ঞা করিয়া একটি রমণীর অপেক্ষা করিতে থাকিল;—কোন রমণীর সতীত্ব নাশের মন্ত্রণা করিয়া, রমণীর আগমনপ্রতীক্ষায় পুকুরের ঘাটের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল। মাঝে মাঝে বুক ঢিপ ঢিপ করিয়া

ছিল—হৃদয়ে শঙ্কার সঞ্চার হইয়াছিল কিন্তু তাহারা প্রবৃত্তির লৌহ-গ্রাস অতিক্রম করিতে পারে নাই।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সূর্য্য আকাশে চলিতে চলিতে দূরস্থ বৃক্ষ-প্রাচীরের শিরোদেশে সহস্র-রশ্মি বিস্তারে ঘোরতম রক্তবর্ণ প্রকাশ করিল। তখন সে দিকের আকাশে কে যেন সিঁদুর মাখাইয়া দিল। লম্বা লম্বা সিঁদুরে মেঘের সারি সকল অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিল; যেন সময়ের স্রোতে অথবা আকাশের নীল সাগরে রাঙা চড়া দেখা দিল। সেই লাল মেঘমালার মাঝে মাঝে কাল মেঘের লম্বা লম্বা রেখা সকল প্রকাশিত হইল। কখন সে ক্রাল রেখা একটু একটু প্রশস্ত হইতে লাগিল—প্রশস্ত হইয়া সময়ে সময়ে জন্তু বিশেষের আকৃতি ধারণ করিতে থাকিল। তখন বাতাস মৃদু মন্দ বহিতেছে—পাপিয়া মিষ্টতার তীব্রতর স্বরের উপর স্বর তুলিয়া হৃদয়ের অমৃত ঢালিতেছে, আর আকাশ মাঠ জলাশয় সেই স্বরামৃতে ভরিয়া যাইতেছে। কোকিল প্রণয়ের প্রাণফাটা পঞ্চমে অরণ্যের নিরবতাকে ঘুমের ঘোর হইতে জাগাইতেছে—ঝোঁপের ভিতরের কলিটিকে ফুটাইতেছে—ফুলের সৌরভ সকলকে জগতে বহিবার জন্য উদ্দীপ্ত করিতেছে—আর বিরহের কোমল প্রণয়তারে আপনারই মত হৃদয়ভেদী ঝঙ্কারের প্রতিধ্বনি তুলিতেছে। চাতক আকাশের অদৃশ্য দেশ হইতে, মৃত

কবির মত অতীত দুঃখের মর্ম্মস্পর্শী সুরে জগতের হৃদয় প্রাণে কবিত্বের সুবিমল অমিয় ধারা ঢালিয়া দিতেছে। পদ্মদীঘির নির্ম্মল জলে তরঙ্গমালা নাচিতেছে। পুকুরের স্বচ্ছতার ভিতরে সূর্য্যের লাল রশ্মি সকল ভাঙিয়া ভাঙিয়া আবার যোড়া লাগিতেছে; জলের উপরে লাল সূর্য্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আভা সকল তরঙ্গ মালার মুখে মুখে সোণালীর মত চক্ মক্ করিতেছে। সরোবরের জল ও তল (যতদূর দেখা যায়) গাছ পালা ও আকাশের প্রতিবিম্ব সহিত হেলিয়া দুলিয়া নাচিতেছে।

পুষ্করিণীর সেই সায়ং শোভা রমণী-শোভায় ক্রমশঃ ফুটিতে লাগিল। ঘাটে প্রথমে এক জন, ক্রমে দুই জন, তিন জন, পাঁচজন অবশেষে বৃদ্ধা, যুবতী, বালক, বালিকায় ঘাট পুরিয়া গেল। কেহ ঘাটে কোমর বুড়াইয়া বসিল, কেহ ঝামা দিয়া, আলতা পরিবার জন্য, পা মাজিতে থাকিল, কেহ খানিকটা চকচকে বালি দিয়া ঘড়া ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া :মাজিতে লাগিল—আর সেই মার্জ্জিত ঘড়ার গায়ে সূর্য্যরশ্মি পড়িয়া চক্ মক্ করিতে লাগিল। কোন দিগম্বরী—নিস্তারিণী ·নাসামনি জলে দাঁড়াইয়া কোন হৈমবতীর অকারণ নিন্দা করিতে লাগিল। বালক বালিকারা দুপুরে মাতনের উত্তাপ নিবারণের জন্য জলে মাতামাতি আরম্ভ করিল, হাত পা ছুঁড়িয়া, ঘড়া বুকে দিয়া, টুব্‌টাব্ শব্দে চারিদিকে বৃষ্টি বর্ষণ করিতে থাকিল। সেই বিক্ষিপ্ত জলে কোন প্রৌঢ়ারমাথা ভিজিয়া, যাওয়ায় সে অলক্ষে বিকৃতমুখে যমালয় দর্শন করাইল। আর যমালয়দর্শনের কথার বিষে জ্বালাতন হইয়া কোন জননী রাগে ফুলিতে ফুলিতে সেই রাগের জ্বালাটা আপন দুষ্ট বালকের পৃষ্ঠে দারুণ চপেটাঘাতে ঝাড়িয়া ফেলিল। বালক সেই

আঘাতের লক্ষাজমুনিতে আড়ষ্ট হইয়া, চিলের মত চেঁচাইতে থাকিল। যুবতীগণ জলে গা বুড়াইয়া পদ্মফুলের মত ভাসিতে লাগিল। কেহবা গোলাপী ঠোঁটে জলের কুলকুচা করিতে লাগিল। যুবতীর চাঁদমুখের কুলকুচা-বিক্ষিপ্ত বারিবিন্দুতে সূর্য্য রাম-ধনু আঁকিয়া আঁকিয়া রমণীকে উপহার দিতে থাকিল। (পাঠক! যুবতীর চাঁদপানা মুখের বিক্ষিপ্ত বারিকণায় প্রতিফলিত ইন্দ্রধনুর অতুল শোভা দেখিয়াছ কি? না দেখিয়া থাক—দেখিবার উপায় না থাকে, মনে মনে একবার প্রাণ ভরিয়া সৌন্দর্য্যের উপর সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি দেখিয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিও)। কেহ গা রগড়াইয়া অঙ্গভঙ্গিমায় সৌন্দর্য্য-ভঙ্গিমা দেখাইল, কেহ গামছাদিয়া, কেহ বাঁআঙুলরূপী চাঁপার কলিদিয়া মুক্তার মত দাঁতগুলিকে মাজিতে থাকিল। কেহ কাপড় জলে ছড়াইয়া মৃণাল-ভুজ তালে তালে সঞ্চালিত করিয়া—আর সেই মধুর সঞ্চালনে স্বর্ণ-বলয়ে ঠুন্ ঠুন্ রুন্ রুন্ শব্দ তুলিয়া, তালে তালে কাপড় কাচিতে লাগিল। বারিবিস্তারিত বস্ত্রে বায়ুপ্রবেশ করায়, কাপড়ের কোন কোন স্থান ফুলিয়া ফুরে নূতন ফুলের মত ভাসিতে থাকিল। তারপর রমণীর আকর্ষণে অনেক পুরুষের মত ভুড়ভুড়ি কাটিতে কাটিতে রমণীর কোমল করে নিষ্পেষিত হইল, আবার রমণীকৃপায় প্রসারিত হইয়া রমণীদেহকে আচ্ছন্ন করিল। সেই আর্দ্র বস্ত্র রমণী-সৌন্দর্য্যে লিপ্ত অলিপ্ত থাকিয়া, পাতলা মেঘের আড়ালে চাঁদের মত সুন্দরীর সৌন্দর্য্যকে সুন্দরতররূপে প্রকাশ করিল। রমণীগণ সেইরূপে ধীরে ধীরে ঘড়া কাঁকে করিয়া, একটু বাঁকা সৌন্দর্য্যে, পথে পদাঙ্ক আঁকিতে আঁকিতে গৃহপ্রত্যাগমন করিতে থাকিল।

পাপিষ্ঠ দুই জন, আড়াল হইতে সমুদয় দেখিতেছিল। তাহাদের মনে, হৃদয়ে, রক্তে ও মস্তিষ্কে নরকাগ্নি ফুটিতেছিল। ঘাট শূন্য করিয়া স্ত্রীলোকেরা চলিয়া গেল। সূর্য্য ডুবু ডুবু হইল—বাতাস নরম হইল। রৌদ্র আর কোথাও নাই বলিলেই হয়; কেবল নারিকেল তাল ও বাঁস গাছের ডগায় ও চিলের ছাদে সোণার রোদ অতি অল্পই ঝিক্ মিক্ করিতেছে। মাঠে, গাছ পালার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ছায়ার মাঝে মাঝে, রোদের তরল আভা-মাত্র ঝিক্ মিক্ করিতেছে,—তাহাও আর থাকে না, দেখিতে দেখিতে ধরা একবারে রৌদ্রহীন হইল। পদ্মদীঘির স্বচ্ছ জলের ভিতরে গাছ পালার ছায়া সকল গম্ভীর ভাব ধরিতে লাগিল। এমন সময়ে পদ্মদীঘির সেই ঘাটে একটি অসামান্যরূপা যুবতী ধীরে ধীরে সরল নিম্নদৃষ্টিতে গম্ভীর ভাবে আসিয়া উপস্থিত হইল। যেন সন্ধ্যা রমণীবেশে সেইখানে অবতীর্ণ হইল। রমণীর যুবতী-দেহ ঘৃতকুমারীর মত নধর। সেই নধর যৌবনে অসামান্য রূপ। যুবতীর চলনে গাম্ভীর্য্য, অঙ্গসঞ্চালনে পবিত্রতা, চক্ষে সতীত্ব, বাহুতে সেবা, মাথায় ভক্তি, হৃদয়ে প্রেম। সে মূর্ত্তি সেই সন্ধ্যার আকাশে শোভা পাইবারই উপযুক্ত।

পাপিষ্ঠদ্বয় সে মূর্ত্তি দেখিল। দেখিবামাত্র তাহাদের বুক ভয়ে কাঁপিল—মুখ বিষাদে আচ্ছন্ন হইল। সতীমূর্ত্তি দেখিলে কোন পাপিষ্ঠের প্রাণে ভয়ের সঞ্চার না হয়? দুজনে ভয়ে বিষাদে কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিল—দুজনে মুখ-চাওয়া-চায়ি করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে অনুপম বলিল;—

সাদা চোখে হবে না। আমি বারবার বলে আসছি সাদা চোখে কখনই হবে না।

ধী। বেটা কি যাদু জানে!

অ। আড়ালে মনটা কেমন পাগল হয়, আর ওর সামনে গেলেই মনটা মুচড়ে যায়। বুক টিপ টিপ করে।

ধী। বেটী যাদু জানে। আমারও বুক টিপ টিপ করে।

অ। গেরুয়া পরেই মরেছে। যদি একখানা শাটী পরে, হাতে সোণার বালা পরে, তো, সামনে যেতে সাহস হয়। তা পরে কই!

ধী। ভয় করলে কিছু হবে না। যখন এপথে পা দিয়াছি তখন হদ্দ দেখে তবে ছাড়বো। একবার বুক ঠুকে দেখবো। বেটীর সতীত্ব বুঝবো। আমার কিন্তু ওর চরিত্রে সন্দেহ হয়েছে।

অ। কিসে জানলি? আমার বড় ভয় হয়।

ধী। ওর ধর্ম্ম টর্ম্ম কিছু নয়। কালীভক্তি টালিভক্তি সব বদমাইসী। অমন আমি অনেক দেখেছি।

অ। তোর কথায় বিশ্বাস হয় না। আমাদের আঁচেই ভুল হয়েছে। তবে ছেড়ে দে আর একটা দেখিগে চ।

ধীরেন্দ্র ভাবিতে লাগিল। ভাবিয়া আবার বলিল "যখন পথে নেমেছি ভাল করে না দেখে ছাড়বো না। ও সতী হয় ওর পরীক্ষা হবে।"

অ। তা ঠিক বলেছিস। সতীদের পরীক্ষাও তো হয়।

ধী। যা বলি শোন—বুক ঠূকে লেগে যা। ভয় কাকে? তুই বড় মানুষের ছেলে—ও বেটি, পূজুরী বামুনের মেয়ে। মনে করলে তোরা ওদের ঘর তুলে দিতে পারিস। এখন ঘাটে কেহ নাই—এই বেলা যা।

অ। তাই উঠি বাবা—যা থাকে কপালে। শেষকালে চাঁপা

ঠানদিদি আছে। নিজে না পারি ঠানদিদিকে দিয়ে ওর সর্ব্ব-
নাশটী করবো।

ধী। উঠে যায়—শীঘ্র যা। আর না যাস তো ঘরে চ—
আর আমার সঙ্গে কোন সম্পর্ক তোর রেখে কাজনি। ধীরেন্দ্র
মনে করলে—ওবেটীত কি ছার! অনেক রাজার অন্দরমহলে
সিঁদ কাটতে পারে।

বলিতে বলিতে ধীরেন্দ্র রাগিয়া উঠিল। ধীরেন্দ্রের বক্তৃতার
তেজে অনুপম তেজস্বী হইয়া সাহসে ভর দিল। ধীরে ধীরে
গোঁপে তা দিতে দিতে, গলায় শাড়া দিতে দিতে, ঘাটের দিকে
অগ্রসর হইল। ঘাটের সম্মুখে গিয়া একবার দাঁড়াইল—সাহসে
ভর দিয়া যুবতীর মুখের দিকে তাকাইল। তাকাইয়াই চক্ষু অব-
নত করিল। বুকের ভিতরে ভয়ের সঞ্চার হইল—বুক টিপ টিপ
পড়িতে থাকিল--গার রক্ত শুকাইয়া আসিল—মনের কুভাব
সকল নির্জীব হইয়া পড়িল। অনুপম তদবস্থায় ধীরে ধীরে অব-
নতমুখে ঘাট পরিত্যাগ করিয়া ধীরেন্দ্রের কাছে গমন করিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ধীরেন্দ্র বাল্য বয়সেই ভবিষ্যৎ জীবনের গোড়া দেখাইয়াছিল।
পাঁচ ছয় বৎসর হইতেই তাহার জীবনের বিষময় স্রোত আরম্ভ
হয়। পিতা পাঠশালায় দিয়াছিল। ধীরেন্দ্র অত্যন্ত অনিচ্ছায়,
পাঠশালে কোন কোন দিন যাইত, সব দিন যাইত না—নানা-

স্থানে লুকাইয়া গুরুমহাশয় ও পিতামাতাকে ফাঁকি দিত পাঠশালে গিয়া যাহাদের কাছে বসিত তাহারা সর্ব্বদাই ধীরেন্দ্র কর্ত্তৃক উত্যক্ত হইত। সে সহপাঠীদিগের দোয়াতের কালি অসাক্ষাতে ফেলিয়া দিত,—লিখিবার কলমের মুখ গোপনে মুচ্‌ড়াইয়া রাখিত;—অপরের পাত্তাড়ি হইতে তালপাতা, কাগজ, কলম পেন্‌সিল চুরি করিত। কাছের বালকের গায়ে অকস্মাৎ জোরে চিমটী কাটিত—পৃষ্ঠে বিছুতীর পাতা রগড়াইয়া দিত। সহপাঠীদিগের গুড় মুড়ি চুরি করিয়া খাইত। দিন দিন ধীরেন্দ্রের উৎপাত বাড়িতে লাগিল। তাহার কাছে আর কোন ছেলে বসিতে চাহিত না। পরিশেষে গুরুমহাশয় তাহাকে একলা একটী স্থানে বসাইয়া দিল। কিন্তু দুষ্ট বালকের দুষ্টামি,—জন্ম-কালীন দুষ্ট নক্ষত্রের ভীষণ পরাক্রম পৃথিবীকে না জ্বালাতন করিয়া কি প্রকারে স্থির থাকিবে! ধীরেন্দ্র একলা বসিয়া লিখিতে লিখিতে, এদিক ওদিক চাহে, আর সুবিধামাপিক কোন বালকের-মুখ দেখিতে পাইলেই মুখভঙ্গি করিয়া হনুমানের মত দাঁত খিচায়—গুরুমহাশয়কে পিছন হইতে ঘুষি দেখায়—আর গুরু মহাশয় একটু স্থানান্তর হইলেই, কাহাকেও কিল, চড়, ঘুসী মারিয়া, সুড়ুৎ করিয়া আপন স্থানে শিবশান্ত বালকটীর মত চুপ করিয়া বসিয়া পড়ে। ছেলেদের উপরে উৎপাত ক্রমশঃ বাড়িতে থাকিল;—গুরু মহাশয় কিছুতেই সামলাইতে পারে না। গুরু মহাশয়ের বেতের সপাসপ্ শব্দ, ঘণ্টায় ঘণ্টায় ধীরেন্দ্রের পিঠে পাছায় মাথায় পায় নানা অঙ্গে লীলা করিয়া, অন্যান্য বালক-দিগকে সশঙ্কিত করে। দুই তিন দিন অন্তর গুরুমহাশয়কে নূতন বেত কাটিতে হয়। এ ছাড়া বাঁখারি,কঞ্চি—হাতের আঙুল তো

বেতের সহকারী কর্ম্মচারী হইয়া, ধীরেন্দ্রর হাড় মাসকে দিন দিন শক্ত করিয়া দিতেছে। বনের বিছুতি ক্রমশঃ নির্ব্বংশপ্রায় হইল,—গুরুমহাশয়ের হাতে কড়া পড়িল। পরিশেষে হার মানিয়া গুরুমহাশয় একদিন ধীরেন্দ্রকে কুকুর মারা করিয়া পাঠশালা হইতে দূর করিয়া দিল। একটী মজার কথা এই যে, ধীরেন্দ্র এত প্রহারে কখনও কাঁদে নাই—আঁতুড়েও কাঁদে নাই। ধীরেন্দ্র জন্মিয়া অবধি আদতে কাঁদে নাই। সর্ব্বনেশে ধীরেন্দ্র! ধীরেন্দ্র যতক্ষণ পাঠশালে থাকিত, ততক্ষণ ধীরেন্দ্রের মা বাপ ও প্রতিবাসীগণ একটু স্থির থাকিবার অবসর পাইত। ধীরেন্দ্র পাঠশালা হইতে আসিয়াই মার চুলের ঝুঁটি ধরিয়া—কখন মার মুখে লাথি কিল মারিয়া আপনার বিক্রম প্রকাশ করিত। আর বাপ গুরুমহাশয় অপেক্ষা ভীষণতর মূর্ত্তিতে আসিয়া ধীরেন্দ্রের বিক্রম চূর্ণ করিত। ধীরেন্দ্র পাড়ায় কাহারও বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া গৃহস্থের পোষা কুকুর বিড়ালের উপর অত্যাচার করিত—কাহারও বা পোষা পায়রা ধরিয়া লইয়া পলায়ন করিত—কাহারও উনুনের হাঁড়িতে ইট মারিয়া, বেগে প্রস্থান করিত। পাখীর ছানা—কুকুর বিড়ালের ছানা, প্রায়ই ধীরেন্দ্রের হাতে যমালয় প্রাপ্ত হইত। হঠাৎ নিদ্রিত কুকুর বিড়ালের লাঙ্গুল কাটিয়া দিত, বা মাথায় ভীষণ মুদ্গরাঘাত করিত। ধীরেন্দ্র পথে রাস্তার লোকের কাছা খুলিয়া দিয়া দৌড় মারিত,—কাহারও খাবার ঠোঙ্গায় চিলের মত ছোঁ মারিয়া দ্রুতবেগে পলায়ন করিত— দূর হইতে কাহাকেও ইট্ মারিয়া আড়ালে লুকাইয়া পড়িত।

একদিকে ধীরেন্দ্রের দৌরাত্ম্য, আর অন্য দিকে তাহার পিতার নিষ্ঠুর শাসন। সে শাসনে ধীরেন্দ্র আরও বিগড়াইতে লাগিল

মার খাইতে খাইতে ধীরেন্দ্রের হাড় মাস পেশী বিশেষরূপ শক্ত হইয়া উঠিল। ধীরেন্দ্র বাপের শাসনে শাসিত হয়না দেখিয়া, বাপ ঘর হইতে মাঝে মাঝে দূর করিয়া দিত; কিন্তু ধীরেন্দ্রের মা কাঁদিয়া কাটিয়া ছেলেটীকে আবার ঘরে আদর করিয়া আনিত।

পাঠশালার লীলা সমাপন করিয়া, ধীরেন্দ্র স্কুলে ভর্ত্তি হইল। প্রথমে প্রধান শিক্ষক ভর্ত্তি করিতে নারাজ—স্কুলের সব ছেলের মাথের নষ্ট হইবার ভয়ে, শিক্ষকগণের কেহই ভর্ত্তি করিতে ইচ্ছুক নহেন;—তবে এক হরিশ পণ্ডিতের ভরসায় তাহাকে ভর্ত্তি করা হইল।

হরিশ পণ্ডিত সেই স্কুলের একজন সাবেক পণ্ডিত। ছাত্র শাসনের জন্য তিনি বড়ই বিখ্যাত। বাস্তবিক তিনি অনেক দুষ্ট ছেলেকে শাসন করিয়াছেন। অনেক দুষ্ট ছেলে তাঁহার দাবড়ির চোটে প্রস্রাব বাহ্যে করিয়া ফেলিত। রাগের সময় তাঁহার রাঙা রাঙা ডবডবে চক্ষু যে বালকের উপর ঝুকিত, তাহার বুকের রক্ত ভয়ে জমিয়া যাইত; সে ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বেঞ্চ হইতে পড়িবার মত হইত;—আর সেই ভীষণ মূর্ত্তির ভিতর হইতে ভীষণ দাবড়ি, কাল মেঘাচ্ছন্ন আকাশে বজ্রধ্বনির মত যখন নিনাদিত হইত, তখন ক্লাসের ছেলেদের মৃত চৌদ্দ পুরুষের প্রাণ পর্য্যন্ত চমকিয়া উঠিত—যত বড় দুষ্ট ছেলে হউকনা কেন কাপড়ে অসামাল না হইয়া থাকিতে পারিত না। আবার সেই মূর্ত্তি যখন মারিতে আরম্ভ করিত, তখন যমদণ্ডাপেক্ষা ভীষণতর দণ্ডাঘাত যে কি প্রকার, তাহা স্কুলের সমুদয় শিক্ষক ও ছাত্রগণ বুঝিতে পারিত; পথের

পথিক পর্য্যন্ত একবার স্কুলের কাছে দাঁড়াইয়া পণ্ডিত মহাশয়ের ভীষণ হুঙ্কার শুনিতে শুনিতে ত্রস্ত হইতে থাকিত। হরিশ পণ্ডিতের ভয়ে স্কুলের ছাত্র "থরহরি" কাঁপিত। সেই হরিশ পণ্ডিতের ভরসা পাইয়া প্রধান শিক্ষক ধীরেনকে ভর্ত্তি করিল।

ধীরেনের পিতা ধীরেনকে ভর্ত্তি করিয়া দিয়া চলিয়া গেল। ধীরেন্দ্র একটী ক্লাসে গিয়া বসিল। ক্লাসের ছেলেরা বুঝিতে পারিয়াছিল, কে আজ তাহাদের দলে মিশিয়াছে। যে ছেলেটীর হাতে এখনও ধীরেনের কামড়ান দাগ মিশায় নাই, সে ছেলেটি ভয়ে এক একবার তাহার দিকে তাকাইতেছিল। অন্যান্য ছেলেরা পা দুলাইয়া একমনে নীরবে পড়িতে'ছিল, কারণ তখন হরিশ পণ্ডিত কাছেই একটী ক্লাসে পড়াইতেছেন। ধীরেন ক্লাসে বসিয়া, কেবল হরিশ পণ্ডিতের দিকেই তাকাইতেছিল;—তাকাইতে তাকাইতে ভাবিতেছিল "এ শালার হাতে আবার কত মার খাইতে হবে।" হরিশ পণ্ডিতও বুঝিয়াছেন, এটি তাঁহার বড় ভয়ানক শিকার—এমন দুষ্ট ছেলে তাঁহার হাতে এতদিন পড়ে নাই;—তাই হরিশ পণ্ডিতও ধীরেন্দ্রকে বার বার তাহার দিকে চাহিতে দেখিয়াভাবিতেছিলেন "আচ্ছা পাজী! তুমি কতবড় দুষ্ট একবার দেখিব! তোমায় শাসন করিতে না পারিতো আমার নাম মিথ্যা, আমি পণ্ডিতি ছাড়িয়া দিব! কিয়ৎক্ষণ পরে টঙ্ টঙ্ করিয়া ঘণ্টা বাজিল। হরিশ পণ্ডিত, সেই ক্লাসে আসিয়া চেয়ারে বসিলেন। পণ্ডিত মহাশয় ক্লাসে আসিবামাত্রই, ছাত্রদিগের চেহারা ফিরিয়া গিয়াছে,—বুক ঢিপ ঢিপ করিতেছে। যার পড়া ভাল তৈয়ার হয় নাই, সে ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে পুস্তকের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া আপনার পাঠটী সামলাইবার জন্য বিশেষরূপ চেষ্টা

করিতেছে. কিন্তু যাহা শিখিতেছে, ভয়ে তাহাই ভুলিয়া যাই-তেছে। যে বাঁকা বসিয়াছিল সে সোজা বসিয়াছে, যাহার কাপড় আঁটুর উপরে উঠিয়াছিল সে তাহা সামলাইয়াছে, যাহার মুখে সুপারি ছিল, সে আস্তে আস্তে তাহা পশ্চাতে ফেলিয়াছে।

বালকদের সকলেই নিস্তব্ধ, নীরব। সকলেরই চোখ ছল ছল করিতেছে, অনেকেরই বুক ঢিপ ঢিপ করিতেছে, পা দুলান সকলেরই থামিয়া গিয়াছে। এমন অবস্থায় হরিশ পণ্ডিত চেয়ারে বসিয়াই একবার গলা খেঁকরি দিলেন। সে শব্দটাও আতঙ্কদায়ক—তাহাও একটা ছোট খাট দাবড়ি। গলাখেঁকরি দিয়াই ভ্রু দুটা উর্দ্ধে তুলিয়া, একবার ধীরেন্দ্রের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিলেনঃ—

কিহে ধীরেন্দ্র! কি মনে করে?

ধীরেন্দ্র একটু মুখ হেঁট করিয়া মুচকিয়া হাসিল।

প। হাসি হচ্ছে যে! হাসি বার করচি।

ধীরেন্দ্র তখন চাদর মুখে দিয়া হাসির রোল বাড়াইল।

প। একবার উঠে এস দেখি! একবার ভাল করিয়া হাসাই।

পণ্ডিত মহাশয়ের এক একটা কথায় বালকদের প্রাণ আতঙ্কে কাঁপিতেছিল। ধীরেন্দ্র তখন হাসিটা একটু কমাইয়া, মুখ হইতে চাদর নামাইয়া চুপ করিয়া মনে মনে ভাবিতেছিল, 'শালা মারেতো ছুট দেবো।'

পণ্ডিত মহাশয় ক্রোধিত স্বরে ক্লাসের একটী বালকের দিকে চাহিয়া বলিল, 'ওরে হরে! একবার ওঠ দেখি।'

হরের সর্ব্বনাশ! হরে ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিল।

প। ওর কান ধরে আন দেখি?

অন্য কোন বালকের কান ধরিতে বলিলে, হরের ভয়ের কারণ কিছুই থাকিত না; কিন্তু হরে ধীরেন্দ্রকে ভাল করিয়া চিনিত। পাঠশালে লিখিবার সময়, গুরু মহাশয়ের হুকুমে, যে ধীরেন্দ্রের একবার কান মলিবার জন্য, হরেকে কতবার পথে ঘাটে ধীরেন্দ্রের হাতে, কত ভীষণ প্রহার খাইতে হইয়াছে; সেই দুর্দ্দান্ত ধীরেন্দ্রের কানে হাত দেওয়া, হরের পক্ষে বড়ই আতঙ্কদায়ক। এখন হরে কাঁদিতে কাঁদিতে কাঁপিতে কাঁপিতে করযোড়ে হরিশ পণ্ডিতের দিকে তাকাইয়া বলিল, 'ও আমায় মারবে।'

প। চোপরাও পাজি! যা বলি তা শোন।

ভীম কড় কড় নাদে এই দাবড়ি যখন পণ্ডিতের মুখ হইতে বিনির্গত হইল, তখন হরে কাঁপিতে কাঁপিতে ধীরেন্দ্রের কাছে উপস্থিত। ধীরেন্দ্র হরেকে কাছে দেখিয়া, হেঁটমুখে চুপে চুপে বলিল, 'কানে হাত দিবিতো রাস্তায় টের পাওয়াব।' কথাটা হরিশ পণ্ডিতের কানে বাজিল। অমনি যমমূর্ত্তিতে উঠিয়া হরিশ পণ্ডিত, ধীরেন্দ্রের দুটী কান ধরিল—কড়া-পড়া হাতে কড়া-পড়া কান ধরিল—ধরিয়া হড়হড় করিয়া চেয়ারের কাছে, ইঁদুরের মত টানিয়া আনিল।

ধীরেন্দ্রের কান অনেকের হাতে মর্দ্দিত হইয়াছে। আজ হরিশ পণ্ডিতের হাতে সে কড়া-পড়া কানেও বড়ই জ্বালা উপস্থিত হইল—কান চড়চড় করিতে থাকিল। ধীরেন্দ্র তখন রাগে ফুলিতে ফুলিতে বলিল" আমি স্কুলে পড়বোনা—আমার নাম কেটে দাও বলছি"।

অমনি কান ছাড়িয়া দিয়া, হরিশ পণ্ডিত কালান্তক মূর্ত্তিতে প্রকাণ্ড রুল লইয়া, ভীম হুঙ্কারে ধীরেনের পৃষ্ঠের উপর দমা-

দম পিটিতে আরম্ভ করিল। সে ভীষণ প্রহারে ধীরেন্দ্রর হাড় চূর্ণ হইবার মত হইল। ধীরেন মাটিতে পড়িয়া ছটফট্ করিতে থাকিল। রুলের এক একটা ঘায়ে ধীরেন্দ্রর যেন এক এক খানা হাড় ভাঙ্গিতে লাগিল। ধীরেন্দ্র কাটা ছাগলের মত ছটফট্ করিল। কিন্তু চোখের জল এক ফোঁটা পড়িল না,— ইহাই আশ্চর্য্য! এবড় সর্ব্বনেশে ধীরেন্দ্র!!

কিয়ৎক্ষণ পরে, গা ঝাড়িয়া উঠিয়া ক্লাসে গিয়া বসিল। ধীরেন্দ্রর দুই কান লাল—পৃষ্ঠে—পায়ে—পাছায় রুলের লাল লাল দাগ এবং তাহাতে ভীষণ যাতনা,—কিন্তু চোখে জল নাই। এবড় সর্ব্বনেশে ধীরেন্দ্র!!

এরূপ প্রহার ধীরেন জীবনে কথন "আহার" করে নাই। ধীরেন সেই দিন হইতে হরিশ পণ্ডিতকে ভাল করিয়া চিনিল। পণ্ডিতের লাল চক্ষু বড়ই ভীষণ। ধীরেন সেই স্কুলে পড়িতে থাকিল। স্কুলের মাষ্টার পণ্ডিত ছাত্রকে জ্বালাতন করিতে করিতে এণ্ট্রান্স পর্য্যন্ত পড়িয়াছিল। ধীরেন বোকা ছিলনা। ধীরেনের বাল্যজীবনের দুর্ব্বৃত্ততা যৌবনাগমনে বড়ই বাড়িয়া উঠিল। গ্রামের বউ ঝি সকলে সাপের অপেক্ষাও তাহাকে ভয় করিতে লাগিল। সাপে প্রাণনাশ—ধীরেন্দ্রে ধর্ম্ম-নাশ। ধীরেন নিজগ্রাম—নিকটবর্ত্তী গ্রাম—দূরস্থ গ্রাম পর্য্যন্ত আপনার অত্যাচারে কাঁপাইতে থকিল। পুলিশ কতবার ধীরেনকে ধরিয়া চালান দিল; কিন্তু ধীরেন্দ্রর পিতা মাতার বিশেষ অর্থবল থাকায় এবং ধীরেন্দ্রর এক মাতুল হাইকোর্টের একজন ভাল উকিল বলিয়া ধীরেন্দ্রর কিছুই হইলনা। এমন কি পরিশেষে পুলিশ পর্য্যন্ত ধীরেনকে ভয় করিয়া চলে! পাপি-

ত্রের অত্যাচার আপন পিতা মাতাকেও অব্যাহতি দেয় নাই। মা তো ছেলের প্রহারে অস্থির হইয়া পিত্রালয়বাসিনী হইলেন। পিতা বিদেশে অর্থোপার্জ্জন করেন—ছেলের অত্যাচার-ভয়ে তিনিও দেশে আসা বন্ধ দিয়াছেন। ধীরেন্দ্র একলাই ঘরে থাকে। বিবাহ হয় নাই—পিতা মাতা চেষ্টা করিতে ত্রুটী করেন নাই—ঘটক মহাশয়ও ধীরেন্দ্রের প্রশংসা কীর্ত্তন করিতে অবশিষ্ট রাখেন নাই। কিন্তু কে সাপের মুখে মেয়ে দিবে? ধীরেন্দ্রের চরিত্র এত ভীষণ যে কাহারও সহিত ঝগড়া হইলে ধীরেন্দ্র ছাদ বা চাল ফুটা করিয়া তাহার ঘরে বিষধর সর্প ছাড়িয়া দেয়—রাত্রে ঘরে গোপনে আগুন জ্বালিয়া দেয়—অন্ধকারে অস্ত্র ছুঁড়িয়া আঘাত করে। অনেক দূর্দ্দান্ত শাসিত হয়, ধীরেন্দ্র শাসিত হয় না। ধীরেনের কি শাসন হবেনা? আকাশে কি দেবতা নাই?

ধীরেনের কয়েকটী শিষ্যও হইয়াছিল। ধীরেন্দ্র তাহাদিগকে কুকাযে নাচাইয়া দিয়া নিজে দূরে থাকিত। কাহারও সঙ্গে মিলিয়া কোন দুষ্কর্ম্ম করিত না—যাহা করিত একলা। ধীরেন বুঝিয়াছিল—দলে মিলিয়া দুষ্কর্ম্ম করিলে হয়তো অন্যের বোকামির জন্য জেলে যাইতে হইবে। পাপিষ্ঠ অনুপমকে নাচাইয়া দিয়া আপনি তফাতে থাকিল।

——]•:○:•[——

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—:০:—

মানুষে বাঘিনী আছে—মানুষে পিশাচী আছে—মানুষে নরকের ভীষণ মূর্ত্তি আছে—পাঠক পাঠিকা! একবার দেখিবে চল।

মহেশপুরের বাজারের উত্তর দিকে মৃত্তিকাময় প্রাচীরবিশিষ্ট একখানি মেটে ঘর আছে। সেই ঘরে যে মূর্ত্তিটী বিরাজ করেন; তিনি আমাদের উপন্যাসের একজন মহারথী! ইহাঁর নাম গ্রামের লোক প্রাতঃকালে উচ্চারণ করেনা। প্রাতঃকালে ইহাঁর মুখ দর্শনে লোকে অমঙ্গলের সম্ভাবনা করে। প্রাতঃকালে ইহাঁর বাটীর সম্মুখ দিয়া চলিবার সময় লোকে কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত মুখ অবনত করিয়া চলে। রাত্রে ইনি আপন বাটীতে সব সময় থাকেন না। গ্রামের ঘর ভাঙ্গিবার মন্ত্র, ভ্রাতৃবিরোধের বীজ, কুলবধূ মজাইবার কৌশল, ঘাটে স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে ঝগড়া গুলজার করাইবার ইঙ্গিত, ইনি আপনার মনের ঘরে বোঝাই করিয়া রাখিয়াছেন। ইনি রজনীতে জালে করিয়া পরের পুকুরে মাছ ধরেন—শশা, কাঁঠাল, আম্র আত্মসাৎ করেন—বিধবা হইলেও সধবা ধর্ম্ম প্রতিপালন করেন। স্বামীভক্তি এত যে, স্বামীভাব চারিদিকে ছড়াইয়া থাকেন। সমুদয় পুরুষকেই স্বামী ভাবে দেখেন—স্বামীভক্তির উদারতা অত্যন্ত অধিক।

কাহারও ভাল সংবাদ শুনিলে, ইহাঁর মুখ বিষন্ন হয়—কাহারও অমঙ্গল শুনিলে মনের হাসি চাপা দিয়া লোকের নিকট আক্ষেপ করেন। ইহাঁর জিহ্বা লোকনিন্দার সেবায় উৎসর্গিত। অনেক কুকথা, অন্য কোথায় আশ্রয় না পাইয়া এঁর উদার জিহ্বায় ঘর বাঁধিয়াছে। অনেক নীচতা ইহাঁর আশ্রয়ে প্রতিপালিত হয়।

ইহাঁর নাম চাঁপা। গ্রমের লোকে "গণ্ডগুলে চাঁপা" বলিয়া জানে। স্ত্রীলোকটী থর্ব্বাকৃতি, বর্ণ কটা। চক্ষুর তারা দুটী কটা। দু'গালে দুখানি "মেচেতার" দাগ। তাম্রবর্ণের লম্বা চুল। দাঁত খুব সাদা—লম্বা লম্বা। মুখ ভ্যাঙাইলে অনেক ছেলে ভয় পায়। কখন থান পরা হয়—কখন শাটীও পরা হয় কখন হরিতকী সেবনও হয়, কখন পানে ঠোঁট লাল করাও হয়। পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত সর্ব্বাঙ্গ একটা কি যেন ভীষণ জ্যোতিতে পরিপূর্ণ—সে জ্যোতিতে হিংসা, দ্বেষ, কাম, ক্রোধ সকল জীবিত রহিয়াছে। মজার কথা এই চাঁপা আপনাকে মহাসুন্দরী বলিয়া মনে করে। এরূপ স্ত্রীলোক সংসারে অনেক!

একদিন রাত্রে গ্রামের সকল লোক নিদ্রিত। ঝুপ্ ঝুপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। অন্ধকার ঘনীভুত হইয়া দাঁড়াইয়া বৃষ্টিজলে ভিজিতেছে,—কিন্তু গায়ে আদতে বৃষ্টি লাগিতেছে না। এমন সময়ে গণ্ডগুলে চাঁপার বাটীর শিকল ধরিয়া কে নাড়া দিল—দ্বারে ধাক্কা মারিল। অমনি বাটীর ভিতর হইতে এক রমণীমূর্ত্তি আসিয়া দ্বার খুলিল। একটী পুরুষ প্রবেশ করিল। দ্বার বন্ধ করিয়া দুজনে চলিয়া গেল।

রমণীর ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিয়া পুরুষটী বলিল "আর আলো জ্বালিবার প্রয়োজন নাই। তখন দুজনে কথোপকথন চলিল :—

পু। চাঁনদিদি! একটা কায ক'রতে হবে?

চাঁ। ভয় ক'রে ভাই! এত রাত্রে বৃষ্টিতে আমি আবার তোমার কি কাযে লাগবো। ঘরের গিন্নীকে ফেলে আমার কুঞ্জে কেন।

পু। জ্বালাতন না হলে কি এসেছি।

চাঁ। কি—কথাটা কি?

পু। তোমার বাড়ীতে রাস হবে।

চাঁ। তার পর আমাকে কি ক'রতে হবে।

পু। তোমাকে বৃন্দে দূতির কায ক'রতে হবে।

চাঁ। সে তো বরাবরই আছি। এখন তুমি কৃষ্ণ হও আর গিন্নীকে ধরে আন। না হলে বুড়ো বয়সে তোমার রাধা হওয়া হবেনা।

আমি কৃষ্ণ তুমি রাধা আছতো চিরকাল,
এখন তোমায় দেখাতে হবে বৃন্দে-দূতির চাল।
নূতন রাধা আনতে হবে জোগাড় জাগাড় ক'রে,
নাহি যদি পার তোরে দেব যমের ঘরে।
কুলবধূর কুল মজাতে তুমি তো খুব পার,
আমার ভাগ্যে তবে যদি কপাল দোষে হার।

কেমন ছড়াটার ভাব বুঝলে তো?

চাঁ। আমি বুড়ো হ'য়েছি। এখন হরি নাম ধরেছি—ওসব ভাই পারবোনা।

পু। হো! হো! হরিনাম বুড় বয়সে, চিরকালটা গেল যা করে, তাই কর। কত লোকের গতি ক'রেছ—আমার কি ক'র্‌বে না?

চাঁ। তা—তোকে ভাল বাসি, তুই যদি একান্ত ধরিস কি ক'র্‌বো—কাকে বল দেখি?

পু। শ্রীধরের ঘরে আছে অপূর্ব্ব রতন,
অবশ্য পাইবে তুমি ক'রহ যতন।

চাঁ। কেরে শালা! কাদি! সে হবেনা, শক্ত মেয়ে। তার যে কালীভক্তি! ওসব লোভ ছাড়। আমার সন্ধানে এক রূপসী আছে, তাকে বাগ্‌য়ে দিতে পারি।

পু। ক'রেছে প্রতিজ্ঞা প্রেম করিবারে দান,
তাইতো লভিতে তারে অস্থির এ প্রাণ।
ঠান্‌দিদি! তোর পায়েধরি বাঁচা এ জীবন,
অনুপমে দাও এনে "কাদম্বিনী-ধন"।

চাঁ। শালা! ঘরে অমন মাগ র'য়েছে—তাকে ফেলে পরের মেগের কাছে কেন?

পু। ঠান্‌দিদি, আমাকে তুমিই তো এ পথে শিক্ষা দিয়েছ। এখন গাছে তুলে দিয়ে, মই কেড়ে নিলে কি হবে?

চাঁ। কি তোকে ব'লেছে—তোকে আশা দিয়েছে কি?

পু। আশা পেয়েই এসেছি। ধীরে শালা গাছে তুলে দিয়ে ভয় দেখায়। নহিলে সেদিন রাত্রেই যেতাম। আজ কয় মাস থেকে আমি ম'রে আছি। ঠান্‌দিদি! ব'ল্‌বো কি—অমন নেশা আর নাই। হাড়, পাঁজর তার চেহারার

ভিতরে যেন পুড়ে পুড়ে ছাই হ'চ্ছে। আমি আর সহ্য কর্‌তে পার্‌ছি না। তাই নিরুপায় হ'য়ে তোর আশ্রয় লয়েছি। জানি একাজে তুমি সহায় না হ'লে চ'লবে না। ধীরে শালা নাচিয়ে দিয়ে এখন সরে পড়েছ। অনেক সময়ে তুমি আত্ম-শক্তি।

চাঁ। আর যেয়াদা তোকে ব'ল্‌তে হবে না। আমি তোর আঁতের কথা টের পেয়েছি—যদি আমার সে রূপ, সে বয়স থাক্‌তো, তো তোকে দিয়ে তৃপ্ত কর্‌তাম। এখন মাঝে মাঝে দুঃখ হয় সেই যৌবনের তরে। খপ ক'রে চ'লে গেল। কত যতন করেও রাখতে পারলাম না। চল্লিশ অবধি ঘ'সে মেজে রূপ বজায় রেখেছিলেম—আর থাকলো না। তবে রূপটা এখনও যায়নি—আছে, কি বলিস? আমায় কেমন দেখ্‌তে ছিল যৌবনে, তা তুই জানিস না। আমার বয়স যখন ষোল সতর তখন তোরা বালক। দাদা! কাদম্বিনীর যৌবন দেখে অত পাগল হ'য়েছ, যদি আমার সে রূপ যৌবন দেখতে তো আমার পিছনে কুকুরের মত লাজের মাথা খেয়ে ফির্‌তে হ'তো, ও গাঁয়ের ক্ষীরোদ বাবুর এমন লোভ হ'য়েছিল যে, রাত ২।৩টার সময় বর্ষাকালে ভিজে ভিজে আমার ঘরে আ'সতো। তা মিন্‌সে তখন বেঁচে ছিল তাই—

অ। তাতে কি তোমার ব্যাঘাত হ'ত ঠানদিদি?

চাঁ। আরে ভাই মিন্‌সে সব জানতো। তবে আমার রূপের জন্য কিছু ব'লতে পারতো না। মিন্‌সেকে আগে ভ্যাড়া বানিয়ে, তার পর যা ইচ্ছা তাই ক'রতাম। মিন্‌সেকে ভ্যাবাচাকা লাগিয়ে দিয়েছিলাম। তা এখন ভাল কাপড়

চোপড় প'রে বেরুলে, তোদের মাথা ঘুরিয়ে দিতে পারি। বুড়োর দল এখনও আমায় ঘাটে পথে দেখলে, হরিনামের মালা ঘুরান ভুলে গিয়ে, অবাক হ'য়ে, আবার কেঁচে নব-যৌবন হাতড়াবার জন্য, প্রাণে প্রাণে হামাগুড়ি দেয়—দম ফেটে ম'রবার যোগাড় হয়।

অ। ঠান্‌দিদি তোমার মত রসিকা দেখিনি। তোমার যৌবনটা আমাদের ভাগ্যে ঘটেনি।

চাঁ। তা বয়স আমার ততই কি হ'য়েছে। এখনও মনে ক'রলে তোদের মত অনেককে অনেক রূপসীর কোল হ'তে ভুলিয়ে আন্‌তে পারি।

চাঁপা কথা কহিতে কহিতে হঠাৎ থামিল—কি ভাবিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "ভাই! আর ভাল লাগে না। তবে অভ্যাসের দোষে স্বভাবটা এখনও ছাড়তে পারিনি।

অ। ঠান্‌দিদি! এখনও কি সে স্বভাব যায়নি।

চাঁ। ভাই! সে কথা আর ব'লোনা। ও আফিমের নেশার মত। ওতে মজা আর কিছু নাই। তবে কেমন একটা মনের খেল—প্রাণের আবদার—কিছুতেই যায় না। শ্মর-আগুণে পুড়লেও যাবে কি না জানিনা। এই কথা কহিতে কহিতে মনে হ'চ্ছে—আমি যদি কাদি হ'তাম তো নিজেই তোর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতাম। এটা ভাই স্বভাবের দোষে। মনে করি হরিনাম ক'র্‌বো, তা ভাই! মনকে বশ ক'রতে পারি কই।

অ। তা এখন আমার উপায় কি হবে বল?

চাঁ। হবে আর কি—এত যখন বলছিস—উপায় ক'রবো।

অ। তা কবে যাবে?

চাঁ। কালই যাব—কাল রাত্রে এসে খবর নিও। আমায় কি দেবে?

চাঁপা এতক্ষণে আসল কথাটা ব্যক্ত করিল।

অ। দশ টাকা নগদ, আর এক জোড়া ভাল কাপড়।

চাঁ। তাই হবে। সত্য কি আর টাকা লব। এখন যা, কথা প্রকাশ না হয়।

অনুপম চলিয়া গেল। চাঁপা ঘর বন্ধ করিয়া শয়ন করিল। শয়ন করিয়া ভাবিতে লাগিল; "পোড়া পেটের জন্য সব কর'তে হয়। আগে বুঝতে না পেরে কুপথে পা দিয়াছিলাম; তাতে কি সুখ হ'ল? কেবল নেশাই বেড়ে গেল, স্বামী আমার জ্বালায় শেষে পাগল হ'য়ে দেশত্যাগী হ'ল। ছেলে না হবার জন্য ঔষধ খেয়ে আরও সর্ব্বনাশ ক'রলাম। যদি একটা ছেলে থাকতো তো এদশা কাট্‌তো। হায় যৌবন কি ভয়ানক! তখন দেমাকে মাটিতে পা প'ড়ত না। ধর্ম্ম বড় কি যৌবন বড়, বুঝতে পারতাম না। রূপের জ্যোতি অঙ্গের থরে থরে উথ্‌লে উঠেছিল, আর্শি ধ'রে সর্ব্বদা দেখতাম। চোখের তেজ যেন আমায় পাগল ক'রেছিল—যেদিকে চাহিতাম সেদিক যেন আমার রূপে মজিত, মনে হ'ত। তার পর পাড়ার লোকে সেই রূপকে বাড়াতে লাগলো—আমার মনের স্পর্দ্ধা আকাশে তুলতে লাগ্‌লো। স্বামীকে অগ্রাহ্য ক'রতাম, টাকা গহনা যে দিত তাকেই যৌবনের দ্বারে প্রবেশ কর্‌তে দিতাম। এখন সে যৌবন আমার কোথা? সে গোলাপ শুখ্‌য়ে গ্যাছে—সে চাঁদ কলঙ্কে ঢাকা পড়েছে, তথাপি মনের

ধাঁধা কাটে না। এখনও যেন অঙ্গে সে যৌবনের গন্ধ র'য়েছে এখনও যেন পৃথিবীটা আমার যৌবনের তেজ ধর্‌তে পার্‌ছেনা। কিন্তু সব ফোক্কা,—সব ভোঁয়া! সেই চকচকে দেহের মাংস কুচ্‌কেছে—সেই উজ্জ্বল চ'খে কাল দাগ প'ড়েছে। যে স্তন লোকে দেখে, ভ্যাবাচাকা লেগে আপনার নাম ধাম পর্য্যন্ত ভুলে যেতো, সে স্তন এখন কদাকার রূপ ধ'রেছে, জগতে এমন সুন্দর এত কদাকার হ'তে তো দেখিনি! এখন লোকে দেখ্‌লে চক্ষু ফিরায়। এ পথে মানুষ কেন আসে? যে একবার এ পথে পা দিয়েছে, তার সারা জীবনটা গিয়েছে। তবুও বুঝে সুঝে অভ্যাস দোষে পেটের জ্বালায় সব ক'র্ত্তে হবে। কাদির কাছে যেতে হবে—তাকে ভুলুতে হবে।" চাঁপা এইরূপে ভাবিতে ভাবিতে নিদ্রাভিভূতা হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

কাদম্বিনী মহেশপুরের শ্রীধর ভট্টাচার্য্যের কন্যা। কুলিন কামিনী। মহেশপুরের এক প্রান্তে শ্রীধরের ঘর। তিনখানি মেটে ঘর, একখানিতে শ্রীধর থাকিত, আর একখানিতে কাদম্বিনী থাকিত। আর একখানি কালীদেবীর গৃহ। কাদম্বিনী সধবা. কিন্তু বিবাহের পর হইতে স্বামী ছাড়া। স্বামী বিদেশে কোথায় থাকে কেহ জানে না। বিবাহের ২ বৎসর পরে, কাদম্বিনীকে পিত্রালয়ে রাখিয়া, স্বামী বিদেশে চাকুরী করিতে যায়;

সেখান হইতে নিরুদ্দেশ। দশম বৎসরে কাদম্বিনীর বিবাহ হয়। দ্বাদশ বৎসরে স্বামী পরিত্যাগ করিয়া প্রবাসী—নিরুদ্দেশ। কাদম্বিনীর এখন বয়স ষোল বৎসর। ৪ বৎসর স্বামীকে দেখে নাই স্বামীর সেবা শুশ্রূষা-সুখে বঞ্চিতা। পিতা শ্রীধর ভট্টাচার্য্য যজমানের আয় হইতে মেয়ের গহনা করিয়া দিয়াছিল। মেয়ে তাহা পরিত না—হাতে কেবল লোহা ও শঙ্খ রাখিয়াছিল। শ্রীধরের আর কেহ নাই। স্ত্রী, মেয়ের বিবাহের ১ বৎসর পরে পরলোকবাসিনী হইয়াছে। শ্রীধর কন্যার সেবায় খুব সুখী হইয়াছিল। শ্রীধর কন্যাটিকে খুব স্নেহ করিত। সেই স্নেহ অন্য কারণে বড়ই অসাধারণ ভাব ধরিয়াছিল।

কন্যাকে পিত্রালয়ে রাখিয়া যাইলে, শ্রীধর জামতার হাতে ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়াছিল "বাবা! বিদেশে সাবধানে থাকিও, দেখ কাদম্বিনী মাতৃহীনা, আমি কবে আছি, কবে নাই—কুলিনের ছেলে আর যেন বিবাহ ক'র না—চিঠি পত্র সর্ব্বদা দিও।" জামাতা কুঞ্জবিহারি, শ্বশুরের কথায় "হুঁ" দিয়া বিদায় লইয়াছিল। সেই কুঞ্জ দুই বৎসর পরে যখন নিরুদ্দেশ হয়, শ্রীধর সেই সংবাদে অধীর হইয়া কাঁদিতেছে দেখিয়া কাদম্বিনী গদগদ স্বরে বলিয়াছিল "বাবা। কেঁদনা, মা কালী আমাদিগকে ভুলিবেন না! আপনি যে অত চক্ষের জলে, রাঙা জবাফুলে মার পূজা করেন সে পূজা বৃথা হবে না।" অশ্রুপূর্ণলোচনে গদগদ ভাবে কন্যার মুখে এই সরল দেব-কথা শ্রবণে শ্রীধরের শোকবেগ উপসমিত হইল; হৃদয় আশায় বলিষ্ঠ হইল—এবং সেই সময়ে কে যেন প্রাণের ভিতর বলিল, "তোর মেয়েকে আমি সুখী করিব আর কেহ পারিবে না।"

হৃদয়ের গভীর প্রদেশের সেই বিবেকবাণী, শ্রীধরের দগ্ধ প্রাণকে সুশীতল এবং মা কালীর প্রতি স্বাভাবিকী ভক্তিকে দ্বিগুণ করিল।

শ্রীধর বাল্যকাল হইতেই কন্যাতে দেব ভক্তির সুমধুর চিহ্ন সকল ফুটিতে দেখিয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছিল। কন্যা, যখন ৪ বৎসরের—বেশ কথা কহিতে পারে, তখন শ্রীধর দেখিত, কালী পূজার সময়, প্রতিমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে মার শ্রীচরণের দিকে তাকাইয়া থাকিত। শাঁখ ঘণ্টা বাজিবার সময়, আনন্দে কি গান অস্ফুটভাবে গাহিত—সে গানে ভাব ছিল না—কথা বিন্যাস ছিল না বটে, কিন্তু বোধ হইত যেন শাঁখ ঘণ্টার প্রাণারাম আঘাতে কাদম্বিনীর হৃদয়ের ভক্তি তার হইতে এমন একটি দেব-সুর উঠিত, তাহা তখন তাহার বাল্য-ভাষার হাড়ে হাড়ে শুনিতে পাওয়া যাইত। পিতা প্রণাম করিবামাত্র কন্যা পিতার অনুকরণে প্রণাম করিত। বাটিতে কাদম্বিনী মার কাছে কেবল ঠাকুর দেবতার কথা শুনিত। বাপের কাছে, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণাদির কথা শুনিতে শুনিতে আত্মহারা হইত। বালিকা বয়সে যখন শিব পূজা করিত, তখন কখন কখন চ'খে ভক্তির অশ্রুকণা ঝরিতে দেখা যাইত। বিবাহের পর স্বামী বিদেশ যাত্রা করিলে, সময়ে সময়ে আপন বাটির কালী ঠাকুরাণীর ঘরের দাওয়ায় বসিয়া, সেই মুর্ত্তির দিকে চাহিয়া থাকিত—প্রার্থনা করিত—কখন কখন কাঁদিত। কাদম্বিনী পিতার নিকটে লেখাপড়া শিখিত। কবিতা লিখিতে পারিত। গান রচিত—গাহিত। কাদম্বিনীর প্রকৃতি কাব্যময়ী—কথায় রস গড়াইয়া পড়িত। হাসি মুখে লাগিয়া

থাকিত। প্রকৃতির শোভা পান করিত। শোভা যেন কাদম্বিনীকে মাতাইবার জন্ত সর্ব্বদা সৃষ্টিরহস্যে স্ফুরিত হইত। কাদম্বিনী দৃষ্টি-বলে অশোভা হইতে শোভার ফুল ফুটাইত।

শ্রীধর প্রাতঃকালে উঠিয়া, স্নানাদি করিয়া, প্রথমে আপন গৃহ-দেবতার পূজা শেষ করিত, পরে অন্যান্য যজমানদিগের বাটীতে দেব-পূজায় বাহির হইত। কাদম্বিনী সেই সময়ের মধ্যে রন্ধনাদি সমাপন করিয়া রাখিত। রন্ধনাদির পর একেলা একটী নামের মালা লইয়া, নাম জপ করিত। জপিতে জপিতে প্রকৃতির শোভায় আপনার ইষ্টদেবতার শোভা উথলিতে দেখিয়া ভাবভরে কাঁদিত—কখন মুচকিয়া হাসিত। জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে ইষ্টদেবতার হৃদয়োন্মাদক, স্বর্গ প্রকাশক, জন্মগ্রন্থি-বিদারক বিরাটমূর্ত্তি দেখিয়া কাদম্বিনী মাটীর মহীতে স্বর্গ-সুখভোগ করিত। ভক্তির অমৃতোচ্ছ্বাসে হৃদয় প্রাণ মাতাইয়া আপনাকে কাহার রূপে হারাইয়া ফেলিত। কাদম্বিনী রাঁধিতে রাঁধিতে আপনার নারীপ্রকৃতিতে মহানারী-প্রকৃতির অপরূপ ছায়া অবলোকন করিয়া স্তম্ভিত হইত, অন্ন ব্যঞ্জনে সেই ইষ্টদেবতার জগৎপরিপোষিণী জীবন-প্রলয়কারিণী মূর্ত্তি দর্শনে এই সৌন্দর্য্য-সাগর তুল্য প্রকৃতিতে আপনাকে একবারে হারাইয়া ভাবে বিভোর হইয়া থাকিত। পিতৃসেবার সময় সেই পতিতপাবন দেবমূর্ত্তি, পিতার অবয়বমূলে নিরীক্ষণ করিয়া আপনার আত্মজ্ঞানকে পিতৃচরণে নিমজ্জিত রাখিত। আকাশে তাঁর বিরাট ছবি—তারকায় তারকায় তাঁরই অদ্ভুত লীলা-পট পর্য্যবেক্ষণ করিয়া নারীজন্মকে সার্থক জ্ঞান করিত।

কাদম্বিনীর দেবভক্তিতে, প্রকৃতি-ভক্তি—সৌন্দর্য্যানুরক্তি মিশ্রিত হওয়ায়; মধুরা রমণীপ্রকৃতিতে অনুপমা লালিত্য-মাধুরী বৃদ্ধি করিয়াছিল। বাল্য বয়সেই রজনীর সুনীল আকাশে প্রস্ফুটিত তারকা-কুসুমাবলীর শোভা দেখিয়া আনন্দে হাসিত, তারাদিগকে আহ্বান করিয়া কথা কহিত—পিতামাতাকে সেই স্বর্গযাত্রীদিগের কথা জিজ্ঞাসা করিত। চাঁদের সহিত বড় ভাব হইয়াছিল। চাঁদ কলায় কলায় কিরূপ আকাশে সৌন্দর্য্য ছড়াইত, তাহা মনে মনে আলোচনা করিত। চাঁদ কোথা হইতে আসে, কোথায় যায়—ভাবিত,—বাপ মাকে জিজ্ঞাসিত। চাঁদের বাড়ী কোথা—অত সুন্দর কিরূপে হইল এই সব প্রশ্ন মনে উঠিত। ক্রমশঃ বয়োবৃদ্ধি সহকারে চাঁদকে অন্যরূপে দেখিতে লাগিল। যৌবনে চাঁদের নেশা বাড়িয়া গেল।

পুকুরের নীল জলে, বৃক্ষ পত্রের গায়ে, আকাশের বুকে সেই চাঁদের সুবিমল জ্যোতি যখন ফুট্ ফুট্ করিত, কাদম্বিনী আপনার অস্তিত্বকে প্রকৃতির সেই ঘোর প্রেম নেশায় নিমজ্জিত করিয়া আত্মসমুদ্র হইতে আনন্দের ফোয়ারা সঙ্গীতাকারে বা উন্নত প্রলাপে ব্যক্ত করিত। সে গানে—গানের ভাবে—বাক্যে চাঁদের আলো ক্ষরিত হইত। কাদম্বিনী চাঁদের আলোকে ডুবিয়া চাঁদকে আপনার সহিত হারাইত। হারাইয়া প্রকৃতির মূলতত্ত্ব অন্বেষণ করিত—হাতড়াইয়া আপনাকেও পাইত না—চাঁদকেও পাইত না—পাইত তার ইষ্টদেবতাকে—দেখিত তার ইষ্টদেবতাকে। দেখিত চাঁদও যে আপনিও সে মুখ যেমন তার একখানি সুন্দর অঙ্গ, চাঁদও তেমনি। আকাশ তারই ভিতরে—সে আকাশ হইতে পৃথক্ নহে। ফুলের হাসি ফুল হইতে

নামিয়া তার প্রণয়ের গান ধরিয়া তার কোমল অধর-শয্যায় কেলি করে। পদ্মকোরক সুসৌরভ লুকাইয়া সতীর বক্ষে স্তন-রূপে প্রকাশ পায়। উষার লাবণ্য—চাঁদের মাধুরি—আকাশের উজ্জ্বলতা, তার আত্মপ্রকৃতির মৃদুমধুর হাস্য ব্যতীত আর কিছুই নহে। সতীর দুঃখ—সাধুর আক্ষেপ, তারই হৃদয় মন্দিরের ইষ্ট-দেবতার পূজামন্ত্র; বীরের দম্ভ, বিজয়ীর জয়নাদ, তারই প্রাণ-নিঃসৃত আরাম ব্যতীত আর কিছুই নহে। চাতকের ডাকে, মেঘের গর্জ্জনে, তটিনীর কলরবে, বিটপীর মর্ম্মর-স্বরে আপ-নারই অবোধ্য সঙ্গীতালাপ ভিন্ন আর কিছুই অনুভব করিত না। কাদম্বিনী সৌন্দর্য্যসাগরে তলস্পর্শ করিতে না পারিয়া, এই ভাব-তরঙ্গে নিমগ্না হইয়া সুখ-তৃপ্তি দুঃখ-কাতরতার চরমসীমায় উপ-নীতা হইত।

কাদম্বিনীর পিতার ঘরের পাশে একটী আমবাগান ছিল। অনেক সময়ে কাদম্বিনী সেই বাগানে থাকিত। গাছের দিকে চাহিলে পত্র-সৌন্দর্য্যে কাহাকে দিনরাত্রি জাগ্রত দেখিয়া চম-কিত হইত,—সেই মূর্ত্তি কখন দেখিত—কখন দেখিতে পাইত না। অদর্শনে হৃদয়ে ব্যথা পাইয়া কাঁদিত। সে কান্না কাদম্বিনীর অস্থি বিগলিত করিয়া অশ্রুকণাকারে প্রকাশিত হইত। কাদম্বিনী, সেই পুকুরের ঘাটে, মাঝে মাঝে আসিয়া জলে কত কি ভাব অধ্যয়ন করিত। কাদম্বিনী গাছের পাতায়, প্রকৃতির শোভায়, মানুষের মুখে কাহার লেখা,—গভীর ভাবে, পাঠ করিতে করিতে চমকিয়া উঠিত। এই জগতের শব্দস্রোতে বেদের অভ্রান্ত-বর্ণমালা দেখিয়া লোমাঞ্চিত হইত। এইরূপ দেব ও প্রকৃতি-ভক্তি-প্রবলা সতী কাদম্বিনী রজনীতে প্রায়

নিদ্রা যাইত না। পিতা অন্য ঘরে ঘুমাইত—কাদম্বিনী ভাব-ভরে অন্যমনে খিড়কী পুষ্করিণীর তীরে গিয়া ক্ষীণস্বরে গান গাইত। অন্ধকারে সে গান ছুটিয়া ফুলের পাপড়ী গুলিকে ফুটাইত। অন্ধকার তাহা শুনিতে শুনিতে শিশিরচ্ছলে ফুলের গায়ে, গাছের পাতায় অশ্রুবিসর্জ্জন করিত। জ্যোৎস্নায় সে গান পুকুরের জলে মিশিয়া তরঙ্গ-স্বরে মাধুরি বৃদ্ধি করিত। একটী গান সর্ব্বদা গাহিত, সেটী এই:—

জীবনে মরণে বধুঁয়ার সনে
দেখা কি হবে নারে!
সখি! কিছু লাগেনা ভাল।
প্রণয় কেমন, বুঝিনি এখন
বুঝাইয়ে কেবা দেবে রে;
সখি! সেই সখা নাকি জানেরে ভাল।
আমারে ভুলিয়ে
তাহারে লইয়ে
জীবন কাটাব কবে
আমি হারায়ে যাব—সেইরূপ সাগর মাঝারে।
জীবনে মরণে বধুঁয়ার সনে
দেখা কি হবে না রে!

কাদম্বিনী সেই গানে বিভোর হইয়া সমুদয় প্রকৃতিতে গানের মধুর প্রতিধ্বনি শুনিত। যত গাইত, ততই গানের সুর ভাব ভেদিয়া কাহাকে দেখিতে দেখিতে ধ্যান-নিমগ্না হইত।

——]:(•):[——

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

—:—০—:—

যে সময়ে পাপিষ্ঠ অনুপম ও ধীরেন্দ্র, কাদম্বিনীকে কলঙ্কিতা করিবার প্রয়াস পাইতেছিল, তখন কাদম্বিনীর বয়স ষোল বৎসর। যৌবনে ভক্তি-সমাগম হওয়ায়, কুপথে যাইবার কোন সম্ভাবনা আসে নাই। মন সর্ব্বদা দেব-ভাবে পরিপূর্ণ থাকিত। স্বামী-চিন্তা যখন করিত তখনও স্বামীকে দেবতার স্বরূপই দেখিত। ইষ্টদেবতা এক মূর্ত্তিতে স্বামী, অপর মূর্ত্তিতে ইষ্ট-দেবতা। স্বামী-চিন্তায় দেব-চিন্তাই হইত। স্বামী কোথায় আছেন, কি করিতেছেন, কাদম্বিনী পনর বৎসর বয়সেই অনুভব করিতে সক্ষম হইয়াছিল। স্বামী বিদেশে আছেন,—সংবাদাদি দেন না বলিয়া কাদম্বিনীর কোন ক্ষোভ ছিল না। কাদম্বিনীর কালীসাধনা চৌদ্দ বৎসর হইতে প্রবল হয়। প্রত্যহ নিয়মিতরূপে নাম জপ করিত। একটি একতারা ছিল,—সেইটী লইয়া রাত্রে টুংটুং স্বরে সাধনা করিত। কাদম্বিনীর তপস্যার ভাব চক্ষে প্রকাশিত হইত। কাহার দিকে সে দৃষ্টি পড়িলে সে আপন দৃষ্টিতে সে দৃষ্টির তেজ সহিতে পারিত না। তাহার আঘাতে পাপ-বোধ চীৎকার করিয়া উঠিত। নাম জপিতে জপিতে শরীর চৈতন্যশূন্য হইত। যখন বয়স পনর বৎসর, একদিন রাত্রে নাম জপিতে জপিতে বাহ্য জ্ঞান হারাইয়া মৃতবৎ হইয়া পড়িল—নিশ্বাস বন্ধ হইল—শোণিত-স্রোত রুদ্ধ হইল; সব যেন নাম শুনিতে থমকিয়া দাঁড়াইল। সেই ভাবে পৃথিবী

যেন প্রবল অঙ্গসঞ্চালনে আপনার গাত্র হইতে পাপ-কলঙ্ক দূরে ফেলিবার জন্য প্রয়াস পাইল। কাদম্বিনী ভিতরে এক ঘনীভূত নিত্য অখণ্ড জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিয়া আপন সৌন্দর্য্যে আপনি নিমগ্না হইল ; যেখানে জগতের প্রস্রবণ—সেই প্রস্রবণে শান্তি-বারিপানে হৃদয়ের জ্বালা নিবৃত্ত করিল। যেখানে শোভার শিকড়—সঙ্গীতের প্রারম্ভ—প্রকৃতির সূতিকা গৃহ,—ফুল যেখান হইতে ফুটে—তারকা যেখান হইতে আকাশে দীপ্তি দেয়—চাঁদ যেখানে গঠিত হইয়া পৃথিবীকে জ্যোৎস্নায় স্নান করায়—সেই একমাত্র পরিত্রাণের অবলম্বভূমিতে আপনাকে দৃঢ়ীভূত করিতে কাদম্বিনী প্রয়াস পাইতে লাগিল। যেখানে জ্যোৎস্না অবশেষে লীন হয়—কুহুস্বর মিশিয়া যায়—ফুলের গন্ধ আপন-অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলে, সেই দেশের যে শোভা কাদম্বিনী সৃষ্টি-রহস্যের ভিতরে যোগবলে জ্ঞানগোচর করিল, তাহা নিউটন, আর্য্যভট্ট স্বপ্নে ভাবেন নাই, আর্কিমিডিস, লাপলাস অনুমানে স্পর্শ করিতে সক্ষম হন নাই। যেখানে মানুষের বিজ্ঞান দর্শন আপনাদিগকে মহামূর্খ বলিয়া এক সময়ে পরিচয় দান করে, কাদম্বিনী সেই শিবসুন্দরচিন্ময়দেশ যেদিন দেখিল, সেদিন জগতের আদি অন্তের আভাস পাইয়া জড়ীয় সম্পর্ক ছাড়িয়া আপনাকে চিদানন্দ-সাগরে নিমগ্ন করিয়া কৃতার্থ হইল।

কাদম্বিনীর ভিতরে যে দেবভাবের স্ফুরণ হইতেছিল, কাদম্বিনীর আত্মা যে আপনার স্বরূপ দিন দিন স্পষ্টতর বুঝিতেছিল, তাহা কাদম্বিনীর পিতা পর্য্যন্ত বুঝিতে সক্ষম হন নাই। পাড়ার অনেকে কাদম্বিনীকে "পাগলী" বলিয়া স্থির করিয়াছিল। কেহ বলিত, কাদম্বিনী বায়ুরোগগ্রস্থ, নহিলে রাত্রে ঘুমায় না কেন,

একলা মাঠে ঘাটে যায় কেন? চাঁদ, তারা, আকাশ, ফুল, ফলের দিকে তাকাইয়া কাঁদে কেন?

কাদম্বিনী পিতার নিকটে গীতার কয়েকটী শ্লোক শিখিয়া মুখস্থ করিয়াছিল; তাহা আওড়াইতে আওড়াইতে বিশ্বাসের তেজে আপনাকে পর্ব্বত অপেক্ষা অটল এবং সমুদ্র অপেক্ষা বলশালিনী বলিয়া বোধ করিত।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

কাদম্বিনীর পিতা শ্রীধর লম্বা ও কৃষ্ণকায় ছিল। মাথায় পাতলা চুল থাকায়, যেন ভিতরে একটু একটু টাক পড়িতেছে বোধ হইত। প্রায় কোথাও যাইতে হইলে নামাবলী গায়ে দিয়া যাইত। শীতকালে লোহিত বনাত ব্যবহার করিত। শ্রীধর সংস্কৃতে পণ্ডিত ছিল। দেবদেবীর প্রতি তাহার অচলা ভক্তি ছিল। কোথাও সাধু ফকিরের সমাচার পাইলে, যত্ন করিয়া আলাপ করিতে যাইত।

একদিন শুনিল, চুঁচুড়ার ষণ্ডেশ্বর তলায় একটী সাধু আসিয়াছে। অনেক লোকে তাঁর নিকট যাইতেছে, তিনি একজন উন্নত মহাপুরুষ। বাস্তবিক সেই সাধুর নাম সেই সময় খুব প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। দলে দলে স্ত্রী পুরুষ তাঁর নিকট তখন যাতায়াত করিতেছিল শ্রীধরও একদিন ভক্তির সহিত তাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিতে বহির্গত হইল।

শ্রীধর ষণ্ডেশ্বর তলায় গিয়া দেখিল, গঙ্গার ঘাটে একটী

প্রকাণ্ড গোপাতার ছাতা দণ্ডায়মান রহিয়াছে। চারিদিকে অগ্নিকুণ্ড; মধ্যে জটাজুটবিভূষিত বিভূতি-পরিলেপিত এক প্রকাণ্ড কায় পুরুষ, চক্ষু মুদিয়া, প্রকাণ্ড জপমালা লইয়া বসিয়া আছেন। চারিদিকে নরনারীর একটি গোলাকার প্রাচীর। শ্রীধর অবনত দেহে, প্রাচীর ভেদ করিয়া সেই অগ্নিকুণ্ডের নিকটবর্ত্তী হইবা-মাত্র, সেই ভস্ম-পরিলেপিত পুরুষ, চক্ষু খুলিয়া দেখিয়া, শ্রীধরকে ইঙ্গিতে বসিতে বলিলেন। শ্রীধর প্রণাম করিয়া উপবেশন করিল। তখন সন্ন্যাসী একটু গম্ভীরস্বরে কহিলেন—"তুমি বড় ভাগ্যবান," বলিয়াই ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। ১০।১৫ মিনিট পরে আবার চক্ষু চাহিয়া বলিলেন—"অদৃষ্টে তোমার একটি মহাদুঃখ আছে, সেটীর আয়োজন হইতেছে, তজ্জন্য ভাবিত হইবে না, সেটি তোমার মেয়ের সৌভাগ্য।" কথা শুনিয়া শ্রীধর চমকিত হইল, ভাবিল আমার মেয়ের বিষয় কি প্রকারে জানিলেন; ইনি ত সামান্য পুরুষ নহেন। শ্রীধর এইরূপে ভাবিতেছে, এমন সময়ে সন্ন্যাসী আবার বলিলেন—"তোমার এমনই দুর্ভাগ্য যে, কাছে জ্ঞানের প্রস্রবণ চিনিতে না পারিয়া দূরে তাহার অন্বেষণ করিতেছ; যে বিদ্যাধরীকে জন্ম দিয়াছ, তাহার নিকটে যাহা আছে, বহুজন্মের সাধনায় আমাকে তাহা লাভ করিতে হইবেক।" সন্ন্যাসীর এই কথা শুনিবামাত্র শ্রীধর ভাবভরে রোমাঞ্চিত হইল, আপনার কন্যা সম্বন্ধে সাধু-বাক্য শুনিয়া, অপত্যস্নেহে বিগলিত হইয়া, অশ্রুমোচন করিতে লাগিল। আপন তনয়ার আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্বন্ধে যা অনুমান মাঝে মাঝে করিত, তাহা সাধু বাক্যে সিদ্ধান্ত হইয়াছে, দেখিয়া, আপনার আনন্দে আপনি পরিতৃপ্ত হইল। সন্ন্যাসী আবার

বলিলেন—"যাহা জানিবার সেখানে পাইবে—কন্যা বলিয়া অবহেলা করিও না, আমি যাহা তোমার প্রয়োজন তা দিয়াছি।" শ্রীধর কাঁদিতে কাঁদিতে সাধুকে প্রণাম করিয়া, ভিড় ভেদ করিয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিল। শ্রীধর ভিড়ের বাহিরে আসিবামাত্র কেহ কেহ শ্রীধরের কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসিল— "বাবাজি কি বল্লেন গা?" শ্রীধর কিছু বিশেষ না বলিয়া চলিয়া গেল।

শ্রীধর যখন সাধুবাক্যে উৎসাহিত হইয়া আপনাকে ভাগ্যবান ভাবিতে ভাবিতে পথ হাঁটিতেছিল, তখন অপরাহ্ণ। আষাঢ় মাস। আকাশে একখানা গাঢ়কৃষ্ণকায় মেঘ উঠিয়া আপনার অবয়ব বর্দ্ধিত করিতেছিল। দেখিতে দেখিতে ঝম ঝম করিয়া বৃষ্টি আরম্ভ হইল। শ্রীধর ছাতা মাথায় দিয়া কাদা ভাঙ্গিয়া বাটিতে পঁহুছিল। বাটির ভিতরে প্রবেশ করিয়াই দেখিল, কালীর সম্মুখে, কাদম্বিনী উপবেশন করিয়া কালীর নিকট আত্ম নিবেদন করিতেছে:—

মা! এ অভাগিনীর আর কতদিন বাকি? আবার কি জন্মগ্রহণ ক'র্ত্তে হবে। যে পাপের প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা ক'রছ, বুঝতে পেরেছি। তা যাহা তোর ইচ্ছা হ'ক। কলঙ্কের ভয় সব তোকে দিয়েছি, তবে বাবা আমার বৃদ্ধ হয়েছেন, এতে তাঁর মনোক্লেশের পরিসীমা থাকবেনা—ও! একি দেখাচ্ছ মা, বাবাকে আমার এই প্রায়শ্চিত্তে অংশভাগী ক'রে তাঁর পূর্ব্ব জন্মের পাপক্ষয় করাবে। তা ভাল, যত যায় পাপ, ততই ভাল। করালবদনি! আমার তুমিই সর্ব্বস্ব। তুমি একমূর্ত্তিতে পিতামাতা একমূর্ত্তিতে স্বামী—তুমি স্বামীরূপে যা লীলা ক'রছ, তাও বড়

মধুর। বাবা সে জন্য কাঁদেন কেন? বাবাকে জ্ঞানের অঞ্জন একটু দান কর। মা! আমি সব সহিতে পারি, বাবার কষ্ট এখনও সহিতে পারি না। এখনও মা। বাবার দুঃখে প্রাণে আঁচ লাগে।

স্তব করিতে করিতে, ভাষা ভাবভরে অভিভূত হইয়া কিয়ৎক্ষণ নীরব হইল—কাদম্বিনী আবার বলিল, "মা! আমাকে বাগানের ফুল না করে গভীর কাননের কুসুম কর। আমি নীরবে নিভৃতে ফুটিতে পারিলে সুখী হ'ব। আমার গন্ধ আমি চাহিনা—তোমার গন্ধে আমাকে আচ্ছন্ন কর—আমাকে যেন কেহ দেখিতে না পায়। পৃথিবীতে পাগলিনীর আবরণে থাকিয়া তোমার হৃদয়ে মিশিতে পারিলেই আমার মানবলীলার যা সাধ তা সার্থক হবে।"

শ্রীধর শুনিতে শুনিতে কাঁদিয়া ফেলিল—আপনার পাপবোধ প্রবল দেখিয়া, চুপ করিয়া উঠানে দাঁড়াইয়া, ভিজিতে ভিজিতে কাঁদিতে লাগিল। কাদম্বিনী স্তব বন্ধ করিয়া প্রেমভক্তিজড়িত-স্বরে পিতাকে সম্বোধন করিয়া ঠাকুরঘরের দাওয়ায় বসিতে আসন পাতিয়া দিল। পিতার কাপড় আর্দ্র দেখিয়া শুষ্ক বস্ত্র আনিয়া পরিতে বলিল। কাদম্বিনী দেখিল পিতার চক্ষু বাহিয়া অনুতাপাশ্রু প্রবাহিত হইতেছে। কাদম্বিনী ভক্তিপূর্ণ বচনে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা! ভিজে এসে কাঁদছেন কেন? সাধুর কথায় মনে যদি কিছু পেয়ে থাকেন যত্ন করুন।" শ্রীধরের অনুতাপবেগ প্রবলতর হইল। আপন তনয়ার এই অসাধারণ শক্তি অনুভব করিয়া ভাবিল, এ মেয়ে আমি কি পুণ্যে পেয়েছি।' পরে শ্রীধর কাদম্বিনীর মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল—"মা! তোর মনে কি

আছে জানিনা। তুই আমার কুঁড়েতে কেন জন্মেছিস।” বলিয়াই শ্রীধর প্রবলতর বেগে অশ্রুপাত করিতে লাগিল। কাদম্বিনী আপনার অঞ্চল দিয়া শ্রীধরের অশ্রু মুছাইয়া দিতে আরম্ভ করিবামাত্র শ্রীধর অনুভব করিল, যেন মা ভগবতী পদ্মহস্তে শ্রীধরের সেবা করিতেছেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে কাদম্বিনী শ্রীধরের পদ ধৌত করিয়া দিলে, শ্রীধর বলিল, মা! আমার কাছে বসে দুটো ধর্ম্মকথা বল শুনি।

কাদম্বিনী পিতার কথা শুনিয়া কাছে বসিল। বসিয়া পিতার ধর্ম্মপিপাসার্ত্ত মনকে শীতল করিবার জন্য বলিল, বাবা! পূর্ব্ব জন্মের পুণ্যবলে আমি তোমার ঘরে জন্ম গ্রহণ করেছি। তুমি ভগবানের কৃপায় আমার পিতা হয়েছ। আমি কি ধর্ম্ম কথা জানি যে বলিব। ঘরে মা কালী আছেন, তাঁর কাছে ধর্ম্ম কথা শুনিলে প্রাণ পরিতৃপ্ত হবে। আমি মূর্খা রমণী, মা আমার ঘরে বাঁধা হয়ে আছেন, কিসের ভয়। আমি মাকে একদিন প্রাণ ভরে ডেকে সাড়া পেয়েছিলাম, সেই অবধি আমি আর আমাতে নাই। সে মধুর স্বর আমার হাড়ে হাড়ে বীণা বাদন করিতেছে, আমার স্মৃতি সেই স্বরে জড়ীভূত হয়ে আর কোন পদার্থকে আশ্রয় দিতে চাহে না—আমার কাণ সে স্বরে পরিপূর্ণ হয়ে আর কিছু শুনিতে ভাল বাসে না। আমি সে নামের ব্যাখ্যা কি জানি? সে নাম আপনি আমার জিহ্বাযন্ত্রে ক্রীড়া করে, তাই সে নাম পেয়েছি—নামের গুণে নাম পেয়েছি—আমার গুণে পাই নাই। মাকে ডাকিলেই মা সাড়া দেবেন।” কাদম্বিনী আবার ভাবভরে বলিতে লাগিল :—

“সকলেই তাঁর নাম করিতেছে,—কিন্তু বুঝিতেছে না। জগ-

তের শব্দস্রোত তাঁরই নামের রূপান্তর মাত্র, প্রাণের ভিতরে যে ভাব তাহা বাহিরে অন্য ভাবে প্রকাশ পায়। সে নামে জগৎ গড়া। নামে মানুষ বাঁচে, অথচ নাম বুঝে না। যখন বুঝে, তখন সে শিহরে—আতঙ্কে কাঁপে—প্রেমে বিহ্বল হয়। তাঁর ইঙ্গিতে মানব আসে—বাড়ে—মরে। তাঁর ঠেলায় জগতের চাকা ঘুরিতেছে। তাঁহারই বিধানের অঙ্কপাতানুসারে মানুষ ভাবে—বলে। মানুষ তাঁর আঁক ছাড়িয়া পাশ ফিরিতে পারে না। যখন যার যাহা বুঝিবার প্রয়োজন, তখন তাহা প্রকৃতিস্রোতে আপনি ভাসিয়া আসে, খুঁজিতে হয় না। যার যাহা হবে না, সে শত চেষ্টা উদ্যমেও পাবে না। আমি কি বলিব—মূর্খা রমণী। বাবা! মা কালীর শরণ লইলেই সব বুঝিতে পারিবে।/

শ্রীধর শুনিতে শুনিতে স্তম্ভিত হইল। বলিল, অদৃষ্টচক্রের কথা বলিতেছ, আরও একটু বল, শুনে প্রাণ শীতল হউক। মা আরও যা তোর মনে আসে বল। আমার প্রাণটা পুড়ে রয়েছে আমার কাছে তোমার ধর্ম্মকথা বলতে কোন লজ্জা নাই মা।

কাদম্বিনী আবার বলিল:—

/ যাহা মোটা দেখি, তাহা কিছু নয়, ভবের কুহক মাত্র। যাহা আঁচে প্রাণে ভাসে, তাহা জগতের সূক্ষ্মসূত্র, যে সূত্রে জগৎ বাঁধা আছে। যাহা হাতে স্পর্শ করি তাহা ভ্রম মাত্র, কিন্তু যাহা অস্পর্শনীয় বলিয়াই বোধ হয়, তাহাই জ্ঞান—প্রকৃত পদার্থ। মন যাহাতে তৃপ্তি পায়, হৃদয় যাহাতে শান্ত হয়—প্রাণের পিপাসা যাহাতে ক্ষণ কালের জন্যও দূরীভূত হয়—তাহাই জ্ঞানের আঁচ, যাহাতে হৃদয়ে ভাবের উচ্ছ্বাস বাড়ে—হৃদয়ে দুঃখের প্রস্রবণ যেন উৎখাত হয়—তাহা কাল্পনিক হইলেও সত্য।

যাহাতে মানুষ মজিতে যায় না, কিন্তু যাহার কথা শুনিতে মন উৎসুক হয়—তাহাই মানুষের উচ্চ করণীয়।

এ জগৎ হাহাকারময়—রোদনশীল—কাতরতাগঠিত। যেখানে কাতরতা, রোদন, হাহাকার সেইখানে সত্যস্বর্গ। যেখানে তাহাদের উলটা সেখানে মিথ্যানরক। দুঃখে দুঃখ যায়, সুখে সুখ যায়। সুখ দুঃখ যেখানে নাই, সেইখানে আত্মজ্ঞান আছে, সিদ্ধি জাগিতেছে। পৃথিবীতে যাহা খুব ভাল, মানুষ তার সন্ধান পায় নাই--নাকে তার সৌরভ আসে নাই। বনে যেমন ভাল ভাল ফুল আছে, বাগানে নাই। মানবকাননের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফুল, কাননের কণ্টকাকীর্ণ ঝোপের কোথায় ফুটিয়া আছে, কেহ জানে না। কিন্তু সেই ফুলের বাসে জগতের বাস বাড়িতেছে। যাহাদিগকে লইয়া মানুষের দল ব্যস্ত, তাহাদিগের ভিতরে একটু গন্ধ আসিয়াছে মাত্র—গন্ধে ভোর-পুর যাঁরা তাঁদের সন্ধান কে পাবে—সে ঘনীভূত সুঘ্রাণে মানুষের বুদ্ধিরুচি বমি করিতে চায়।

শ্রীধর কাদম্বিনীর কথা শুনিতে শুনিতে, আত্মহারা হইয়াছিল,—যেন দ্বিতীয় গীতাবাক্যের মধুসাগরে নিমজ্জিত হইতেছিল। শ্রীধর জিজ্ঞাসিল, মা কালীকে কেমন দেখেছিস মা? জিজ্ঞাসা করিবামাত্র কাদম্বিনীর চক্ষের পাতা বুজিয়া গেল—কাদম্বিনী পাষাণময়ী মূর্ত্তির মত নীরবে মৃতবৎ বসিয়া থাকিল। শ্রীধর দেখিয়া ভয় পাইতেছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে দেখিল—কাদম্বিনীর মুখজ্যোতিতে কি এক পবিত্রজ্যোতির তোড় আসিয়া উপস্থিত হইল। কাদম্বিনী আর্দ্র বচনে ভাবে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল "বাবা! মাকে যে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না! তাঁকে

যে এপর্য্যন্ত কোন শাস্ত্র স্পর্শ করিতে পারেন নাই। তাঁহাকে প্রকাশ করিতে গিয়া ঋষিদের ভাষা যে আড়ষ্ট হইয়াছে—তাঁহাকে দেখাইতে গিয়া ভক্তের হাত যে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে! যে অনন্ত আকাশে মার এলো চুল রাখিবার স্থান কুলায় না—আমি তত বড় মার কথা যে কিছুই জানিনা! বলিতে বলিতে কাদম্বিনী ভাবভরে কেমন হইয়া গেল—মৃতের ন্যায় মৃত্তিকায় পতিত হইল। পিতা বিশ্বাসের জোরে ভক্তির দুর্জ্জয় স্বরে কাদম্বিনীর কাণের কাছে "কালী" নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। সেই নাম কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়া কন্যার বাহ্যজ্ঞান জাগ্রত করিল। শ্রীধরের এরূপ কন্যালাভ বহু জন্মের তপস্যার ফল।

নবম পরিচ্ছেদ।

——:]—(•)—[:——

একদিন আষাঢ়ের সন্ধ্যার পর ধীরেন্দ্র আপনার চণ্ডীমণ্ডপে একখানি ছেঁড়া মাদুরে বসিয়া আছে। পশ্চিমাকাশে একখানা কাল মেঘ ভীষণ মূর্ত্তিতে উঠিয়াছে—বাতাস শীতলভাবে অল্পঅল্প বহিতেছে। আকাশের মাঝে তখন সোনার চাঁদ ভুবনমোহন বেশে দেখা দিয়াছে—চারিদিকে নক্ষত্র ফুট্ ফুট্ করিতেছে। দেখিতে দেখিতে মেঘখানা দেহ বাড়াইয়া চাঁদের পশ্চিমাংশের নক্ষত্রগুলিকে ঢাকিয়া ফেলিল—চাঁদটীকেও আচ্ছন্ন করিল। ধরা অন্ধকারে ডুবিল। বাতাস একটু প্রবল হইল; মেঘ সমুদয় আকাশ ব্যাপ্ত করিল। অন্ধকারে খদ্যোৎ চক্‌মক্ করিতেছে,—

গাছের মাথা সকল নড়িতেছে—নারিকেলের লম্বা লম্বা পাতা সকল দুলিতেছে—বাঁশ গাছের ডগা গুলা দুলিতেছে। একটা কুকুর চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখস্থ পথ দিয়া ছুটিয়া গেল। হঠাৎ একটা লণ্ঠনের আলো আসিতেছে। ধীরেন্দ্র বসিয়াছিল দাঁড়াইল। আলোটী সম্মুখ দিয়া যায় দেখিয়া ধীরেন্দ্র জিজ্ঞাসিল—কে ও?

শ্রীধর ভট্টাচার্য্য;—কেন?

এদুর্য্যোগে কোথায়?

ভাগনের বাড়ী—ভাগনের বড় ব্যারাম। কথা কহিতে কহিতে আলোক সহিত শ্রীধর ধীরেন্দ্রের দৃষ্টি-বহির্ভূত হইল। ধীরেন্দ্র পাইচারি করিতে লাগিল—ভাবিতে লাগিল। ভাবে, আর এক একবার চণ্ডীমণ্ডপের ধারে আসিয়া অবনত মস্তকে আকাশে মেঘের অবস্থা দর্শন করে। ধীরেনের মনে একটা ভাবনার মেঘ উঠিয়াছিল; ধীরেন্দ্র ভাবিতেছিল,—এমন সুযোগ। আকাশে মেঘ—রাত্রি—অন্ধকার—শ্রীধর ঘরে নাই—এমন সুবিধা। এ সুবিধা ছাড়িব কেন?

আবার ভাবিতেছিল:—

শ্রীধর কাদম্বিনীকে কি একলা রাখিয়া গিয়াছে?

না কখনও নয়।

কিন্তু শ্রীধরের তো বাড়ীতে আর কেহ নাই, কাদম্বিনীর কাছে তবে কে আছে?

কোন প্রতিবাসী?

তা থাকুক না ভয় কি?

আমি কলে কৌশলে কি কাদম্বিনীকে বাড়ীর বাহিরে আনিতে পারিনা?

নিশ্চয় পারি।

কোথায়—বাড়ীর বাহিরে কোথায়?

খিড়কী পুকুরের ঘাটে।

সেখানে কেহ নাই—নির্জ্জন বন—পুকুরের চারিদিকে ঘন বন। এতো মন্দ সুবিধা নহে।

এখন বাড়ীর ভিতরে কোনদিক দিয়া যাব?

সদর বাড়ী দিয়া।

না—যদি কেহ দেখিয়া ফেলে।

তা ভয় কি?

কিছু ভয় নাই—এপর্য্যন্ত কাহাকে ভয় করিয়াছি কি?

কত স্ত্রীলোককে সদর বাড়ী দিয়াই বাহিরে আনিয়াছি। ধীরেন্দ্র আবার কারে ভয় করে? গাঁ ধীরেন্দ্রের ভয়ে কাঁপে লোকে চেষ্টা করিতে আর বাকি রাখে নাই। জেলে দিবার ষড়যন্ত্রও করিয়াছিল কিন্তু কোন শালা আমার কিছুই করিতে পারে নাই। আমি ধীরেন্দ্র—আমি সদরকে খিড়কী এবং খিড়কীকে সদর করিতে পারি।

তবে সদর দিয়া যাবনা। কাজ কি? আমার ভয় না থাকিতে পারে, কিন্তু সে তো মেয়ে মানুষ—তার ভয় হতে পারে।

যদি সে না আসে?

জোর—জবরদস্তি! ধীরেন্দ্রের প্রাণ হইতে প্রাণ বাঁচান একটা সামান্ত পূজুরি বামুনের মেয়ের কাজ নয়। সে বিষয়ে ধীরেন্দ্র ঠিক আছে—ধীরেন্দ্র আপনার বল আগে বুঝিয়াছে।

তবে খিড়কী দিয়াই যাব।

তাই ভাল।

তবে এই বেলা। আর দেরি করা নয়। দেখি আকাশটা দেখি।

ধীরেন্দ্র আবার পাপ-দৃষ্টিতে আকাশ দেখিল—আকাশে বিদ্যুত চকমক্ করিল—নিমেষের মধ্যে চতুর্দ্দিক জ্যোতির্ম্ময় হইল—তারপর শব্দ হইল—"কড় কড় কড় কড় কড়াৎ"।

ধীরেন্দ্র তোমার কড় কড়ানিকে বড় ভয় করে কিনা? বলিয়া ধীরেন্দ্র চণ্ডীমণ্ডপ হইতে নামিল। পথে গিয়া একবার দাঁড়াইল। তখন বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি পড়িতেছিল—মাঝে মাঝে দুই একটা দমকা বাতাসও গর্জ্জিতেছিল। ধীরেন্দ্র আকাশের দিকে চাহিল—পথের চারিদিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিল। জনপ্রাণীর শাড়া নাই। কেবল আকাশ আঁধারপূর্ণ গাম্ভীর্য্যময়। পথের চারিদিকে নিবিড় অন্ধকার—যেখানে গাছপালা সেখানে অন্ধকার আরও নিবিড়তর। গ্রামে কাহারও শাড়া নাই—কেবল বৃষ্টির টিপ্‌টিপ্ শব্দ ও আকস্মিক বায়ুপ্রবাহের গর্জ্জনধ্বনি। কেবল দুএকটা মেটে ঘরের জানালার ফুটা দিয়া একটু একটু প্রদীপের আলো দেখা যাইতেছে। ধীরেন্দ্র সেই দুর্যোগ মাথায় ধরিয়া রিপুর তাড়নায় অগ্রসর হইল। শ্রীধরের বাটীর কাছে পঁহুছিল। সদর দরজা পার হইয়া ধীরে ধীরে পায় চব্ চব্ শব্দে খিড়কীর দিকে চোরের মত চলিল।

অন্ধকারে মাথার উপরে নারিকেল তাল ও সুপারি গাছ সকল মাথা নাড়িতেছে—বৃষ্টি মাথায় গায় পড়িতেছে; ধীরেন্দ্র ভিজিতে ভিজিতে চোরের মত চলিল।

খিড়কীর ধারে পঁহুছিল। জঙ্গলের ভিতর দিয়া সাপের গর্ত্তের উপর দিয়া—কাঁটা ভাঙ্গিয়া ধীরেন্দ্র চলিল।

শেঁকুলের কাঁটায় ধীরেন্দ্রের অঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হইল;—ধীরেন্দ্র ভ্রূক্ষেপ না করিয়া চলিল। পুকুরের গর্ভে নামিল। নামিয়া সান বাঁধান ঘাটের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিল। তখন বৃষ্টির তেজ বাড়িয়াছে—বৃষ্টি-বিন্দুসকল সতেজে গায় ঠিকরাইয়া পড়িতেছে; অন্ধকার ঘুট ঘুট করিতেছে। গাছের পাতা দিয়া বৃষ্টির জল টুপ টাপ শব্দে পড়িতেছে; পুকুরের জলে বৃষ্টির এক প্রকার শব্দ হইতেছে। পুকুরে বেঙ, উইচিঙ্গড়া ডাকিতেছে। ধীরেন্দ্র কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইল। তখন সে খুব ভিজিয়াছে—তার মাথা ও দাড়ি বাহিয়া বৃষ্টির ধারা ঝরিতেছে। ধীরেন্দ্র দাঁড়াইয়া ঘাটের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিল। বিদ্যুৎ চকমক্ করিল, নিমেষের জন্য চারিদিক আলোকিত হইল। এত দুর্য্যোগে—এত অন্ধকারে—এত বৃষ্টিতে ঘাটে "ও কে"?

ভূত নাকি?

"ভূতই হও আর শাঁকচুন্নিই হও আজ তোমায় গ্রাস করিব"—এই ভাবিয়া ধীরেন্দ্র অগ্রসর হইল। ঘাটে উঠিল।

সেই মূর্ত্তি তখন ঘাটে বসিয়া আছে—নড়ন চড়ন নাই—যেন পাষাণময়ী মূর্ত্তি। ধীরেন্দ্র সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিল—পাষাণের মত সেই মূর্ত্তির দিকে তাকাইয়া নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিল। বিদ্যুৎ আবার চকমক্ করিল। ধীরেন্দ্র চিনিল কাদম্বিনী।

কাদম্বিনী তখন ধ্যান-নিমগ্না। কাদম্বিনী প্রকৃতিতে আপন-হারা। কাদম্বিনী মহাপ্রকৃতি অনন্ত শান্তিতে আপন-হারা সন্ধ্যার পর পিতা বাহিরে যাইলে কাদম্বিনী প্রকৃতির অন্ধকারময় কালরূপে আপন আরাধ্য দেবতার মহাকাল-রূপ দেখিয়া বিভোর

হইয়াছিল। তার পর ঘাটে আসিয়া আপনাকে মহাকালে ছড়াইয়া ধ্যান-নিমগ্না। অন্তরে চিদাকাশে জাগ্রত তাই বহি-রাকাশে চেতনা-হারা। কাদম্বিনী ধ্যান-নিমগ্না হইয়া প্রকৃতির গাম্ভীর্য্যে গাম্ভীর্য্যময়ী।

সে গাম্ভীর্য্য-মূর্ত্তির কাছে দাঁড়াইয়া পাষণ্ড ধীরেন্দ্র নির্ব্বাক। কেন নির্ব্বাক তাহা অবোধ বুঝে নাই--প্রকৃতির প্রতাপে নির্ব্বাকই থাকিল। কিয়ৎক্ষণ পরে কাদম্বিনীর ধ্যান ভঙ্গ হইল—চক্ষু চাহিয়াই দেখিল সম্মুখে 'কে' ?

কাদম্বিনী গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসিল 'কেগা' ?

উত্তর নাই।

বলি কে ও তুমি?

উত্তর নাই।

উত্তর দিতে ভয় যদি এখান হোতে যাও আমি জলে গা হাত ধোব ; বলিয়াই কাদম্বিনী পুকুরের জলে নামিল। জলে গা বুড়াইয়া ডুব দিল। কাদম্বিনীর ভয় নাই, ভ্রূক্ষেপ নাই, আপনার ইষ্টদেবতার রূপ-স্মৃতিতে তখনও বিভোর। জল হইতে কাদম্বিনী ঘাটের দিকে চাহিল—ঘাটে মানুষ নাই।

কাদম্বিনী জল হইতে উঠিল। ঘাটের সিঁড়ি অতিক্রম করিল। বিদ্যুৎ চক্‌মক্ করিল। সেই জ্যোতিতে দেখিল নিকটে কলা গাছের পাশে আবার সেই মূর্ত্তি।

কাদম্বিনী প্রথমে ভাবিয়াছিল চোর। এখন ভাবিল কোন দুষ্ট লোক মন্দ অভিপ্রায়ে আসিয়াছে। কাদম্বিনীর গা ভয়ে সিহরিয়া উঠিল—বুক ভয়ে কাঁপিল। থমকিয়া দাঁড়াইয়া বিপদ-ভঞ্জন ইষ্ট দেবতাকে হৃদয়ের তেজে স্মরণ করিল—সে ভয়

অমনি দূরীভুত হইল। কাদম্বিনী সাহসে ভর দিয়া জিজ্ঞাসিল "কেগা তুমি?"

তখন অন্ধকারে গাছের পাশ হইতে উত্তর হইল,"আমি ধীরেন্দ্র"।

সর্ব্বনাশ। এখানে কেন?

তোমার জন্য?

কথাটী শুনিবা মাত্র কাদম্বিনীর আপাদ মস্তক রাগে ভরিয়া গেল। কাদম্বিনী ইষ্ট দেবতার "মাভৈ" রব অন্তরে শুনিতে পাইয়া বলিল "তবে আমার সঙ্গে এস—জলে ভিজিতেছ কেন"?

কাদম্বিনী পাগলিনীর ন্যায় বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিল।

ধীরেন্দ্র পশ্চাতে—কাদম্বিনী বলিল "ওখানেই থাক"।

কাদম্বিনী আপন ঘরে প্রবেশ করিয়া গৈরিক শাটী পরিধান করিল। দ্রুতবেগে গিয়া কালীর ঘরের দ্বার খুলিল। ঘরে আলো জ্বলিতেছে—ধীরেন দেখিল আলোকে মহাকালী মূর্ত্তি। ধীরেন্দ্র একদৃষ্টে কালী মূর্ত্তির দিকে তাকাইয়া থাকিল। তাকাইতে তাকাইতে ধীরেনের মনটা পাগলের মত হইল। আর সে দিকে তাকাইল না। তখন কাদম্বিনী কালীর ঘর হইতে ডাকিল "এখানে এস"।

ধীরেন সাপের মত স্থুড় স্থুড় করিয়া চলিল। কালীর ঘরে প্রবেশ করিল। কাদম্বিনী তখন কালীর সম্মুখ হইতে কালীর পিছনে গিয়া দাঁড়াইল। ভয় পাইলে সন্তান যেমন পিতা মাতার আড়ালে লুকায়—কোলে আশ্রয় লয়, আজ কাদম্বিনী মহা বিপদে পড়িয়া তার মার আড়ালে লুকাইল। গরিব পুজুরি বামুনের মেয়ে নিরাশ্রয়া অল্প বয়স্কা রমণী আপনার ভক্তি ও বিশ্বাসের হুকুম শুনিয়া সেই কালী মূর্ত্তির আড়ালে যেন অসংখ্য

পরাক্রমশালী সৈন্য পরিপূর্ণ দুর্গের আশ্রয়ে লুকাইল। এই ভারতবর্ষে বিপদে পড়িয়া আপনার সতীত্ব রক্ষার জন্য অনেক সাধ্বী কাদম্বিনীর মত ইষ্ট দেবতার আশ্রয়ে লুকাইয়া সতীত্ব রক্ষা করিয়াছেন—এই মহাতত্ত্ব অধঃপতিত ভারতবর্ষ ভুলিয়াছে বলিয়াই ভারতের এত দুর্দ্দশা। কাদম্বিনীর পিতা যখন রাত্রে বাহিরে যায় তখন কাঁদিতে কাঁদিতে কালীর চরণে কন্যার ভার সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে বাহিরে চলিয়া যায়। শ্রীধরের বিশ্বাস, তার মেয়েকে যদি কালী রক্ষা না করেন তো আর কে রক্ষা করিবে! কাদম্বিনী তাই মনের অটল বিশ্বাসে মার আড়ালে লুকাইল। লুকাইয়া মর্ম্মভেদী স্বরে পাগলিনীর মত মার চরণের দিকে চাহিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "মা! বাবা ঘরে নাই তুই আছিস। বাবা কাঁদিতে কাঁদিতে আজ তোর হাতে আমায় সমর্পণ করে গেছেন। অমার ধর্ম্ম তুই রক্ষা না করিস তো এই খাঁড়া গলায় দিয়া তোর পিছনে প্রাণত্যাগ করিব"। সেই মর্ম্মভেদী স্বর শুনিয়া ধীরেনের প্রাণে চমক লাগিল। ধীরেন্দ্র ধীরে ধীরে পাগলের মত মস্তক উত্তোলন করিয়া কাদম্বিনীর মুখের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিল। তখন কাদম্বিনীর চোখে যেন আগুণ জ্বলিতেছে—আগুণে অশ্রুজল চক্‌মক্‌ করিতেছে—সে অশ্রুজলপূর্ণ দৃষ্টি তেজোপূর্ণ—ভীতিসঞ্চারক,—মুখের লাবণ্যে একটা মহা শক্তি ফুটিয়াছে। সে তেজোপূর্ণ সতীমূর্ত্তি ধীরেনের পক্ষে অসহ্য বোধ হইল। ধীরেন মস্তক অবনত করিল। ভক্তিপূর্ণ প্রার্থনার ভিতর হইতে কাদম্বিনীর হৃদয়ে দুর্জ্জয় বলের আবির্ভাব হইয়াছে। কাদম্বিনী তখন মহাতেজে তেজস্বিনী; তখন রমণীহৃদয়ে অসুরদলনাশিনীর মহাবল দুর্জ্জয় বিক্রম প্রকাশ করিতেছে।

তখন কাদম্বিনী পদাঘাতে সহস্র ধীরেনের বুক ভাঙ্গিতে পারে। কাদম্বিনী বলিদানের খাঁড়া হাতে লইয়া ধীরেনকে ডাকিল "পাপিষ্ঠ! আমার সতীত্বনাশ করিবি? এই আয়—আজ তোর রক্তে মার পা ধৌত করিয়া দেব।"

কাদম্বিনী আবার বজ্র গম্ভীর স্বরে, যেন আকাশ পাতাল ও ধীরেনের প্রাণ কাঁপাইয়া বলিল, "বসিয়া থাকিলি কেন?—সতী যদি হই—স্বামীতে যদি মতি থাকে—দেবতায় যদি বিশ্বাস থাকে তো তোর বাবার সাধ্য নাই আমার অঙ্গ স্পর্শ করে।"

কাদম্বিনী নীরব হইল। ধীরেন পাগলের মত আবার কালী মূর্ত্তির দিকে ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে তাকাইল। ধীরেন দেখিল সে মৃত্তিকাময়ী মূর্ত্তি যেন জীবন্ত ভাব ধরিয়াছে—সে চোখে জীবন্ত জ্যোতি জ্বলিতেছে—মাটীতে যেন মাংস গজাইয়াছে—প্রাণ ফুটিয়াছে—যেন মাটী কথা কহিতে উদ্যত! দেখিতে দেখিতে আবার কাদম্বিনীর মুখের দিকে পাগলের ন্যায় দৃষ্টিক্ষেপ করিল। তখন সে কাদম্বিনীকে দেখিতে পাইল না। তখন কাদম্বিনীরমাংস মূর্ত্তিতে কালীমূর্ত্তি যেন মিশিয়া গিয়াছে। জলে রৌদ্র মিশিলে যেমন হয়, অঙ্গারে আগুণ মিশিলে যেমন হয়, কাদম্বিনীতে কালী মিশিয়া যেন সেইরূপ হইয়াছে। কাদম্বিনীর মুখে কালীর মুখের জ্যোতি মিশিয়াছে—তার চাহনিতে কালীর চাহনি একত্রিত হইয়াছে। ধীরেনের পক্ষে তাহা অসহ্য। ধীরেনের পাষাণ বুকের রক্তস্রোত দ্রুত বহিল—বুক কাঁপিল—শরীরের শিরা, ধমণী, হাড় পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল। ধীরেন দাঁড়াইয়াছিল মাথায় হাত দিয়া কালীর সম্মুখে অবনত মুখে বসিয়া পড়িল।

সাপ যেমন মন্ত্রে মুগ্ধ হয়, ধীরেন তখন সেইরূপ কালীমন্ত্রে

মুগ্ধ হইল। পাপিষ্ঠ দুচক্ষু মুদিয়া উপু হইয়া হেঁটমুখে বসিয়া থাকিল। লৌহময় হৃদয়-কবাটে যেন একটা ভীম বল আসিয়া আঘাত করিতে লাগিল—সেই কবাট খানা খুলিবার প্রয়াস পাইল। বুকের রক্ত কাঁপিয়া উঠিল—মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ড গভীর দীর্ঘ নিশ্বাসে স্ফীত ও কুঞ্চিত হইতে থাকিল। ধীরেনের বুদ্ধিতে ধাঁধাঁ লাগিল। যেখানে প্রাণের প্রস্রবণ সেখানটী শুকাইবার মত বোধ হইল—ধীরেন্দ্র অন্তরের ঝঞ্ঝাবাতে কিয়ৎকালের জন্য আপনাকে হারাইয়া ফেলিল। সে কোথায়?—কি করিতে আসিয়াছিল সমুদয় একবারে ভুলিয়া আপনার চৈতন্যকে এক অজানিত দেশে আবদ্ধ করিয়া কিয়ৎকালের জন্য বজ্রাহতের ন্যায় বসিয়া থাকিল। তার পরে কাল সর্পের মত একটা প্রাণ-ভেদী দীর্ঘশ্বাস ছাড়িল—সে নিশ্বাসে ঘরের বায়ু কাঁপিল। ধীরেন ঘরের দ্বারের দিকে পাগলের মত চাহিল;—একি! দ্বারে সেই নৃমুণ্ডমালিনী কালীমূর্ত্তি তেমনি জীবন্তভাবে—তেমনি ঘনীভূত চৈতন্যরূপে দাঁড়াইয়া আছেন আর পশ্চাতে সেই সতী কাদম্বিনী তেমনি খাঁড়া-হস্তে ধীরেনকে কাটিবার জন্য তেমনি তীক্ষ্ণ পাপ-ভেদী দৃষ্টিতে দাঁড়াইয়া আছে। ধীরেন্দ্র আবার চক্ষু অবনত করিল—চক্ষু রগড়াইতে লাগিল। আবার ঘরের অন্যদিকে চাহিল; কিন্তু যে দিকে চাহে সেই দিকেই নৃমুণ্ডমালিনী কালীমূর্ত্তি আর পশ্চাতে কাদম্বিনী। ধীরেন্দ্র তখন কাঁপিতে কাঁপিতে কর যোড়ে প্রণাম করিল। ধীরেনকে কালী-প্রণাম করিতে দেখিয়া কাদম্বিনী কালীর পশ্চাত হইতে ধীরেনকে আশীর্ব্বাদ করিল—"আজ হইতে ধর্ম্মে মতি হউক।" কাদম্বিনী আশীর্ব্বাদ করিয়াই সে ঘর হইতে চলিয়া গেল—ধীরেন কিন্তু তাহা জানিতে পারিল

না। ধীরেন এই প্রথম দেবতা প্রণাম করিল। জন্মিয়া অবধি কখনও কাহাকেও প্রণাম করে নাই। আজ তাহার এই প্রথম প্রণাম।

প্রণাম করিবার পর উঠিয়া দাঁড়াইল—কালীমূর্ত্তির দিকে আবার চাহিল—এবারে কাদম্বিনীকে আর দেখিতে পাইল না। ঘরের দ্বারের দিকে চাহিল—এবারে দ্বারদেশে আর সে সব মূর্ত্তি দেখিল না। তখন ধীরেন দ্রুত বেগে পলায়ন করিল—খিড়কী পুকুরের পাড় পার হইয়া কখন ধীরে ধীরে চলিল, কখন ছুটিতে লাগিল কখন বা পাগলের ন্যায় পথে দাঁড়াইয়া এক দিকে তাকাইয়া কি ভাবিতে লাগিল। তখন বৃষ্টি মুসল ধারে পড়িতেছে—আকাশে বজ্রনাদ গর্জ্জিতেছে—ধীরেন সেই দুর্য্যোগে অন্তর্দাহে পাগলের ন্যায় আপনার গৃহাভিমুখে চলিল। যেন সাপ আপনার বিষদন্ত হারাইয়া আরক্তমুখে আপনার গর্ত্তে ফিরিতেছে।

দশম পরিচ্ছেদ।

ধীরেন্দ্র আপনার চণ্ডীমণ্ডপে পঁহুছিল। ভিজা কাপড়ে—ভিজা মাথায়—জলধারাপূর্ণ দেহে দাঁড়াইল।—যেন মাংসগঠিত মূর্ত্তি নহে—যেন পাষাণমূর্ত্তি। অনুতাপ সংমিশ্রণে ধীরেন আপনাকে বাস্তবিক পাষাণময় অনুভব করিতেছে। শ্বাস প্রশ্বাস যেন মড়ার মাথার ভিতরে বায়ুপ্রবাহের ন্যায় অনুভূত হইতেছে।

দাঁড়াইয়া সম্মুখে ভীষণ প্রকৃতির দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিল। নিজ প্রকৃতির ভীষণতা সে বাহ্যপ্রকৃতির ভীষণতা অপেক্ষাও ভয়াবহ! আর সেই ভীষণ প্রকৃতিতে সে যেন একমাত্র ভীষণতম রাক্ষস! যেন নরক জীবন্ত মূর্ত্তিতে ধীরেনের সঙ্গে একীভূত—যেন জগতের হিংস্র জন্তুদিগের একত্রিত হৃদয়, প্রাণ, ধীরেনের হৃদয় প্রাণে জীবন্ত রহিয়াছে।—ধীরেন এতদিন পরে তাহা বুঝিতে পারিয়াছে।—বুঝিতে পারিয়া একটা নূতন পাপ-বিনাশিণী মূর্ত্তিতে প্রকৃতির দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিতেছে। যে দিকে চাহে কিয়ৎকালের জন্য চাহিয়াই থাকে;—চাহিয়া আপনার পাপকীর্ত্তি সকল সেই অন্ধকারে যেন লুক্কায়িত দেখিয়া ভয়ে শিহরিয়া উঠে। যেখানে দাঁড়ায় কিয়ৎক্ষণের জন্য দাঁড়াইয়াই থাকে—দাঁড়াইয়া আপনার অস্তিত্বটাকে একটা জীবন্ত পাপমূর্ত্তির ভিতরে—একটা পচা নরকঙ্কালের ভিতরে অনুভব করিয়া আতঙ্কিত হয়।

ধীরেন চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া পড়িল। অনুতাপ-দগ্ধ ধীরেন, পাপিষ্ঠ ধীরেনকে বধ করিতে নরঘাতকমূর্ত্তিতে উপবেসন করিল বসিয়া আকাশের ভীষণ কাল মূর্ত্তির দিকে চাহিতে চাহিতে মাঝে মাঝে অজগর সর্পের মত, বুকের হাড় কাঁপাইয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে লাগিল। পাপ যাতনাটা যখন প্রকৃতির ভিতর ঘনীভূত হয়,—পাপ-বমনোদ্যমটা যখন অন্তরাত্মাকে অস্থির করিতে থাকে,তখন ধীরেনের জীবনাধারটা ফাটিবার মত বোধ হয়, ধীরেন তাহাতে অধীর হইয়া পড়ে। জীবনে এযাতনা ধীরেন কখন অনুভব করে নাই। ধীরেন যাতনায় অস্থির হইল—আর সহ্য হয় না। ধীরেন ভূমে লুটাইয়া পড়িল—গায়ে পাপ ফুটিতে থাকিল,মাথায় দংশিতে লাগিল—পৃথিবী যেন অসংখ্য বিষধর সর্পের বিষদন্তে

পরিপূর্ণ;—ধীরেন তাহারই উপরে লুটাইতে থাকিল। লুটাইতে লুটাইতে হাত পা ছুঁড়িতে লাগিল—বুকে করাঘাত করিল—মাথার যাতনা কমাইবার জন্য মাথায় চুল ছিঁড়িতে থাকিল—ভূমে মুখ নাক রগড়াইতে লাগিল। ধীরেনের হাত পা ছেঁচিয়া কপাল ছেঁচিয়া রক্ত বাহির হইল;—সাপের হলাহলের মত মুখ দিয়া গোটা লাল ঝরিতে থাকিল। কিন্তু যাতনা যায় না! কমে না! ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে সে ভীম যাতনার এক একটা উদ্বেগে এক একটা নিশ্বাসে নরকের মূর্ত্তি—নরকাগ্নির উত্তাপ! পাপের এতই জ্বালা! প্রাণ যে ফাটিয়া যায়! হে অনুতাপের অশ্রুজল! হে স্বর্গলোকের বৃষ্টিধারা! তুমি আজ কোথায়? অশ্রুজল দেখা দিল না। পাষাণ প্রাণ তত উত্তাপেও গলে নাই! এখনও বাকি আছে! পাপ যন্ত্রণার আরও বাকি আছে!!

ধীরেন যাতনায় উঠিয়া দাঁড়াইল। পাগলের ন্যায় একগাছা মোটা দড়ি আড়কাটা হইতে পাড়িল। সেই দড়িতে ফাঁসি বাঁধিয়া আড়কাটায় টাঙাইল। হতভাগা অনুতাপ যাতনা হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য গলায় দড়ি দিয়া মরিবে! ধীরেন ক্ষিপ্তের ন্যায় আত্ম-ঘাতীর ভীষণতম মুর্ত্তি ধরিয়া ফাঁসিতে গলা প্রবেশ করিয়া দিতে অগ্রসর হইল! হঠাৎ কড় কড়নাদে বজ্রধ্বনি হইল—তাহা দেবতার ভীষণ তিরস্কার। পাপিষ্ঠ গলা ফাঁসির ভিতরে প্রবেশ করিয়া দিতেছে পাপ যাতনায় অধীরপ্রাণ ধীরেন জীবনের মাথায় জলাঞ্জলি দিয়া মৃত্যু মুখে অগ্রসর হইতেছে এমন সময়ে সেই চণ্ডীমণ্ডপের অন্ধকারের ভিতর হইতে সেই অন্ধকারাবৃত অনন্ত প্রেম-সমুদ্র হইতে এক স্নেহের স্বর বিনির্গত হইল:—

অ। তাতো হবেই—এমন চেহারা তো আর কারো নাই। ঠানদিদি! আমার চেহারা আর কবিতা এছটি আর কাতেও মিলবে না। কবিতাতে কথা ক'য়েই কত লোককে ফাঁদে ফেলেছি। আমি ঠানদিদি! তার সঙ্গে কবিতাতেই কথা কব।

চাঁ। তা এখন টাকা বালা কই?

অ। তুমি একটু বস—আমি গে আনি।

চাঁ। আর আমার টাকা?

অ। সে হ'লে পাবে, তার আর ভয়কি?

চাঁ। না ভাই আমার খরচ পত্র ফুরয়েছে—আমাকে আগামী না দিলে হবে না, সে যে মেয়ে! ১০৲ টাকার কাজ নয়। ভবিষ্যতে আমায় হয়তো কত বিপদে পড়্তে হবে! কাজনি ভাই—ভাল মানুষের মেয়েকে মজান—মহা পাপ। এ বৃষ্টিতে আমি ভিজ্তে পার্বো না। দেবেন তো ভারি। আমার টাকা আনগে, তবে যাব।

অ। আচ্ছা তাই হবে। "তুমি ব'স, আমি আনিগে।" বলিয়াই অনুপম গৃহযাত্রা করিল। ছাতা মাথায় দিয়া ভিজিতে ভিজিতে গৃহে চলিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিল। আপন শয়ন কক্ষে গিয়া দেখিল—স্ত্রী অঘোরে নিদ্রা যাইতেছে। অনুপম কাছে গিয়া বসিল। গায়ে হাত দিয়া দেখিল—নাকের কাছে হাত দিয়া নিশ্বাস অনুভব করিয়া বুঝিতে পারিল, স্ত্রী গভীর নিদ্রায় অভিভূতা। একটু জোরে গা ঠেলিয়া ডাকিল—শাড়া পাইল না। তখন আস্তে আস্তে বালা ধরিয়া হাতের উপর দিয়া সরাইতে লাগিল। ডান হাতের বালাটী অপসারিত করিল। তারপর বাম হাতের বালা আক্রমণ করিল—বালা আকর্ষণ করিতে করিতে যখন হাতের কব্জি পার হইল, তখন স্ত্রী একটু যেন চমকিত হইল, অমনি স্বামী বালাটী ছাড়িয়া দিয়া বাহিরের চোরের মত চুপ করিয়া বসিয়া থাকিল। পরে যখন স্ত্রীর নিদ্রা খুব গাঢ় বোধ হইল, তখন আস্তে আস্তে বালাটী হাত হইতে বাহির করিয়া লইল।

তুগাছি বালা লইয়া টাকার বিষয় ভাবিতে লাগিল। ১১০৲ টাকা কোথায় পাইবে? স্ত্রীর আচল হইতে বাক্সের চাবি লইল। বাক্স খুলিয়া ৫টী টাকা পাইল, বাকী টাকার উপায় কি ১০৫৲ টাকা কোথা মিলিবে? অনুপম ভাবিল "পিতার বাক্সতে টাকা আছে—পিতার ঘরে প্রবেশ করিবার উপায় কি?" ভাবিতে ভাবিতে দেখিল—পিতার ঘরে জানালার একটী গরাদে নাই। যদি জানালার কবাট খোলা থাকে—তবেই মঙ্গল। অমনি উঠিল, অন্ধকারে আস্তে আস্তে পিতার

কক্ষের নিকট আসিয়া জানালার কাছে দাঁড়াইয়া দেখিল,—জানালার কবাট খোলা। আনন্দে হৃদয়ে আশা নৃত্য করিল। অনুপম তখন ধীরে ধীরে জানালায় মাথা প্রবেশ করাইয়া দিল—পাঁটা যেমন হাঁড়িকাঠে প্রবেশ করে, সেইরূপে মাথা প্রবেশ করাইল—ক্রমশঃ শারীরিক বলে মাথা ঘরের অন্ধকার ভেদ করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল—হাত বাহির হইল—কোমর বাহির হইল—সমুদয় অনুপম দেহটি ঘরের ভিতরে প্রবিষ্ট হইল। ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিয়া বাপের ক্যাস বাক্‌সটি হাতড়াইতে লাগিল—অন্ধকারে স্পর্শ করিল। বাক্‌সের চাবি কোথায়, তখন ভাবিতে লাগিল। পিতার ঘুনসিতে চাবি থাকে—সে চাবি কি প্রকারে পাইবে। বাক্‌সের চারিদিক হাতড়াইতে হাতড়াইতে অনুপম একখানি ছুরিকা স্পর্শ করিল। তখন ছুরি লইয়া পিতার কোমরের ঘুনসি কাটিয়া চাবি আদায় করিবার মতলব করিল। আস্তে আস্তে পিতার কোমরের কাছে গিয়া বসিতে যাবে, এমন সময়ে অনুপমের উপবেশনের চাপ পাইয়া একটা কোমল পদার্থ নড়িয়া উঠিল; অনুপম চমকিত হইল, পরে সেই পদার্থটা অনুপমের তলদেশ হইতে অপসারিত হইয়া "মেও" "মেও" শব্দে গৃহ পূর্ণ করিতে লাগিল; অনুপমের অন্য ভয় দূরীকৃত হইলেও নূতন ভয় ও রাগ উপস্থিত হইল। রাগে বিড়ালটাকে কাটিয়া ফেলিবার ইচ্ছা হইল। কিন্তু সে চেষ্টায় আরও গোল বাড়িতে পারে বলিয়া, চুপ করিয়া বসিয়া থাকিল। এদিকে বিড়ালের "মেও" "মেও" শব্দ শ্রবণে দুই একটা ইঁদুর ছটপাট করিয়া পলাইতে লাগিল। অনুপমের ভয়-নৈরাশ্য আরও বাড়িতে লাগিল—পাছে পিতার নিদ্রাভঙ্গ

হয়। কিন্তু সৌভাগ্য বশতঃ নিদ্রাভঙ্গ হইল না—বিড়াল ঘর হইতে সেই ভাঙ্গা জানালা দিয়া বহিষ্কৃত হইল—ইঁদুরের ছট্‌পাট শব্দও থামিয়া গেল। অনুপম গোল থামিবার পর, একটু বিলম্ব করিয়া, পিতার কোমর স্পর্শ করিল—দেখিল কাপড় আঁটা রহিয়াছে,—তখন ছুরি দিয়া কাপড়ের একস্থান কাটিয়া দুই অঙ্গুলির জোরে কোমরের কাপড় ছিঁড়িয়া ফেলিল। কাপড় ছিঁড়িয়া ঘুন্‌সিতে হাত দিয়া চাবি স্পর্শ করিল। ছুরি দিয়া যেমন ঘুন্‌সি কাটিতে যাইবে, অমনি ছুরির ডগা পিতার কোমরে ফুটিবামাত্র পিতা জাগিয়া উঠিল। অনুপম কিন্তু সেই সময়ে চাবি হস্তগত করিল। পিতা জাগিয়াই গৃহিণীকে গা ঠেলিয়া ডাকিতে লাগিল। গৃহিণী উঠিবামাত্র কর্ত্তা বলিল "আমায় কি বুঝি কামড়ালে, একবার উঠে দেশালাই জাল"। অনুপমের বুক গুর গুর করিয়া কম্পিত হইল—মুখ শুকাইয়া—গা দিয়া ঘাম বাহির হইতে থাকিল। বিড়ালটা "মেও" "মেও" করিতে করিতে সেই ভাঙ্গা জানালা দিয়া আবার প্রবেশ করিল—অনুপমের ক্রোধ বিড়ালকে কাটিবার জন্য অধীর হইল। গৃহিণী উঠিল। অনুপম অন্ধকারে বসিয়াই নিশঃব্দে দুহাতে ভর দিয়া কোণের দিকে সরিয়া গেল। গৃহিণী উঠিয়া দেশালাই খুজিতে লাগিল। দেশালাই অন্যান্য দিন উঠিবামাত্র পাইত আজ পাইতেছে না। সেই সময়ে কর্ত্তা মহাশয় আপনার কোমরে হাত বুলাইতে বুলাইতে দেখিলেন ঘুন্‌সি নাই—কোমরের নিচে পড়িয়া আছে; তখন চমকিত ভাবে উঠিয়া বলিলেন, "ও গিন্নি!—শীঘ্র দেশালাই জাল, আমার কোমরে ঘুন্‌সি কাটা, চাবি নাই।" গৃহিণী, "সে

কিগো আমার ভয় ক'চ্ছে—ঘরে মানুষ আসিনিতো—না বাবু আমি শুই—তুমি দেশালাই খোজ।" গৃহিণী চোরের ভয়ে বিছানায় গিয়া বসিল। কর্ত্তা উঠিতে যাইবে না কোমরের কাপড় কাটা অনুভব করিয়া আরও ভীত—চমকিত হইল। ভয়ে বুক কাঁপিতে লাগিল। তখন নিশ্চয়ই ঘরে মানুষ আসিয়াছে, বা আসিয়া চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে, ভাবিয়া কর্ত্তা ধড়মড় করিয়া দাঁড়াইল। মাথার উপরে দেরাজ হাতড়াইতে হাতড়াইতে এক গাছা মোটা বৃহৎ রুল পাইল। সেই রুল হাতে করিয়া ঘরের চারিদিকে দেশালাই হাতড়াইতে লাগিল। কোণের দিকে যাইবামাত্র পায়ে মাংস পিণ্ডের মত—মানুষের মত কাহাকে স্পর্শ করিয়াই ভয়ে চমকিত হইল। পরে রুল লইয়া সেই দেহের উপর প্রবল বেগে আঘাত করিল, রুলটা দেহের পৃষ্ঠদেশে পতিত হইল—দেহটা আঘাত পাইয়া সরিয়া গেল—কোণের সহিত লিপ্তভাবে থাকিল। কর্ত্তা "কেরে শালা" বলিয়াই সরিয়া আসিল। কর্ত্তার শরীর ভয়ে কাঁপিতেছে। গৃহিণী বসিয়াছিল আস্তে আস্তে বিছানায় কুণ্ডলিত ভাবে শয়ন করিয়া চক্ষু বুজিয়া থাকিল। কর্ত্তা গৃহিণীর গায়ে হাত দিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "অনুপকে ডেকে আন, বউমার ঘর থেকে দেশালাই আন। ঘরের ভিতরে ঐ কোণে কে এক শালা ব'সে আছে"। গৃহিণী উত্তর দিল না। কর্ত্তা চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল—'ওরে অনুপ, শীঘ্র আয়, ঘরে চোর সেধ্যেছে।' কর্ত্তার চীৎকারে পুত্রবধুর নিদ্রাভঙ্গ হইল, পাশে হাত দিয়া দেখিল, হাত বিছানায় পড়িল—আরও সরিয়া স্বামীকে ডাকিতে লাগিল—স্বামীকে খুঁজিয়া পাইল না। উঠিয়া

দেশালাই জ্বালিল। আলো জ্বালিবামাত্র দেখিল হাতে বালা নাই—তখন বধূ চমকিয়া উঠিল। কিন্তু সাহস থাকায় আলোক লইয়া শ্বশুরের গৃহাভিমুখে চলিল।

অনুপম দূর হইতে আলোক দেখিয়া সাপের মত ভয়ানক ভীত হইল। মাথা চুলকাইতে লাগিল—আস্তে আস্তে কোণে দাঁড়াইল। বৃদ্ধ কোণের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াছিল; চোরকে দাঁড়াইতে দেখিয়া বৃদ্ধ বলিল, "ওগো দাঁড়াল যেন বোধ হ'চ্ছে, বউমার এখন এঘরে এসে কাজ নাই।" পরে চেঁচাইয়া বলিল 'বউমা প্রদীপ ঐখানে রাখিয়া তোমার ঘরে খিল দাওগে।' বউ মা তাহাই করিল। তখন বৃদ্ধ গৃহিণীকে বলিল, "উঠে দ্বার খুলে পালাও—আমিও যাই।" তখন দুই জনে জড়াজড়ি করিয়া গৃহের দ্বার খুলিয়া বাহিরে গেল। বাহিরে গিয়া ঘরের দ্বারে শিকল দিল। বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা বধূর ঘরে গিয়া দেখিল—বধূর হাতে বালা নাই। অনুপম সেই সুযোগে ভাঙ্গা জানালা দিয়া পলাইবার সুযোগ দেখিতে লাগিল। আস্তে আস্তে জানালার কাছে গমন করিল। কিন্তু এদিকে কর্ত্তা বধূর দামী বালা গিয়াছে দেখিয়া দালান হইতে লাঠি লইয়া সেই বদমাইসকে শাস্তি দিবার জন্য ঘরের কাছে আসিয়া দেখিল, ভাঙ্গা জানালার বাহিরে কে পা ঝুলাইয়া দিয়াছে। অমনি বৃদ্ধ লাঠি দ্বারা প্রবলবেগে সেই চোরের কোমরে আঘাত করিবামাত্র—চোর কাতর ভাবে চীৎকার করিয়া বলিল, "বাবা আমি—বাবা আমি—আমি অনুপম"। এই কথা শুনিবামাত্র গৃহিণী দূর হইতে কাঁদিতে কাঁদিতে জানালার কাছে আসিয়া 'কি হ'ল সর্ব্বনাশ, হ'ল", বলিয়া চীৎকার করিল। তখন বাহিরে মুষলধারে বৃষ্টি হইতেছিল—বাহিরের

কেহ শুনিতে পাইল না। বৃদ্ধ হতবুদ্ধি হইয়া কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ ভাবে পুত্রের কথা ভাবিতে ভাবিতে অশ্রুমোচন করিল :—এই পুত্রই চোরবেশে কোমরের কাপড় কাটিয়া ঘুষসি কাটিয়াছে; কোণে রুলের ভীষণ আঘাত সহ্য করিয়াছে; জানালায় কোমরে লাঠির আঘাত খাইয়া চীৎকার করিয়াছে। পিতা জানালার কাছে আসিল। বধূ আলোক লইয়া আসিলে চোরকে সকলে স্পষ্ট চিনিয়া ফেলিল। পেটকাপড়ে বালা দেখিয়া বৃদ্ধ রাগে উন্মত্ত হইয়া বলিল, "গুখেকোর ব্যাটা ঘরে চুরি—ওরে হারামজাদা! ঘরে চুরি।" লাঠি দ্বারা পৃষ্ঠে আর একটী আঘাত করিয়া "দে ব্যাটা বউমার বালা দে" বলিয়া চীৎকার করিবামাত্র গৃহিণী বৃদ্ধের দুহাত ধরিয়া, 'ওগো থাম—বাছা বুঝি মারা গ্যাল, দ্যাখ আর আমার নাই,—বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। কর্ত্তা আর কিছু না বলিয়া আপনার ঘরের বিছানায় অশ্রু মুছিতে মুছিতে শয়ন করিল।

যে সময়ে কর্ত্তা ও গৃহিণী ঘরের বাহিরে গিয়াছিল, সেই সুযোগে গুণধর প্রকটবুদ্ধি অনুপমচন্দ্র বাপের ক্যাস বাক্‌স খুলিয়া ২০০৲ টাকা সংগ্রহ করিয়াছিল। অনুপমের কাছে জননী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "তোর এদুর্ব্বুদ্ধি কেন হ'ল?" অনুপম কিছু উত্তর না করিয়া দ্রুতবেগে কাঁদিতে কাঁদিতে রাগে ফুলিতে ফুলিতে চলিয়া যাইতেছে, দেখিয়া জননী পুত্রের হাত ধরিল। হাত ধরিলে অনুপম "গুখেকোর বেটি দূর হ" বলিয়া হাত ছিনাইয়া চলিয়া গেল। ছাতা মাথায় দিয়া বালা ও টাকা লইয়া প্রস্থান করিল।

অনুপম চলিয়া যাইলে জননী ও বধূ কাঁদিতে লাগিল।

জননী অনুপমের জনকের নিকটে গিয়া বলিল "ছেলে তো বালা ল'য়ে পালাল।" সে বলিল "চুপ ক'রে ঘুমাও—ছেলের নাম ক'র না, ও আমার ত্যজ্যপুত্র।"

বধূ কাঁদিতে কাঁদিতে আপন ঘরে খিল দিয়া শয়ন করিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

অনুপম টাকা ও গহনা লইয়া প্রস্থান করিল। চাঁপার বাটিতে গিয়া দ্বারে ধাক্কা মারিতে লাগিল। চাঁপা আসিয়া দ্বার খুলিল। চাঁপার সঙ্গে চাঁপার ঘরে গেল। চাঁপা আবার আলো জ্বালিল। চাঁপাকে বলিল—এই টাকা গহনা ল'য়ে চল। আমি তোমার পিছনে পিছনে যাব।

চাঁপা মুখ বিকৃত করিয়া বলিল "তুই কেমন পিচেস বল দেখি—আমায় বুঝি বিশ্বাস হয় না। নে তোর টাকা বালা নে। আমি ওসব পারবো না।" তখন অনুপম মন একটু স্থির করিয়া বলিল, না ঠান্‌দিদি—আমি অবিশ্বাস করবো কেন? আমার প্রাণটা কাদম্বিনীর জন্য বড় অস্থির হয়েছে, তাই অমন ক'রছি।

চাঁ। কি রূপই দেখেছিস! আমি কি কাদম্বিনীর চেয়ে কুৎসিৎ তবে আমার বয়স কিছু যেয়াদা। তা যেয়াদা বয়সে একটা মজা যে আছে, তা তোরা বুঝবিনা তো—বুড়োরা বোঝে।

অ। ঠানদিদি! যার সঙ্গে যার মজে মন,
কিবা হাড়ী কিবা ডোম।
যে যাহারে ভাল বাসে সে যাইবে তার পাশে
মদন রাজার বিধি লঙ্ঘিবে কেমনে?

চাঁ। আর রাখ্ তোর কবিতা, রাখ্। টাকা কড়ি গুণে দে।

অ। এই লও, গুণে লও।

অনুপম টাকা গুণিয়া দিল। ১১০৲ টাকা দিবার পর চাঁপা দেখিল আরও অধিক টাকা আছে। মনে মনে ভাবিল ওগুলা গ্যাঁড়া দিতে হবে। কৌশল আঁটিয়া বলিল "দেখ তুই ব্যাবসাদারি ধরেছিস্।"

অ। কি প্রকার। বুঝ্তে পার্লাম না!

চাঁ। দরটী এঁটে জিনিস কিনতে বসেছিস। তুই কি জানিস না, স্ত্রীলোকের রূপ যৌবনের দাম নাই। সে ১০০৲ টাকা চেয়েছে ব'লে ১০০৲ টাকার একটী যেয়াদা দেওয়া হবে না—এ কেমন কথা। টাকা হাতে আছে—না থাক্তো তো না হয় ২।১০ টাকা কম দিলেও হ'তো। তা আমায় না হয় ১০৲ টাকাতেই সার্লি। সে ১০০তে যদি ২০।৩০ টাকা যেয়াদা পায় তো তার মনটা কেমন হবে বল দেখি? একাজের ধরণ, যে যা চাইবে, তার দ্বিগুণ তিন গুণ দিতে হয়। তা এসব বড় মানুষ নইলে হয় না। বড় মানুষের ধাতই এক রকম। তা তুই তো আর গরিবের ছেলে নয়? তোর বাপের তালুক মুলুক—নগদ টাকা কত। মেটে ঘর হ'লে কি হয়। মাটীর ভিতরে সোণার গাছ যে আছে।

অ। কত অধিক দেব তা বল? তুমি গুরু আমি শিষ্য।

তুমি গুরু আমি চ্যালা দাও উপদেশ,

দাস সম করযোড়ে করি কার্য্য শেষ।

কেমন ঠান্‌দিদি! কবিতাটী কেমন ভাল হ'ল কি না। এখন কত দেব বল?

চাঁ। আবার ব'ল্‌বো কি—প্রাণের টানে যে দেয় সেকি জিজ্ঞাসা করে। তোর প্রাণকে জিজ্ঞাসা কর, কি বলে।

অ। প্রেম জোয়ারে নদী ভরা করে টলমল,

টাকা কড়ির হিসাব তায় নাহি পায় স্থল।

ঠান্‌দিদি আমার কাদম্বিনীকে এই সব টাকাই দিলাম। তুমি এখন আমার এই ছাতা মাথায় দিয়া যাও। পার তো তাকে এইখানে সঙ্গে ক'রে আন—না হয় আমি তোমার সঙ্গে যাই।

চাঁ। বড় সুখ। টাকা দিয়ে রাজা ক'রেছিস নয়? আমি জলে ভিজে ভিজে যাই—বড় সুখ।

অ। ঠান্‌দিদি! রাগো কেন? কি অপরাধ বল।

অপরাধে শাস্তি দান কর শীঘ্র করি,

নতুবা দাওগো ক্ষমা ওগো ক্ষেমঙ্করি।

ঠান্‌দিদির রাগ হ'ল কিসে?

চাঁ। রাগ হয় না—কাদির বেলায় টাকা ছড়াচ্ছ, আর আমার বেলায় সেই ১০৲ টাকা।

অ। আচ্ছা তুমি, ও হ'তে আর ১০৲ টাকা নও, হ'ল তো। এখন কর্ত্তব্য সম্পাদন কর।

চাঁ। আজ আর হবে না—কাল যা হয় হবে। আর রাত নাই।

অ। আমি আর কোথায় যাব? বাড়িতে ঝগড়া ক'রে এসেছি।

চাঁ। তা তুই ওখানে শো—একটী মাদুর পেতে দি।

অনুপম চাঁপার ঘরে শয়ন করিল।

—:[ ]:—

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

ও কে খেলা ক'রে জেগে জেগে হৃদয় মাঝারে
ওর জ্ঞানের চাহনি হ'তে কেবা পলাতে পারে।
আঁধারে আলোকে
পলকে পলকে
চায় চায় সদা চায় রে॥

প্রাবৃটের জলদাচ্ছন্না বৃষ্টিধারা-সমাকীর্ণা অন্ধকারময়ী রজনীর গাম্ভীর্য্য ভেদ করিয়া শ্রীধরের বাটীর উদ্যানমুখী জানালা হইতে এই সঙ্গীতামৃত বর্ষিত হইতেছিল। সেই মহাকাব্যময়ী মহীশরীরে এই সঙ্গীতধারা যেন মানুষের মোহ-দৃষ্টি ভাঙ্গিবার জন্য আপনার তেজ প্রকাশ করিতেছিল। আবার সঙ্গীত আরম্ভ হইল:—

চাহনির তেজে জগৎ বাঁধিয়া সে কেমনে রাখেরে,
সেই চাহনি পলকে কেমনে প্রলয় সংঘটন করেরে।
সে কথা বুঝিতে
সদা ধায় চিতে
পায় পায় ক'রে ধায় তবু নাহি পায় রে।

শ্রীধর আপনার ঘর হইতে এই সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে,—এই ভাবপরিপূর্ণ স্বভাবের আনার্তনাদে অভিভূত হইয়া, কাদম্বিনীর ঘরের দ্বারের কাছে বসিয়া ভগবদ্ভক্তিতে অশ্রুমোচন করিতে লাগিল। ঘরের গান বন্ধ হইলেও হৃদয়ে সেই গানের প্রতিধ্বনি থামিল না। কিয়ৎক্ষণ পরে শ্রীধর ডাকিল, "মা কাদম্বিনী বাহিরে এস"। কাদম্বিনী বাহিরে আসিয়া পিতার কাছে বসিল। পিতা বলিল, "মা রাত্রিতে ঘুম নাই—মনে তোমার যে সব ভাব উঠে আমায় খুলে বল"—

কাদম্বিনী মধুর স্বরে গদগদ বচনে বলিতে লাগিল, 'বাবা আমাকে কে যেন পাইয়াছে—যেমন মানুষকে ভূতে পায় আমায় তেমনি ভগবান পাইয়াছেন। আমি তাঁর নাম ভুলিতে পারি না। সেই মধুর নাম জপিতে জপিতে নামের ভিতরে তাঁর অপূর্ব্ব মূর্ত্তি—চিদ্ঘনরূপ দেখে মোহিত হই—আমার হৃদয় ঠেলিয়া তিনি উঠিতে থাকেন—তার জাগরণের ভাব দেখে আমার জ্ঞান জাগ্রত হয়। আমার হরিনাম নেশা হ'য়েছে—ও নেশা যত বাড়ছে, ততই আমি আমাকে তাঁতে হারিয়ে ফেলছি।" শ্রীধর অশ্রুপূর্ণ লোচনে বলিল 'মা! ভগবান আত্মাতে আছেন, চারি দিকে আছেন। তাঁকে তুমি যখন দেখ তখন তোমার কি রূপ ভাব হয় মা? কাদম্বিনী কথা শুনিয়া ভাবভরে নির্ব্বাক্ হইল—ধ্যানে ডুবিয়া গেল—বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ফেলিল। অনেকক্ষণ পরে একটু বাহ্যজ্ঞান লাভ করিয়া গদগদ ভাবে বলিল—"বাবা সে রূপের কথা কি ব'লবো—তাকে যে আপনাকে হারায়ে ফেলতে হয়। জলবিন্দু যেমন জলে মিশিয়া যায়, গন্ধ যেমন আকাশে বিলীন হয়, আমি

তখন তেমনি সেরূপে আমাকে হারাইয়া ফেলি। তাঁহাতে আপনাকে হারাইয়া তাঁর আলোকে আপনাকে স্পষ্ট দেখি—সম্ভোগ করি, এসংসারসাগরের হারাণ মাণিক তখন উজ্জ্বল কিরণশোভিত দেখে আত্ম-সুখ-দুঃখের পরপারে মহাশান্তির আশ্রয় লাভ করি। আমিই তখন কর্ত্তা, আমিই তখন কর্ম্ম, আমিই জ্ঞাতা, আমিই জ্ঞেয়। তখন আমি তাঁর সঙ্গে এক হইয়া জলে স্থলে—ফলে ফুলে—আপনার মহিমায় মহিমান্বিত হই। তখন সূর্য্য আমার ভয়ে কিরণ দিতেছে, চাঁদ আমার রূপে ডুবিয়া জগৎ সুধাপূর্ণ করিতেছে, ফুল আমার হাসি ছড়াইতেছে এরূপ বোধ হয়। আমি তখন আপনাকে জগতের সমুদয় শোভা ও শক্তির আধার—উৎপত্তি বা কেন্দ্র বলিয়া অনুভব করি। এসব যার হয় সেই বোঝে। ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। বাবা! সাধনা করুন, মার আশ্রয় লউন, সব ক্রমশঃ বুঝিবেন। আমি আপনার সামান্য মেয়ে—আপনারি পুণ্যে আমার এসব হ'য়েছে।

শ্রীধর কথা শুনিয়া চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইল। এরূপ কন্যালাভ বহুজন্মের সাধনাফল বুঝিল।

ষোড়শ অধ্যায়।

বর্ষাকাল অতিবাহিত হইল। প্রাবৃটের জলে বিধৌত হইয়া আকাশ সুনির্ম্মল ভাব ধারণ করিল। নীলিমার উজ্জ্বলতা বাড়িল। চাঁদ—তারা, সকলে সে জলধারায় যেন পরিস্কৃত হওয়ায় উজ্জ্বলতর জ্যোতি ঢালিতে লাগিল। জ্যোৎস্না আকাশের নীল অঙ্গে কনকজ্যোতি প্রতিভাত করিতে থাকিল। সরোবরের মলিন জল সেই শারদীয় সুনীল স্বচ্ছ আকাশের সহবাসে স্বচ্ছভাব ধারণ করিল। প্রাবৃটে আকাশ, চাঁদ ও তারকারাজীর জলধারাবিধৌত সৌন্দর্য্যরাশি, সরোবরতলে কিছুকাল থাকিয়া, প্রফুল্ল কমলরূপে সরোবরবক্ষে যুবতীর স্তনের ন্যায় উদ্ভাসিত হইল। আকাশে মেঘ শুভ্রতর হইল—রাশি রাশি মেঘ রাশিকৃত তুলার মত আকাশের গায়ে ঘুরিতে—ছুটিতে—চলিতে লাগিল, গুরুগুরু স্বরে শরতের কণ্ঠধ্বনি জ্ঞাপন করিতে থাকিল। ধরণী ধান্যপরিশোভিতা হইয়া গর্ব্ভিণী যুবতীর শোভা ধারণ করিল।

আশ্বিন মাসের পূর্ণিমা। আকাশ জ্যোৎস্নার কৌলনে হাস্যময়—মন্দ মন্দ বাতাস নানা গন্ধে পূর্ণ হইয়া বহিতেছে—মাঠে ধান্যরাশিতে জোছনা-রাশি পতিত হওয়ায় ধান্য সকলের আনন্দ জাগিয়াছে—তাহারা দুলিতে দুলিতে জ্যোৎস্নাসাগরে পবনকোলে ক্রীড়া করিতেছে। চক্রবাক ও চক্রবাকী আকাশে ছুটাছুটী করিতেছে। ভূতলে, কোনখানে জ্যোৎস্না,

কোনখানে বনদেশে ঈষৎ অন্ধকার থাকায় বোধ হইতেছে, যেন রজনী আপনার কৃষ্ণবসন অঙ্গ হইতে খুলিয়া বনদেশে ফেলিয়া দেওয়ায়, দেহ ফুটিয়া শরীরের অতুলরূপ বিভাষিত হইয়াছে—বসনাপগমে বদনমণ্ডল পূর্ণচন্দ্ররূপে এবং অলঙ্কার-রাজি তারকারূপে প্রকাশিত হইয়াছে।

এই পূর্ণিমা রজনীতে, কাদম্বিনী পূর্ণিমার শারদীয় মূর্ত্তিতে আনন্দবিহ্বলা হইয়া, আপনার স্বরূপ-সাগরে নিমজ্জিত হইল। ঘর পরিত্যাগ করিয়া আকাশের দিকে চাহিবামাত্র, সেই অতলস্পর্শ সৌন্দর্য্যসাগরের তলদেশে ঘনীভূত অচল—অটল চৈতন্যময় জগৎ নিরীক্ষণ করিবামাত্র আত্মহারা হইল। স্বর্গ-হইতে এক সুমধুর অগ্নিধারা কাদম্বিনীর হৃদয়ের স্তরে স্তরে প্রজ্বলিত হইল। সেই আগুণের উত্তাপে প্রাণের সঙ্কোচ প্রসারিত এবং হৃদয়গহ্বরনিবদ্ধ প্রেমরাশি বিগলিত করিয়া, তরল জ্যোৎস্না-স্রোতে যেন বিমিশ্রিত হইয়া কাদম্বিনী খিড়কী পুকুরের দিকে ধাবিতা হইল। সেই সৌন্দর্য্যপানে কাদ-ম্বিনীর প্রাণে নেশার উদয় হইল—সে গোলাপী নেশা ক্রমশঃ গাঢ়তর ভাব ধারণ করিতে থাকিল। যে নেশায় কালিদাস শকুন্তলায় কুসুমশোভা বিস্তার দেখিয়া ধন্য হইয়াছিলেন—শেলি চাতকের সঙ্গীত-সুধা-পানে অধীর হইয়া পৃথিবীর সাহিত্যে সুধা-বর্ষণ করিয়াছেন,—সেই জ্যোৎস্নাময়ী নেশায় কাদম্বিনী উন্মাদিনী হইয়া আপনার প্রকৃতি-অঙ্গে অমৃত লেপন করিতে করিতে সেই প্রকাণ্ড পুষ্করিণীতীরে উপস্থিত হইল। দেখিল সরোবর হাসিতেছে—জলে জ্যোৎস্না জ্বলিতেছে—আকাশ জ্যোৎস্নায় পরিপূর্ণ হইয়াছে—গাছপালা, লতা, পাতা;

ফুল. ফল, সব জ্যোৎস্না-সাগরে আনন্দ পান করিতেছে,—যেন অগ্নি সুশীতল হইয়া মধুর ভাবে জগতে খেলা করিতেছে। পদ্ম মুদিয়াছে—শালুক ফুটিয়া চাঁদের দিকে চাহিয়া জ্যোৎস্না পান করিতেছে—সরোবরজল জ্যোৎস্নার আলিঙ্গনে তরঙ্গচ্ছলে সিহ-রিতেছে;আকাশে পাখীর শব্দ মাঝে মাঝে শ্রুতিগোচর হইতেছে।

কাদম্বিনী সৌন্দর্য্য-নেশায় অভিভূতা হইয়া, ঘাটের নিকটবর্ত্তী কদম্বতলে যাইবামাত্র, দুইটি বাদুড় হুস্ হুস্ করিয়া উড়িয়া গেল;—দুই একটী পুরাতন পাতা খসিয়া পড়িল। কাদম্বিনী সেই বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া ধ্যাননিমগ্না হইল। বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া মৃতবৎ বসিয়া থাকিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে ধ্যানের বেগ কমিল—অন্তর্দৃষ্টি বহির্জগতের দিকে অগ্রসর হইল--চক্ষু খুলিল—কাদম্বিনী চাহিয়া দেখিল,--তাহার ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া কে শুইয়া আছে। কাদম্বিনী রুক্ষ স্বরে বলিল "এত স্পর্দ্ধা কার?"

সেই ব্যক্তি তখন ভয়ে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল, একদৃষ্টে কাদম্বিনীর মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিল। কাদম্বিনী আবার বলিল "তোমার স্পর্দ্ধা এত কেন? কি মনে ক'রে এসেছ? সে ব্যক্তি বলিল "আমার মন কি জাননা?"

কা। জানি।

ব্য। তবে জিজ্ঞাসা কেন?

কা। এখন কি মনে ক'রে এসেছ—একবারে কোলে মাথা কেন? আমি যুবতী—স্বামী বিদেশে—রাত্রিকাল, খিড়কী পুকুর, এসময়ে তুমি কোলেমাথা রাখিয়াছ, কেহ দেখিলে কি বলিবে?

সেই নিবিড় বাঁশবনে স্থানে স্থানে পত্ররন্ধ্র প্রবিষ্টা জ্যোৎস্না-জ্যোতি নিপতিত হইয়া বায়ুস্পর্শে নড়িতেছে; কোন স্থানে আতঙ্কদায়ক অন্ধকার শুইয়া নীরবে কৌমুদীদলের নৃত্যাবলোকনে স্তম্ভিত হইয়া আছে! অসংখ্য কাক, পাখী, সেই বৃক্ষশাখায় নিদ্রা যাইতেছে। খদ্যোতের দল চক্‌মক্ করিয়া জ্বলিতেছে; দুএকটা নিশাচর পাখী পাখার শব্দ করিতেছে, দুএকটি উড়িয়া স্থানান্তর হইতেছে, কীট পতঙ্গ ডাকিতেছে, মাঝে মাঝে শৃগালের পদশব্দ হইতেছে। অনুপম পশ্চাতে ফিরিয়া চমকিত হইয়া সেই দিকে তাকাইয়া থাকিল। বাঁশবনে তরল অন্ধকারে চাপিয়া কে যেন ঝুলিতেছে—স্পষ্ট ছায়াকৃতি। সেই ছায়া দেখিয়াই অনুপম ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল। কাঁপিতে কাঁপিতে চীৎকার করিয়া শ্রীধরকে ডাকিবে ভাবিল; কিন্তু কথা কহিতে সাহস হইল না। অনুপমের সাহস একত্রিত হইল। একটু সাহসে ভর দিয়া সেই দিকেই তাকাইয়া থাকিল। সেই ছায়াকৃতি সেই ভাবেই অন্ধকারে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া আছে—সে মুর্ত্তি যেন অন্ধকারের গায়ে চিত্রিত—যেন অন্ধকার সেই মূর্ত্তিতে পরিণত হইয়াছে। অনুপম একদৃষ্টে চাহিয়া কতক্ষণ থাকিবে, চক্ষের পলক পড়িল—নিমেষমধ্যে আবার চক্ষু চাহিবা মাত্র দেখিল, সেই মুর্ত্তি অনুপমের অনেক নিকটে আসিয়া স্পষ্টতর আকৃতিতে শূন্যে ঝুলিতেছে। অনুপমের হৃৎকম্প হইল—দেহ কাঁপিতে লাগিল। অনুপমের গলদঘর্ম্ম হইতেছে—একদৃষ্টে চাহিয়া আছে—এবারে ভয়ে পলক ফেলিতেছে না—পাছে সেই সুযোগে আরও কাছে আসিয়া পড়ে। সেই মূর্ত্তি আরও স্পষ্টতর আকৃতি ধারণ করিল—ক্রমশঃ হাত পা দেহ বুক জাগিতে লাগিল।

অনুপম দেখিল—কাদম্বিনী। অনুপম বলিল, কাদম্বিনী আমায় ভয় দেখাচ্ছিলে? মূর্ত্তি কোন উত্তর দিল না—একদৃষ্টে অনুপমের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। অনুপম চক্ষু রগড়াইতে রগড়াইতে জিজ্ঞাসিল 'কাদম্বিনী! কি মনে করে? বাঁশবনে কেন? ভয় দেখাচ্ছ কেন?'

সেই মূর্ত্তি তখন দেখিতে দেখিতে কালীমূর্ত্তিতে পরিণত হইল—স্পষ্টতর ছায়ার ন্যায় আবার শূন্যে ঝুলিতে লাগিল। তখন অনুপম ভয়ে সেইখানে বসিয়া পড়িল। অনুপম দুই চক্ষু মুদিয়া অবনত মুখে বসিবামাত্র শুনিল, "কাদম্বিনীর লোভ ছাড়—তোমার মৃত্যুদিন আগত প্রায়।" সেই কথা যেন বজ্র-হুঙ্কারে অনুপমকে ভয়ে মূর্চ্ছিত করিয়া অন্তর্হিত হইল।

অনুপম পথের ধুলায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া থাকিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

আটুই কার্ত্তিক। শ্যামাপূজা। অনুপমের জননী, শেষরাত্রে একটি কুস্বপ্ন দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল। জননী দেখিল, অনুপম ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে লইয়া, জনমের মত দেশত্যাগী হইয়া লোকের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা মাগিয়া খাইতেছে। স্বপ্ন দর্শনের পর শয্যা হইতে উঠিয়া বাহিরে চলিল। ঘরের বাহিরে আসিয়া বাটির দ্বারদেশ অতিক্রম করিবামাত্র চাঁপাকে যাইতে দেখিল। একে কুস্বপ্ন, তাহাতে চাঁপার মুখদর্শন সংঘটন—রম্ভাবতী ভয়ে কাঁপিতে লাগিল—আজ তার অদৃষ্টে ভগবান কি লিখিয়াছেন তাহা যেন

হাতড়াইতে লাগিল। উঠিয়াই অনুপমের ঘরে শাড়া লইল। শাড়া লইয়া বলিল "বাবা! আজ আর কোথায় বেরয়োনা, শ্যামা পূজার দিন।" রম্ভাবতীর প্রাণটা যেন কেমন পাগলের মত হইয়া গেল অনুপমের প্রতি অপত্যস্নেহ বাড়িয়া উঠিল। অনুপম দুশ্চরিত্র, সে জন্য কত বকুনি খায়—কত লোকের নিকট অপমানিত হয়। গৃহকার্য্য করিতে করিতে রম্ভাবতী সেই সব ভাবিতে ভাবিতে অশ্রুমোচন করিতে লাগিল। বধূটীও সঙ্গে কাজ করিতেছিল—রম্ভাবতী বধূকে লক্ষ্য করিয়া বলিল "মা! অনুপম মার ধ'র করে কিছু মনে করোনা। ওর বয়স একটু পাকা হলেই ও সব দোষ যাবে। বাপের বাটীতে গিয়ে ওর দোষের কথা কাকেও বলনা—সকলে তা হ'লে তোমাকে পর্য্যন্ত অগ্রাহ্য ক'র্‌বে।"

প্রাতঃকালের গৃহকার্য্য সমাপ্ত হইল। রন্ধনাদি শেষ হইল। অনুপমের পিতা সেদিন কুটুম্ববাটীতে শ্যামাপূজার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছেন। সুতরাং অনুপম একেলা আসনে ভাত খাইতে বসিল। জননী সে দিন নানাবিধ ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়াছেন। পায়েস পিষ্টক—রোহিতমৎস্যের ঝোল, অম্ল দধি প্রভৃতি উপাদেয় সামগ্রীতে থালা বাটি সাজাইয়া অনুপমের সম্মুখে দেওয়া হইল।

অনুপম হাত ধুইয়া ভাত ভাঙ্গিবামাত্র, একরাস চুল দেখিয়াই জ্বলিয়া উঠিল। জননী অমনি "বাবা ও থালার ভাত স'রয়ে রাখ, ভাল ভাত এনে দিচ্ছি" বলিয়া আর একটি থালা ভাত আনিতে যাইল। ভাত আনিয়া দিল, অনুপম সে থালার ভাত ভাঙ্গিবামাত্র, ভিতরে একটি দিব্ধি বিছা দেখিবামাত্র, আপাদমস্তক

ক্রোধাগ্নিতে প্রজ্বলিত হইয়া, ভাতের থালা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। রম্ভাবতী কাঁদিয়া বলিল, "আজ সকালে চাঁপার মুখ যখন দেখেছি, তখন ভেবেছি আজ অদৃষ্টে কিবা আছে! অনুপম ভাত না খাইয়া উঠিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছে, দেখিয়া জননী করযোড়ে বলিল, 'বাবা উঠনা, আমি তোমায় ভাল ভাত তোমার জ্যাটাইমার হাঁড়ি থেকে এনে দিচ্ছি।' বধুকে থালা লইয়া ভাত আনিতে পাঠাইল। বধূ থালা করিয়া অন্ন ব্যঞ্জন আনিয়া উপস্থিত করিল। অনুপম সমুদয় ভাঙ্গিয়া চুল কি অন্য কিছু আছে কিনা নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। এক গ্রাস মুখে দিয়া গলাধঃকরণ করিল। দ্বিতীয় গ্রাস মুখে দিয়া গিলিবামাত্র ভয়ানক বিষম খাইল—একটি ভাত টাকরা দিয়া নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিবামাত্র অনুপম ভয়ানক বিষম খাইল। অনুপমের খাওয়া হইল না। উঠিয়া পড়িল, চক্ষু লাল হইল, মুখ লাল হইল। জননী কাঁদিতে লাগিল, সেই সময়ে বধুটির দক্ষিণাঙ্গ—দক্ষিণনেত্র ঘন্‌ঘন্‌ স্পন্দিত হইতে লাগিল। বধূ অমঙ্গল ভাবিয়া ভয়ে ত্রস্ত হইয়া থাকিল।

অনুপম কিয়ৎক্ষণ পরে বাটির বাহিরে মতির কাছে গমন করিল। অনুপমের মার খাওয়া হইল না—বধূটিরও খাওয়া হইল না। অনুপমকে রাত্রে লুচি কচুরি করিয়া খাওয়াইবে, জননী সে আশায় বুক বাঁধিয়া থাকিল।

বৈকালে রম্ভাবতী, বধূ সারদাসুন্দরীর চুল বাঁধিয়া দিতে বসিল। চুল বাঁধিতে বাঁধিতে বধু বলিল "মা! আমার আজ সমস্তদিন ডান চক্ষু নাচ্ছে—প্রাণটা যেন হুহু ক'রছে—কিছু ভাল লাগ্‌ছে না।" শাশুড়ি বলিল "অদৃষ্টে কি আছে জানি না মা—অনুপ কবে কি ক'রবে বুঝতে পার্‌ছি না।

আজ সন্ধ্যার পর ওকে বেরুতে দেওয়া হবে না। ও আজ কিছু সর্ব্বনাশ না করে বসে!" চুল বাঁধা হইলে শ্বাশুড়ি কৌটা হইতে সিন্দূর লইবার জন্য কৌটা খুলিতে যাইবে, না অমনি সমুদয় সিন্দূর কৌটা উল্টিয়া পড়িয়া গেল। সারদার অন্তর্দ্দেশে কে যেন বলিল "আজ তোর কপালে কি আছে!" অজ্ঞাতে সেই কথার আঘাতে বধু অশ্রুমোচন করিল, হঠাৎ দশদিক যেন শূন্য দেখিতে লাগিল।" বধূকে কাঁদিতে দেখিয়া শ্বাশুড়ি কাঁদিয়া ফেলিল। মা কেঁদনা আজকের দিন চ'খের জল ফেলনা—মা কালী আছেন ভয় কি?

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই অনুপম বাটীতে প্রত্যাগমন করিল। আপনার কক্ষে বিছানায় শয়ন করিল। সারদা স্বামীর কাছে বসিল। স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া অশ্রুমোচন করিল—সারদা কাঁদিতে কাঁদিতে স্বামীর বুকের উপর মুখ গুঁজিয়া অশ্রুজলে বক্ষ ভাসাইতেছে, দেখিয়া, অনুপম জিজ্ঞাসা করিল "অত কাঁদছ কেন? একদিনও তো তোমায় এ রকম কাঁদ্‌তে দেখিনি—ব্যাপারটা কি?"

সারদা অশ্রুপূর্ণলোচনে বলিল "আজ আমার প্রাণ তোমার জন্য ধড়ফড় ক'র্‌ছে—তোমাকে আজ বাহিরে যেতে দেবনা।" আমাকে তোমার ভাল লাগেনা কেন? কিসে ভাল লাগ্‌বে বল—তাই করি।

অনুপ বলিল "আজ আমারও মনে সুখ নাই—কিছু ভাল লাগ্‌ছে না। বাহিরে গিয়েছিনু কিন্তু হঠাৎ মার জন্য ও তোমার জন্য মনটা কেঁদে কেঁদে উঠ্‌তে লাগ্‌লো—তাই চ'লে এলাম।" সারদা একটু নীরবে থাকিল। অনুপম ভাবিতে ভাবিতে বলিল

"আজ সকলের জন্য আমার প্রাণ কেমন ক'চ্ছে। দিদিকে দেখ্‌তে ইচ্ছা হ'চ্ছে—ভাগনাগুলিকে বড় দেখ্‌তে ইচ্ছা হ'চ্ছে।" সারদা বলিল "মারও আজ মন খারাপ—আমারও মন খারাপ—তোমারও মন খারাপ। আজকের রাত ভালয় ভালয় কাট্‌লে বাঁচি—বাবা ভালয় ভালয় ঠাকুরঝির ওখান থেকে ফির্‌লে বাঁচি।" অনুপম শুইয়া কি ভাবিতে লাগিল। ভাবিতে ভাবিতে বলিল, "নূতন বাগানে কলমের গাছ এ বৎসর বসাতেই হবে—বাগানের কাঁঠাল গাছগুলো খুব বলবান হ'য়েছে। আজ সকালে বাগানে বেড়াতে গেছ্‌লাম, গাছ পালাগুলোর জন্য হঠাৎ মন কেমন ক'র্ত্তে লাগ্‌লো। আবার কিছুকাল নীরবে থাকিয়া বলিল "সারদা! আমি তোমাকে কত কষ্ট দিয়েছি, তুমি কিছু মনে ক'রনা!" সারদা বলিল—"আমি আর কি মনে ক'র্‌বো বল—যদি কখন আমার হও, তবে সব কষ্ট যাবে—সব দুঃখ ঘুচ্‌বে।" বলিবামাত্র সারদার শরীর কোমলভাবস্পর্শে কন্টকিত হইল। অনুপম আবার বলিল "তোমার বাবার সহিত অনেকদিন দেখা হয় নাই—আজ কেন সর্ব্বদা দেখা করিতে ইচ্ছা হ'চ্ছে "বুঝতে পার্‌ছি না। সারদা একটু যেন আনন্দিত ভাবে বলিল, তোমার মন কি ভগবান এমন ক'র্‌বেন, যে তুমি বাবার সঙ্গে দেখা ক'র্‌বে? তিনি রাত দিন ভগবান-চিন্তায় থাকেন—কত খারাপ লোককে তিনি ভাল ক'রেছেন, কত লোকের চাকরি ক'রে দিয়েছেন। তোমার একটা চাকরী হলেই মন ভাল হবে।"

অনুপম বলিল "সারদা! তোমার দিদি আমায় যে চিঠি লিখেছিলেন তার একটা উত্তর তুমি কাল লিখে রেখ দেখি।"

এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে বাহিরে মতি আসিয়া ডাকিল "অনুপ—অনুপ।"

মতি অনুপমের বন্ধু—ইয়ার। ধীরেন্দ্র যেরূপ অনুপমের পাপ-গুরু—অনুপম সেইরূপ মতির পাপগুরু। ধীরেন্দ্র অদৃশ্য হইবার পর হইতে অনুপমের সহিত মতির ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়া উঠিয়াছে।

বিবাহের পর এক দিবসও সারদাসুন্দরী এরূপ ভাবে স্বামীকে কথা কহিতে দেখেন নাই—আজ স্বামীর সহিত আলাপে—ক্রন্দনে, প্রাণে যেন স্বর্গ সুখের সঞ্চার হইতেছিল। বাহিরের শব্দ শুনিবামাত্র সারদা ভয় পাইল—বুঝিল স্বামী এইবার তাহাকে রাত্রের মত পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে যাইবে মতি আবার ডাকিতে লাগিল "অনুপ অনুপ।"

অনুপ শুইয়াছিল। উঠিয়া বসিল। সারদা স্বামীর দুপা জড়াইয়া ধরিল—কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "আমার মাথা খাও আজ ফিরয়ে দাও, আমার এ কথাটী রাখ—দাসীকে অগ্রাহ্য ক'রনা। সারদার কাতরতায় অনুপের মন গলিল—কি করিবে ভাবিতেছে, এমন সময়ে দেখিল মতি বাটীর ভিতরে আসি-য়াছে। আর অনুপম থাকিতে পারিল না—অগত্যা বাহিরে আসিতে বাধ্য হইল। অনিচ্ছায় অনুপম মতির কাছে আসিল।

অনুপমের মা মতিকে দেখিয়া বসিতে বলিল। বসিবার আসন পাতিয়া দিল। মতি বসিল—অনুপম কাছে বসিল। অনুপমের মা মতিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল "আজ আমার অনুপমের ভাল খাওয়া হয় নাই। বাবা! তোমার আজ আমাদের বাটীতে নিমন্ত্রণ। অনুপ তোমায় লয়ে খেতে বড় ভালবাসে। আজ অনুপকে বাবা ঘরে থাকতে বল—ও

আমাদের কথা গ্রাহ্য করে না, তোমার কথায় মরে বাঁচে।” অনুপমের মার সহিত কথা কহিতে কহিতে মতি অনুপমের গা টিপিয়া ইসারা করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে একটু গাঢ় রাত্রি হইলে মতি উঠিয়া বলিল “আমি এখন একটু আসি, ১০টা ১১টার সময় এসে খাব—অনুপের আর কোথাও গিয়ে কাজনি, ও, ঘরেই থাক।” বলিয়া মতি বাহিরে গেল। অনুপম সারদার ঘরে প্রবেশ করিল। সারদা তখন রান্নাঘরে লুচি বেলিতেছিল—আসিবার যো নাই। সারদার প্রাণ মন স্বামীকে আবার বাধা দিবার জন্য বড় চঞ্চল হইল। সারদা শাশুড়িকে বলিল, “মা আমি একবার ও ঘরে যাই।” তাড়াতাড়ি সারদা ঘরের দিকে ধাবিতা হইল—ঘরে প্রবেশ করিল। দেখিল ঘরে প্রদীপ জ্বলিতেছে—বিছানায় স্বামীর সাধের গানের একখানি “বই” পড়িয়া আছে। আলনা হইতে স্বামী জামা কাপড় চাদর টানিয়া লওয়ায় আলনাটী একটু দুলিতেছে স্বামী নাই। সারদা ঘরে প্রবেশ করিয়া স্বামীকে না দেখিতে পাইয়া কাঁদিয়া ফেলিল—একটি গভীর দীর্ঘশ্বাস আপনি সারদার অন্তর্দ্দেশ হইতে বহির্গত হইল। সারদা হৃদয়ের আক্ষেপ হৃদয়েই রাখিয়া শূন্যমনে রান্নাঘরে গিয়া বলিল “মা! ঘরে নাই—বাহিরে গিয়েছে।” মা বলিল “কি করবে মা—যেমন অদৃষ্ট” বলিয়া বিষণ্ণ প্রাণে লুচি ভাজিতে লাগিল।

অনুপমের স্ত্রী ও জননী লুচি, তরকারি, মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিল। অনুপম মতির সঙ্গে খাইবে সেই আশায় খাবার কাছে লইয়া শাশুড়ি বউএ বসিয়া থাকিল।

অনুপম মতির সঙ্গে বাটীর বাহিরে গেল। মতিকে অনু-

পম বলিল, "আজ আমার কিছু ভাল লাগছেনা কেন? মনটা হহু ক'রছে—আমার স্ত্রীর জন্য মনটা এ প্রকারতো একদিনও করে নাই।

মতি একটু হাসিয়া বলিল "তোর ছেনালমি রাখ, কাদম্বিনীর জন্য ভেবে ভেবে পাগল হ'লেন আবার স্ত্রীর জন্য টান হ'লো। কিছু ওষুধ করেনিতো? চল এখন আসল কাজে চল। আজ শ্রীধর যজমান বাটি গিয়েছে—আজ রাত্রে তো তোর নিমন্ত্রণ? অমন জিনিস যদি তোর অদৃষ্টে ফলে তো তোর চৌদ্দ পুরুষের তপস্যার ফল।

অনুপম বলিল, কাদম্বিনীর কথা মনে হ'লে কিছু আর জ্ঞান থাকে না। মরি ম'র্‌বো বাবা! একবার সে সৌন্দর্য্য সম্ভোগ ক'রে তো নি।

হেসে খেলে নাওরে যাদু মনের স্থখে,
কোন দিন যেতে হবে সিংএ ফুঁকে।

ম। তা নয়তো আবার কি? স্থখের জন্য জগৎটা ঘুরছে। বাবা! চাঁপার ঘরে চল। একটু মনটাকে ভিজয়ে নিতে হবে। একটু গোলাপি নেশা চাই। আমি একসা নম্বর ওয়ান একটা চাঁপার ঘরে রেখে এসেছি।

অ। চাঁপার ঘর থেকেই যুদ্ধযাত্রাটা ক'রতে হবে। এ মদন সমরে চাঁপা Prime minister (প্রধান মন্ত্রী) আমি শ্রীকৃষ্ণ, আর কাদম্বিনী—রুক্মিণী। আজ রুক্মিণীহরণের পালা।

ম। আর আমি কি?

অ। তুই শালা শিশুপাল।

মতি অমনি "বুদ্ধংদেহি" বলিয়াই অনুপমের পৃষ্ঠে একটি কিল মারিল।

কথা কহিতে কহিতে চাঁপার ঘরের কাছে আসিয়াছে। চাঁপা সেদিন বাটীর দ্বার খুলিয়া রাখিয়াছিল। দুজনে প্রবেশ করিল। অনুপম ডাকিল—"বৃন্দে দূতি! জেগে আছতো?

চাঁপা ঘরের ভিতরে প্রদীপের আলোকে কাঁথা শিলাই করিতেছিল। চাঁপা কাঁথাটি ভূমে রাখিয়া ফিরিয়া বসিল—অনুপমকে লক্ষ্য করিয়া বলিল "আমার টাকা পাঁচটা এনেছিস?" অনুপম একখানি পাঁচ টাকার নোট চাঁপার পদতলে ফেলিয়া দিয়া প্রণাম করিল। চাঁপা বলিল "তবে আজ কমলিনীর সঙ্গে ভ্রমরের মিলনটা হওয়া চাই।"

অ। তাতো হবে। তুমি বৈকালে গিয়ে কি কথা ব'ল্লে—বল, কিবা উত্তর দিল।

চাঁ। আরে ভাই আমার দূতীগিরির চোটে সে কি আর পলাতে পারে। তার কালীভক্তি উড়ে গিয়েছে। আজ রাত বারটার পরে তোকে যেতে ব'লেছে। জানালায় বাগান থেকে ঘা মারলেই দরজা খুলে দেবে।

সে এখন অনেক দেরি আছে। আমি তোদের জন্য কিছু খাবার তৈয়ার ক'রে রেখেছি—আর লাল মালও আছে। এখন শরীরটা মনটা শানয়ে নে।" চাঁপা চাল কড়াই ভাজা একটি থালা করিয়া মতি ও অনুপমের সম্মুখে ধরিয়া দিল। মদের বোতল ও গ্লাস আনিয়া রাখিল। তিনজনেরই মদ্যপান চলিতে লাগিল।

উনবিংশ অধ্যায়।

অমাবস্যার নিশি। অন্ধকার আপনার শরীরের ভিতরে যাবতীয় পদার্থকে পুরিয়া রাখিয়াছে। আকাশে তারা সকল মিটু মিটু করিতেছে। দেখিতে দেখিতে রজনী দ্বিপ্রহর অতিক্রম করিল। অনুপম মদের নেশায় কাদম্বিনীর জন্য অস্থির হইয়া উঠিল। মতিকে সঙ্গে করিয়া কাদম্বিনীর গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল। দুজনেরই সামান্য নেশা—তাহাতে বুদ্ধি উল্টিয়া পড়ে নাই। দুজনে চলিল—কাদম্বিনীর গৃহের পশ্চাতে বাগানে প্রবেশ করিল! বাগানে একটী ঝোঁপের আড়ালে মতি লুকাইয়া বসিল। অনুপম কাদম্বিনীর জানালায় ঘা মারিল। কোন উত্তর পাইল না। অনুপম জানালার ফুটা দিয়া দেখিল ঘরের ভিতর আলো জ্বলিতেছে। ভাবিল—কাদম্বিনী তার অপেক্ষায় অত রাত্রি পর্য্যন্ত আলো জ্বালিয়া রাখিয়াছে। অনুপম আবার জানালায় ঘা মারিল—কোন উত্তর পাইল না। ডাকিল—কোন উত্তর পাইল না। মতির কাছে বলিল, "কৈ উত্তর দেয় না যে—ঘরে আলো তো জ্ব'লছে—বোধ হয় ঘুমেয়ে প'ড়েছে"। মতি বলিল প্রাচীর ডিঙ্গান কি যায় না?

অ। যায় বৈকি? তাই দেখা যাউক। তুই আমায় কাঁধে ক'রতে পারবি তো?

ম। তা খুব পারবো?

তখন দুজনে প্রাচীরের কাছে যাইল। মতি উপু হইয়া বসিল। অনুপম কাঁধে চাপিল। মতি মোট লইয়া দেয়াল

ধরিয়া উঠিল—খাড়া হইল। অনুপম প্রাচীরের মাথায় উঠিয়া বসিল। পরে প্রাচীর হইতে লাফাইয়া বাটির উঠানে পড়িল। মতি সেই বাগানে ঝোঁপের কাছে আসিয়া আবার বসিল।

অনুপম উঠানে পড়িয়াই দাঁড়াইয়া দেখিল—কাদম্বিনী কালীর সম্মুখে। কালীর ঘরের দ্বার খোলা—ঘরে আলো জ্বলিতেছে। কাদম্বিনী সম্মুখে বসিয়া আছে। অনুপম কাদম্বিনীর পশ্চাতে গিয়া দাঁড়াইল—দেখিল কাদম্বিনী চেলির কাপড় পরিয়াছে—মাথার সিঁথায় সিঁদুর লেপিয়া আলতায় মা কালীর পাদদেশ রঞ্জিত করিয়া দিতেছে। আপনার গলায় জবার মালা পরিয়াছে—কালীর পাদদেশে রাশীকৃত জবাফুল রাখিয়াছে। কাদম্বিনী অনুপমের দিকে ফিরিয়াও দেখিল না। গলায় কাপড় দিয়া করযোড়ে বলিল "মা! তোমার আদেশ কি প্রকারে পালন ক'রবো বল। আমার পরীক্ষা কি প্রকারে হবে?" বলিয়াই ঘরের প্রদীপ নিবাইয়া ফেলিল। অনুপম দাঁড়াইয়া থাকিল। দাঁড়াইয়া কত কি ভাবিতে লাগিল।

ঘরে আবার আলোক প্রজ্জ্বলিত হইল। এবারে অনুপম দেখিল—কাদম্বিনী—উলঙ্গা—আলুলায়িতকেশা এক হস্তে কালীর খড়্গ—তদবস্থায় অনুপমের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। দাঁড়াইয়া অনুপমকে বলিল, "তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিব—ও ঘরে যাবে না এ ঘরে?" তখন কাদম্বিনীর চক্ষু দিয়া আগুন ছুটীতে লাগিল। অনুপম কাদম্বিনীর ধরণ দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়াছিল। প্রাণটা যেন নিরস নিরস বোধ করিতেছিল—সেখান হইতে পলাইবার বাসনা হইতেছিল, কিন্তু তথাপি প্রকৃতির আকর্ষণ ছাড়াইতে পারিতেছিল না।

অনুপম কিছু উত্তর দিল না—দিতে পারিল না, কথা যেন কণ্ঠনালীতে বদ্ধ হইল। কাদম্বিনী আবার বলিল, "আমি তোমার নিকটে নির্লজ্জা হইয়াছি—তুমি আমার সতীত্ব নষ্ট কোন ঘরে করিবে? এই ঘরে না ও ঘরে?" অনুপম ধীরে ধীরে মৃতভাবে বলিল, "এ ঘরে নয় ও ঘরে চল।" কাদম্বিনী খাঁড়া কালীমার চরণতলে রাখিল, অনুপমকে বলিল, "মাকে প্রণাম কর—আজ তোমার সহিত আমার বিবাহ।

অনুপম প্রণাম করিল—অনুপম যন্ত্রের মত কাদম্বিনীর হাতে যেন পরিচালিত হইতে লাগিল।

কাদম্বিনী অনুপমের হাত ধরিল, হাত ধরিয়া অন্য ঘরে লইয়া গেল।

অনুপম সেই ঘরে গিয়া দেখিল একটি থালে লুচি তরকারি ও নানাবিধ মিষ্টসামগ্রী। কাদম্বিনী অনুপমকে বলিল, "ভাই! আগে ওই গুলি খাও, তার পর তোমার মনস্কামনা পূর্ণ করিব।" অনুপম সেই থালার কাছে বসিল—চিন্তায় ডুবিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। কাদম্বিনী বলিল, "প্রিয়তম! আমার কথা যদি না শুন, তোমার কথা কি প্রকারে শুনিব। আমার মাথা খাও ওগুলি খাও।" অনুপম মৃত্তিকার দিকে দৃষ্টি বদ্ধ করিয়া থাকিল—অনুপমের প্রাণে কে যেন বিষাদের গরল ঢালিয়া দিয়াছে। কাদম্বিনী তখন আপনি একহাতে অনুপমের গলা ধরিয়া, একহাতে লুচি তরকারি লইয়া অনুপমের মুখের ভিতর দিল। অনুপম আস্তে আস্তে যেন অজ্ঞাতে সেগুলি চিবা-ইয়া বহুকষ্টে গলাধঃকরণ করিল। দ্বিতীয় গ্রাস দিতে যাইবে অনুপম কাঁদিয়া ফেলিল। কাদম্বিনী কিছু বলিল না—মুখের

ভিতর লুচি তরকারি গুঁজিয়া দিল--অনুপম খাইল না। বলিল, "কাদম্বিনী! আমি আর খাব না। আমার বোধ হয় আজ শেষ দিন—আমার অন্তরাত্মা যেন ব'ল্‌ছে আমায় আজ ম'র্‌তে হবে। তোমায় একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি আজ আমাদের বাটীতে যা যা হ'য়েছে তাই তাই কি প্রকারে তৈয়ার ক'রেছ" ?

কাদম্বিনী তখন বলিল, "তোমার জননী ও স্ত্রীর আপ্‌শোস আমি মিটাইতেছি। তারা তোমার জন্য খাবার কোলে করিয়া বসিয়া কাঁদিতেছে—আজ তোমার শেষ দিন, তাদের আশা আমি পূর্ণ করিতেছি।

কথা শুনিবামাত্র অনুপমের গায়ে কাঁটা দিল—মাথা যেন ঘুরিয়া পড়িল—বুক টিপ্‌ টিপ্‌ করিতে থাকিল।

অনুপম চমকিত ভাবে জীবনপথে দিশেহারার মত বলিল "আজ আমার শেষ দিন কি প্রকারে বুঝিলে" ?

কা। আমি তো তোমায় অনেক দিন হইতে বলিতেছি।

অ। তুমি কি আমায় মারিবে নাকি ?

কা। তুমি আমায় কুভাবে স্পর্শ করিলে তোমায় কাজে-কাজেই মারিব। স্পর্শ করিলেও মারিব, না করিলেও মারিব। যখন বাঘিনীর কাছে এসেছ—নিশ্চয়ই মারিব।

অ। আমার সঙ্গে পারিবে? তুমি স্ত্রীলোক আমার সঙ্গে পারিবে ?

কাদম্বিনী অমনি বিছানার তলদেশ হইতে একখানি তরবার বাহির করিয়া ঊর্দ্ধে তুলিয়া সতেজ বাক্যে বলিল "অনুপম! ইষ্টদেবতাকে স্মরণ কর—এইবার তোমার শেষ সময়।" দেখিয়া

অনুপম হতবুদ্ধি হইল—জড়প্রায় আড়ষ্ট হইয়া একদৃষ্টে কাঁপিতে কাঁপিতে অশ্রুমোচন করিতে লাগিল। কাঁদিতে কাঁদিতে অনুপম করযোড়ে বলিল "আমায় ছাড়িয়া দাও। তুমি উলঙ্গ হইয়াছ কেন? তোমার ভিতরে কালীমূর্ত্তির মত কি দেখিতেছি। আমায় ছাড়িয়া দাও। আমায় কাটিওনা, আমায় কাটিও না। তোমার ভিতরে কালীমূর্ত্তির মত কি দেখিতেছি"। যেমন জলের ভিতরে আকাশ দেখা যায়—গাছ পালার ছায়া দেখা যায়—অনুপম বাস্তবিক তখন কাদম্বিনীর দেহের মধ্যে কালীর অস্ফুট ছায়া দেখিতেছিল। দেখিবা-মাত্র অনুপমের আপাদমস্তক কাঁপিয়া উঠিল—হৃদয়ে ভক্তির অমৃতোচ্ছাস উঠিল—মাথার চুল পর্য্যন্ত খাড়া হইল। অনু-পম করযোড়ে—একদৃষ্টে "মা- মা—আমি পাপী—আমি পাপী আমায় ক্ষমা কর"—বলিতে বলিতে সেইখানে বসিয়া পড়িল। তখন অনুপমের প্রাণের চারিদিকে মৃত্যু—অনুপম মৃত্যুমুখে পড়িয়া ব্যাকুল প্রাণে কাঁদিতে কাঁদিতে—ভক্তিরসে নবজীবন লাভ করিয়া অনেক দিনের একটী পুরাণ গান যেন প্রকৃতির বলে গাহিতে লাগিল।—সে গান, অনুপমের যেন অনিচ্ছায়, আর কেহ তার হৃদয়ে বসিয়া—তার জিহ্বায় অপানার জিহ্বা লুকাইয়া—তার হৃদয়ে আপনার হৃদয় প্রবল করিয়া—কাদম্বিনীর দেহ প্রকাশিত কালীমূর্ত্তির দিকে তাকাইতে তাকা-ইতে অগ্নিপূর্ণ তেজে গাহিতে লাগিল :—

মা বসন পর.

বসন পর, বসন পর, মাগো বসন পর তুমি,
চন্দনে চর্চ্চিত জবা, পদে দিব আমি।

গমের .

কালী ঘাটে কালী তুমি, মাগো কৈলাসে ভবানী,
বৃন্দাবনে রাধা প্যারী, গোকুলে গোপিনী।
কারবাড়ী গিয়েছিলে মাগো কে করেছে সেবা,
শিরে দেখি রক্তচন্দন পদে রক্ত জবা।
মাথায় সোনার মুকুট মাগো ঠেকেছে গগনে,
মা হয়ে বালকের পাশে উলঙ্গ কেমনে।

গাহিতে গাহিতে অনুপম অর্দ্ধমূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল। চোখের জলে গণ্ডস্থল, বক্ষস্থল ভাসিয়া মাটী ভিজিতে লাগিল।

কাদম্বিনী তখন বস্ত্র পরিধান করিল। ঘরের বিছানায় স্বর্গের বাঘিনীর মত সতেজে পাপ-অনুপমকে মারিবার জন্য যেন থাবা পাতিয়া বসিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে, ধীরে ধীরে বিছানার দিকে ভয়ে ভক্তিতে সেই পুণ্যময়ী মূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর করিবামাত্র অনুপমের প্রাণের গভীরতম স্থান হইতে—অনুপমের হাড়ের ভিতর হইতে—কে যেন বলিল "সাবধান সাবধান।" অনুপম কখন প্রাণের ভিতর হইতে বাণী শ্রবণ করে নাই। হঠাৎ সেই তেজস্বিনী ভাবময়ী ভাষা শ্রবণ করিবামাত্র অনুপমের হৃদয়ের স্বর্গালোকে যেন স্বর্গীয় আলোকের বন্যা আসিল। অনুপম অনুভব করিল তার প্রাণে যেন শক্তির উপর শক্তি অবির্ভূত হইতেছে। তার অনেক বৎসরের দুর্দ্ধর্ষ নীচ প্রবৃত্তিকে কে যেন চাপিয়া ধরিতেছে। অনুপম হঠাৎ এক দারুণ যন্ত্রণাদায়ক সৌন্দর্য্য-জগৎ—পবিত্রতাভূমি অনুভব করিতে করিতে ভাবভরে অভিভূত হইতে লাগিল। এক সদিচ্ছার ঝটিকা নূতন ভাবে তাহার অস্তিত্বকে উল্টাইবার প্রয়াস পাইতে থাকিল।

যেমন যাদুতে মোহিত হয়, আত্মভ্রমে ভ্রান্ত হয়, অনুপমের ঠিক সেইরূপ দশা হইল। ভিতরে পাপ ছট্‌ফট্‌ করিল—কুবাসনা মড় মড় করিয়া যেন ভাঙ্গিয়া গেল—স্বর্গের হুঙ্কারে পাপ সকল কম্পিত কলেবর হইল।

অনুপম চুপ করিয়া অধোমুখে কাদম্বিনীর সম্মুখে বসিয়া থাকিল। বসিয়া কাঁদিতে লাগিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "কাদম্বিনী! তুমি দেবতা, আমি জানিতাম না—আমায় ক্ষমা কর তো বাঁচিব।

কা। না করিলে?

অ। আমার অদৃষ্টে ঘোর নরকযন্ত্রণা আছে।

কা। ক্ষমা করিয়াছি।

অ। কেবল ক্ষমা করিলে কি হবে? পাপিষ্ঠের উপায় কর। আর পাপে মজিতে না হয় এমন উপায় বলিয়া দাও।

কা। আজ হ'তে কালীমন্ত্র গ্রহণ কর। গৃহত্যাগ কর। সংসার ভুলিয়া যাও। ভিক্ষাদ্বারা কয়েকমাস উদরপূর্ত্তি কর। পথে পথে দাঁতে কুটা লইয়া লোকের পদধূলি অঙ্গে লেপন কর।

অনুপম কাদম্বিনীর কথা শুনিতে শুনিতে ক্ষত প্রাণে স্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। দুই হাতে কাদম্বিনীর পা জড়াইয়া, তাহাতে মাথা রাখিয়া, "ওগো আমি বড় পাপী—ওগো তুমি আমার মা, আমি জানিতে পারি নাই। আমায় ক্ষমা কর—আমায় বলিদান দাও"। বলিতে বলিতে কিয়ৎক্ষণ সেইখানে মৃতবৎ পড়িয়া থাকিল। কাদম্বিনী একটু সরিয়া গেল। অনুপমের সংজ্ঞা হইলে রক্তিম সজল নয়নে উপবেশন করিল।

কাদম্বিনী বলিল, "যাহা ঘটিয়াছে, তোমার উদ্ধারের জন্য, মন্দ বলিয়া জগতে কিছু নাই। পাপ হইতে পুণ্যের উৎপত্তি। সেজন্য দুঃখ করিও না। আজ হইতে স্বর্গে জন্মিয়াছ—স্বর্গের উপযুক্ত হইতে প্রয়াস পাও।" শুনিতে শুনিতে করযোড়ে অনুপম সাধ্বীকে প্রণাম করিল। সাধ্বী আশীর্ব্বাদ করিল, "সত্যের জয় হউক—কলঙ্কে উদ্ধার হউক।"

অ। আজ হতে আমার হরিনামে—কালীপদে মতি হবে কি মা?

কা। আজ তোমার পাপ ক্ষয় হ'ল। আমার ঘরে যে দেবতার শান্তির জন্য আসিয়াছিলে, তাঁর চিরকালের জন্য শান্তি হইল। অনুপম! সতীর কাছে যে আসে—তার এইরূপই হয়—পূর্ব্ব জন্মের সৌভাগ্য না থাকিলে কুবাসনা লইয়া ও সতীর কাছে আসা যায় না। অনুপম! সতীর সতীত্ব নাশ করে কার সাধ্য? তুমি যদি আজ সসাগরা পৃথিবীর রাজা হ'য়ে, সৈন্য সামন্ত ল'য়ে আসতে, তো আমায় সতীত্বভ্রষ্ট কর্ত্তে পার্‌তে না। বরং তোমায় শাস্তি পেতে হ'তো।

কাদম্বিনী আবার অগ্নিময় বচনে বলিলঃ—"জগতে সতী আছে তাই সূর্য্যে ধবল কিরণ আছে চন্দ্রে মাধুরী আছে—পুষ্পে সুগন্ধ আছে—ভূমিতে উর্ব্বরতা আছে, নহিলে জগৎ অন্ধকারেই থাকিত,—অনাহারেই মরিত।"

কথা শুনিতে শুনিতে অনুপম দুঃখলজ্জায় মৃতপ্রায় হইয়া অশ্রুমোচন করিতে লাগিল—অনুতাপানলে পুড়িতে থাকিল।

কাদম্বিনী বলিল :—তোমায় ব্যবস্থা দিতেছি গ্রহণ কর। দুই বৎসর ভিক্ষাব্রত লও। গাছতলায় বা লোকের আশ্রয়ে

শয়ন ও রন্ধনাদি করিবে। লোকের দয়ার উপরে দুই বৎসর কাটিয়া গেলে—আমার ভবনে আসিয়া থাকিবে। এই সময়ে পিতা, মাতা, স্ত্রী আত্মীয়গণ সংসারে আনিবার জন্য কাঁদিবে, মাথা খুঁড়িবে, ভয় দেখাইবে, যন্ত্রণা দিবে, কিন্তু ধৈর্য্যের সহিত এসব সহ্য করিয়া হরিপদে মন স্থির রাখিতে হইবেক। যদি আমার আদেশ প্রতিপালন না কর, তো, সতীসম্ভোগের বাসনাজন্য কুষ্ঠরোগে প্রাণত্যাগ করিতে হইবেক। আজ বিদায় হও। কাহাকে কিছু বলিবে না।" অনুপম শুনিতে শুনিতে আপনার দুষ্কর্ম্মের জন্য কঠিনতর শাস্তির ইচ্ছা করিতে লাগিল। ভাবিতে ভাবিতে কাঁদিতে থাকিল। কাদম্বিনী আবার গম্ভীর ভাবে বলিল, "বাছা! তুই বড় ভাগ্যবান। তোর পূর্ব্ব জন্মের ও ইহজন্মের বাসনা আজ শেষ হ'ল। আমার বাসনার সঙ্গে তোর বিষয় বাসনা অন্তর্হিত হ'ল। তোর আজ শেষ দিন। তুই আজ নবজীবন পেলি। আজ তুই জগতে ভূমিষ্ঠ হ'লি। আমি তোর গুরু হ'লাম। তোর সমুদয় পাপ আমি ব্রহ্মতেজে দগ্ধ ক'রেছি!" অনুপম কাঁদিতে কাঁদিতে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "মা! আমার পাপক্ষয় কিসে হবে? আমি যে মহাপাপিষ্ঠ মা! আমাকে জীয়ন্ত ডালকুত্তোকে দিয়ে খাওয়ালেও, যে আমার পাপক্ষয় হয় না। মা! আমায় কেটে ফেল।"

কাদম্বিনী বলিল, "যদি আজ তুই আমায় স্পর্শ ক'রতিস, তো, ঐ তরবারে তোর মস্তক ছেদন কর্ত্তাম। সেই রক্তে মার পা ধুইয়ে দিতাম। কিন্তু পুণ্যবলে তোর আজ পাপক্ষয়

হ'ল, তাই এ দেহটা বাঁচ্‌লো। আজ আর নয়। দুই বৎসর পরে আস্‌বি। আজ বিদায় হ।"

অনুপম সাধ্বীকে প্রণাম করিয়া দুই বৎসরের জন্য বিদায় লইল।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

অনুপম বিদায় লইল। সংসারের নিকটে—পিতার নিকটে জননীর নিকটে—স্ত্রীর নিকটে। যে সংসারে তার অমূল্যরত্ন আত্মার এত দুর্গতি, সে সংসারের নিকটে বিদায় লইল। যে পিতা মাতা অনুপমের জন্য একদিনও সুখী হইতে পারে নাই—অনুপমের দুশ্চরিত্রতার উৎপাতে জ্বালাতন হইয়াও, অনুপমকে একদিন দেখিতে না পাইলে, অনুপমের একটু খাওয়ার ক্লেশ বুঝিলে, মর্ম্মযাতনায় অধীর হয়; অনুপম সেই জনক জননীর নিকট বিদায় লইল—কেননা তাহাও অসার; জীবনের জ্বালা তাঁহাদিগের দ্বারা মিটিবে না। আর স্ত্রী? সে তো বিবাহ অবধি কাঁদিতে কাঁদিতে স্বামীর মঙ্গলকামনায় হৃদয় ক্লান্ত করিয়াও একদিন স্বামীর স্নেহ পায় নাই—ভালবাসা দেখে নাই—সে স্ত্রীর নিকটেও অনুপম মনে মনে বিদায় লইল। বন্ধু বান্ধব? সেতো পৃথিবীতে বালুকার খেলা ঘর—তাহাতে কি হয়? বিপদ ভিন্ন সম্পদ বন্ধুদিগের কাছে পাওয়া যায় নাই। অনুপম দৈবশক্তির অধীনে সে সবের নিকট বিদায় লইল।

কাদম্বিনীর গৃহপরিত্যাগ করিবার সময় একটু সামান্য রাত্রি ছিল। অনুপমে রাত্রি ছিল না—স্বর্গের আলোক হাসিতেছিল। অনুপমে স্বর্গের সুগন্ধ আসিয়াছে—পবিত্রতার জ্যোতি খেলিতেছে—হৃদয়ে স্বর্গ-সঙ্গীত চলিতেছে। অনুপম সেই সব নবীন দ্রব্যের আকর্ষণে বিভোর হইয়া, গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া চলিল। অনুপম আজ স্বর্গযাত্রী। পাখী যেমন আকাশে সুস্বর ছড়াইয়া—প্রাতঃসমীরণ যেমন পথে সুগন্ধ বিক্ষিপ্ত করিয়া—বিদ্যুৎ যেমন অন্ধকারে হাসিয়া যায়, অনুপমের হৃদয়ে সেইরূপ যেন কত কি স্বর্গের ব্যাপার সংঘটিত হইতে লাগিল। কখন বৈরাগ্য, জ্বলন্ত পাবকশিখাময় নয়নে, পাপশোণিতচর্চ্চিত-দেহে, মহাতেজে প্রবৃত্তির বন্ধন ধরিয়া নাড়া দিতে লাগিল—স্নায়ুযন্ত্রে কম্পন উপস্থিত করিল--হিমালয়সদৃশ স্বর্ণস্তূপকে দুর্গন্ধময় বিষ্ঠারাশিতে পরিণত করিয়া, অনুপমের প্রাণকে নিত্যসত্যধন লাভের জন্য ব্যাকুল করিল। কখন ভক্তি, অশ্রুসিক্তকুসুমপরিচ্ছদে আবৃত হইয়া, প্রাণী-জগতের পদধূলিময় মুকুট মস্তকে লইয়া, চাতকের মত কাতর স্বরে, অনুপমের প্রাণের মধ্যে আসিয়া, অনুপমকে প্রণাম করিতে করিতে, চরণে ধরিয়া স্বর্গে লইবার জন্য রোদন করিতে লাগিল। কখন জ্ঞান অসংখ্যসূর্য্যনেত্র-পরিশোভিত দেহে, অনন্ত রূপ বস্ত্র পরিধানে, হৃদয়ে, মনে, দেহে, জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে, আলোক রাশি ঢালিয়া দিয়া প্রাণারাম বজ্রগম্ভীর স্বরে অনুপমকে স্বর্গের দিকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। অনুতাপের তাড়নায় কাঁদিতে কাঁদিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার লৌহ শৃঙ্খলে জীবনের উচ্চ সঙ্কল্প বাঁধিয়া অনুপম অনেক দূর চলিয়া গেল। আত্ম-

প্রকৃতির ছবি বাহ্য প্রকৃতিতে দেখিল। আকাশ নিশ্চল নহে—স্থির জড়পিণ্ড নহে, তাহার ভিতরে চৈতন্য—মহাচৈতন্য অনন্ত চাহনিতে জন্ম বৃদ্ধি মৃত্যু অবলোকন করিতেছেন; প্রকৃতির শোভা অনন্তগভীর, সেই গভীরতায় কে দিন রাত্রি জাগিয়া জাগিয়া জগতের পাদবিক্ষেপ গণিতেছেন—দেশ ডুবাইতেছেন—ভাসাইতেছেন—নরনারীর কপাল ধরিয়া কাহাকেও পথের ভিখারী, কাহাকেও স্বর্ণসিংহাসনে রাজা করিতেছেন। অনুপম দেখিল, তার আপনার লোকের মত প্রিয় শাসনকর্ত্তার মত—প্রাণের দেবতার মত, কে যেন, জগতের আবরণ তুলিয়া, উঁকি মারিয়া লোকের পাপের হিসাব লোকেরই মনের খাতায় বিবেকের বাতি জ্বালিয়া লিখিয়া রাখিতেছেন। অনুপম দেখিল—প্রাণে যিনি বিবেক—তিনি জলে স্থলে, লতায়, পাতায় থাকিয়া অহোরাত্র মানুষকে নীরব-বজ্রনাদে উপদেশ দিতেছেন।

অনুপম নব জগতে ভ্রমণ করিয়া নূতন শোভায়—নূতন শব্দে—জাগ্রত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কত গ্রাম কত মাঠ অতিক্রম করিল। প্রভাতের সূর্য্য পূর্ব্বাকাশ হইতে পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িল। অনুপম মনের আবেগে প্রায় ৯।১০ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিল। একটি গ্রামে প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিয়া একটি কালীমন্দির দেখিয়া, সেই দেবীসন্নিকটে সেদিন অতিবাহিত করিবে, মনে স্থির করিয়া, সেইখানে, মন্দিরের সম্মুখস্থ তৃণপরিশোভিত প্রাঙ্গণে উপবেশন করিল। পশ্চাতে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষ। সেই বৃক্ষতলে বসিয়া মনোমধ্যে সংগ্রাম করিতে লাগিল।

অনুপমকে দেখিয়া ২।৩ জন ভদ্রলোক তাহার সহিত আলাপ করিল। তাহারা অনুপমকে আপনাদিগের বাটীতে লইয়া যাইতে কত যত্ন-অনুরোধ করিল। অনুপম অগত্যা বাধ্য হইয়া এক জনের বাটীতে গেল। তাহার বাটীর বাহিরে একখানি খোড়ো চণ্ডীমণ্ডপ আছে। সেই চণ্ডীমণ্ডপের এক দিকে কতকগুলি খড়। এক কোণে ঘুটের স্তূপ। ভদ্রলোক একখানি কম্বল আনিয়া পাতিয়া দিল। অনুপম তাহাতে বসিয়া ধর্ম্মস্রোতে ভাসিতে লাগিল।

অনুপম জীবনে যাহা ভাবে নাই, শুনে নাই, দেখে নাই, তাহা সম্ভোগ করিতেছে। মানব প্রকৃতির ভিতরে যে এমন স্বর্গ লুকান আছে, দুর্ব্বলতার ভিতরে যে এত বল সঞ্চিত আছে—অশোভার অন্তরালে যে এত সৌন্দর্য্য প্রচ্ছন্ন আছে, অনুপম তাহা জানিত না। এখন তাহা দেখিল—স্পর্শ করিয়া তেজে ফুলিতে লাগিল, মনস্তাপে কাঁদিতে থাকিল। এই রক্ত-মাংস-রচিত শরীরের ভিতরে বিধাতা এত রত্ন রাখিয়াছেন—কোমল মেঘের ভিতরে বজ্রসংস্থাপনের মত মানুষের অতি দুর্ব্বল প্রাণে এত বল সংস্থাপিত করিয়াছেন, অনুপম তাহা জানে নাই, আজ একবারে সম্ভোগ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। এত নীচতা, জঘন্যতা, দুর্দ্দর্বতা ভেদ করিয়া যখন আত্মবিবেকের মুখ দিয়া অগ্ন্যুদ্গম হইতে লাগিল, সুভাবের প্রবাহ অনুপমের প্রকৃতিকে ভাসাইয়া স্বর্গের দিকে ঠেলিতে থাকিল—পবিত্রতার উচ্ছ্বাস ধমনী সকলকে স্ফীত করিতে লাগিল—তখন অনুপম আপনার অতীত যৌবন-বিকারের স্মৃতিভাণ্ড হইতে হলাহল পান] করিতে করিতে

হৃদয় ফাটাইয়া নীরবে মূকের মত অশ্রুধারা বিগলিত করিয়া, ঘৃণায় লজ্জায় পথের বিষ্ঠারাশিতে মিশিয়া যাইতে ইচ্ছা করিয়াছিল। মানুষের প্রকৃতি, সর্পের মত হইলেও, তাহার মাথায় যে মাণিক আছে; মানুষের পাপদমনের এত দুর্ব্বলতায় মানুষের সাহায্যের জন্য যে এত স্বর্গবিক্রম জাগ্রত আছে, অনুপম তাহা অনুভব করিয়া অনুতাপানলে ভস্মীভূত হইতে লাগিল।

অনুপম স্বকৃতপাপ সকল স্মরণ করিতে না চাহিলেও তাহারা প্রকৃতিবশে একে একে মনশ্চক্ষুর সম্মুখ দিয়া ছায়াবাজীর মত চলিয়া যাইতে লাগিল। কত ঘনীভূত জ্যোৎস্নাময়ী রমণীর সরল দৃষ্টিতে গরলদৃষ্টিপাত করিয়াছে—কত বিপন্না রমণীর সতীত্বনিধি অপহরণ করিয়া দুষ্ট কামের তৃপ্তি সাধন করিয়াছে—লোকের মনে অযথারূপে যন্ত্রনার বিষধারা ঢালিয়াছে—কত উন্নতিশীল যুবার অকলঙ্কচরিত্রে ঘোরতর-কলঙ্কপাত করিয়াছে—অনুপমের প্রাণে সেই সব চিন্তা গরল-পূর্ণ ফণিনীর ন্যায় দংশন করিতে লাগিল।

সেইখানে অনুপম সেই দিনের রাত্রি অতিবাহিত করিল। ভদ্রলোক অনুপমকে ভাত রাঁধিতে অনুরোধ করিয়াছিল—অনুপমের তাহা ভাল লাগে নাই। আহারে অনুপমের কেমন বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছিল। ভদ্রলোকের অধিক অনুরোধে বাধ্য হইয়া অনুপম কিছু জলযোগ করিল। তারপর রজনী ঈশ্বর-চিন্তায় পবিত্রভাবে অতিবাহিত করিল।

ভাবিতে ভাবিতে কাঁদিতে কাঁদিতে অনুপম নিদ্রিত হইয়া, সাধ্বী কাদম্বিনীর পুণ্যপ্রদসংসর্গে সদুপদেশ লইতে লইতে

রাত্রি অতিক্রম করিল। অনুপম জাগ্রত হইল, চক্ষু চাহিয়াই ভাবিল, আজ হইতে ভিক্ষা-ব্রত গ্রহণ করিতে হইবেক— ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে করিয়া হরিগান গাহিতে গাহিতে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবেক। প্রথমে লজ্জা হইতে লাগিল। মানুষে সে বেশ দেখিয়া কি ভাবিবে—কি বলিবে? যদি কোন আত্মীয় দেখে তো লজ্জায় মুখ ঢাকিব কি প্রকারে? শুধুপায়ে দু-পা চলিলে সর্দ্দি হয়—মান খর্ব্ব ব'লে বোধ হয়—আজ একেবারে পথের কাঙ্গাল—দুনিয়ার ফকির—কিরূপে সাজিব? মা শুনিলে কাঁদিয়া মরিবেন— বাবা জানিতে পারিলে লজায় ঘৃণায় অপমানে আত্মহত্যা করিবেন; আর স্ত্রী? সেই হতভাগিনী? যে সর্ব্বদাই এই মেঘের প্রণয়-বারি পানের জন্য চাতকিনীর মত শূন্যে তাকাইয়া চিরকাল শূন্যই দেখিতেছে, সেই স্ত্রী—সারদা,—আমি ভিখারী হইয়াছি শুনিলে, মনের দুঃখে গলায় দড়ি দিবে।" অনুপম আবার ভাবিল। "পথের কাঙ্গাল কে নয়? পৃথিবীতে মানী কে? লোকের কাছে যারা মান পায়, সে মানে নরকের পথ পরিষ্কার হয় মাত্র। ধর্ম্মের জন্য, প্রাণের পরিত্রাণের জন্য, ব্রহ্মলাভের নিমিত্ত, পথের ভিখারী সাজা, বহুজন্মের তপস্যার ফল। এ সুবিধা ভাগ্যবলে পাইয়া শেষে পায়ে ঠেলিলে নিজেই নরকগামী হব। হরিভাবে বিভোর হইয়া বিষ্ঠার কৃমি হওয়া ভাল; মহা ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়া কুভাব হৃদয়ে ধরিয়া লোকের কাছে মান কুড়ান, মহানরকভোগ ব্যতিত আর কিছুই নহে।" ভাবিতে ভাবিতে আপনার ভাবি ভিখারী সজ্জা মানস নয়নে অবলোকন করিয়াভক্তি-বৈরাগ্যের তেজে উৎ-

লাহিত হইতে লাগিল। ভিখারীবেশ মধুময় বোধ হইল—পথে পথে, নরনারীর দ্বারে দ্বারে, হরিগুণকীর্ত্তন অপেক্ষা আর প্রাণারাম কার্য্য জগতে কিছু নাই বলিয়া অনুভব করিল। জগৎ যেন ডাকিতে লাগিল! তখন ফুলের ভিতর হইতে কে অনুপমকে উৎসাহ দিতে লাগিল—লতা পাতার সৌন্দর্য্য হইতে কে যেন দুনিয়ার মানকে পদদলিত করিয়া প্রকৃত পদার্থ লাভের জন্য তাড়না করিতে থাকিল। অনুপম যেদিকে চাহিল, সেদিক ভিক্ষার কথা বলিল—যাহা ভাবিল, তাহা ভিক্ষার ঝুলি দেখাইল। আগে যে পথ দুর্গম বিঘ্নসঙ্কুল বোধ হইতেছিল এখন ধর্ম্মভাবপ্রভাবে, স্বর্গলাভবাসনায়, পুষ্পময়—মঙ্গলগঠিত বোধ হইল।

গায়ে একটী জামা ছিল, অনুপম তাহা ভাবভরে ছিঁড়িয়া ভিক্ষার ঝুলি করিল।

আর সময় নাই—সূর্য্য উঠিয়াছে। বাবু তামাক খাইতে খাইতে বাহিরে আসিল। বাবুর একটী ছোট ছেলে বাগি করিয়া গুড়মুড়ি খাইতে খাইতে চণ্ডীমণ্ডপের একটী খুঁটিতে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া অনুপমের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া মুড়ির শ্রাদ্ধ করিতে লাগিল। গোয়ালঘরে গাভী হম্বা রবে ডাকিল। দুই জন বৈষ্ণব খোল-করতাল লইয়া বাটীর দ্বারে হরিনাম করিতে লাগিল। খোল-করতালের শব্দে সেই হরিসঙ্গীত অনুপমের প্রাণে ধর্ম্মভাবের মহা তুফান তুলিল। সেই তুফানে; দুনিয়ার অসারতা—লোকমাত্রের নীচতা, স্পষ্ট নিরীক্ষণ করিয়া ভিক্ষা-ব্রতের উচ্চভাবে মোহিত হইল।

যে বাবুর বাটী, তাঁর নাম পদ্মলোচন। জাতিতে কায়স্থ।

তিনি অনুপমের ভাব দেখিয়াই বুঝিয়াছিলেন, এব্যক্তি সামান্য ব্রাহ্মণ নহেন। তাঁর সৌভাগ্য যে ইনি তাঁর চণ্ডীমণ্ডপ পবিত্র করিয়াছেন। পদ্মলোচন বাবু, চণ্ডীমণ্ডপে উঠিয়া, ব্রাহ্মণের স্কন্ধে ঝুলি—চক্ষে ভক্তির অশ্রুধারা—মুখে স্বর্গীয় দীপ্তি—চাহনিতে ভাবের জমাট—দেখিয়াই হরিভাবে পরিপূর্ণ হইয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত অল্প বয়সে আপনার এ বেশ কেন? এ দেখ্‌লে যে আর পৃথিবীতে থাক্‌তে ইচ্ছা করে না।"

অনুপম বলিল, "ভগবান যাকে যা করেন সে তাই হয়—ব্রাহ্মণের যা কর্ত্তব্য তাই করিব মনে করিয়াছি।"

অনুপমের এই সাজসজ্জার কথাটা বাটীর ভিতরে পঁহুছিয়াছিল। পদ্মলোচনের স্ত্রী, প্রাচীরের ফুটা দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিতে দেখিতে, চাঁদপানা মুখে কাঁদিয়া ফেলিল। "আহা! কোন্ অভাগীর কপাল ভেঙ্গেছে" বলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল। পদ্মলোচনের জননী মুখে তামাক পোড়া দিতে দিতে, বধূকে প্রাচীরের কাছে দাঁড়াইয়া কাঁদিতে দেখিয়া "কাঁদ্‌ছিস্ কেন গা" বলিয়া প্রাচীরের কাছে সরিয়া আসিল। বধূটী চক্ষের জল আঁচলে মুছিতে মুছিতে "বাহিরে কি দ্যাখগে না," বলিয়া রান্নাঘরে চলিয়া গেল। বৃদ্ধা কৌতূহলাক্রান্তা হইয়া বাহির বাটীতে আসিল। চণ্ডীমণ্ডপে সেই সুশ্রী যুবার স্কন্ধে ঝুলি দেখিয়া "ওমা একি!" ভাবিয়া কাঁদ কাঁদ হইল। ব্রাহ্মণের কাছে আসিয়া, গললগ্নকৃতবাসে কাঁদিতে কাঁদিতে প্রণাম করিয়া উঠিবামাত্র, ব্রাহ্মণ আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিলে, বৃদ্ধা ভয়ে সিহরিয়া উঠিল। "ওকি বাবা! তুমি ব্রাহ্মণ, আমি শূদ্র

ওকথা কি ব'ল্‌তে আছে”—এই কথা বলিয়া বৃদ্ধা পদ্মলোচনের দিকে চাহিয়া বলিল, “তা ভিক্ষা কেন? আমরা আজ ওঁর প্রসাদ পাব।” অনুপম আর সে দিকে মন না দিয়া ভিক্ষায় বহির্গত হইল।

অনুপম পদ্মলোচনের বহির্বাটীর চৌকাট অতিক্রম করিয়া পথে পড়িল। অনুপমের প্রকৃতি ভক্তিভরে টলমল করিতেছে—মাথা দীনতার ভারে পৃথিবীতে অবনত হইতে প্রয়াস করিতেছে। অনুপম পথে নামিয়া গভীর ভাবে কি ভাবিল। বিপদে বন্ধু—ভয়ে সাহস—লজ্জায় নির্ভয়তা—যে গান, সে গানকে স্বর্গসৌরভে পূর্ণ হইয়া, হরিদাসের—হরিপ্রার্থীর প্রাণ ভেদিয়া কণ্ঠকে পবিত্র করিয়া, সেই গ্রামের বায়ুস্রোতে ভাসিতে আহ্বান করিল। অনুপম পথে নামিয়া হরিচিন্তা করিবামাত্র হৃদয়-প্রাণ ভক্তিরস-সঙ্গীতে পরিণত হইল। প্রকৃতির বুকের ভিতর দিয়া যাহা প্রাণরূপে সঞ্চরণ করিতেছে, তাহা আজ সুযোগ পাইয়া অনুপমের কণ্ঠ ভেদ করিয়া বহির্গত হইল।—অনুপম ভাবভরে গাহিতে গাহিতে কাঁদিতে কাঁদিতে চলিল। দুই দশ পা, না যাইতে যাইতে, দুই পাঁচ জনের কর্ণে সেই সঙ্গীত উন্মাদক পীযুষধারা বর্ষণ করিল। কেহ কাছে আসিল—কেহ দূর হইতে দেখিতে লাগিল। অনুপম বাটীর দ্বারে দ্বারে গাহিতে লাগিল। ঝুলিতে, পুরুষ—স্ত্রীলোক—বালক, চাউল, ডাউল আলু ও পয়সা দিয়া অনুপমের ভাব-দর্শনে বিগলিত-চিত্ত হইল। বৃদ্ধারা সে মূর্ত্তি দেখিয়া আকুল প্রাণে কাঁদিতে কাঁদিতে ভিক্ষা দিল। বালকেরা সজল নেত্রে সেই দিকে তাকাইয়া থাকিল। ঘাটে যুবতী বাসন মাজিতে মাজিতে অবগুণ্ঠনের

অন্তরাল হইতে সেই ভিখারী-মূর্ত্তি দেখিয়া, "তাহারই মত কাহারও সোণার পাখী শিকল কাটিয়াছে," ভাবিয়া, "আহা!" বলিয়া অবগুণ্ঠনমধ্যেই অশ্রুপাত করিল।

অনুপম ক্রমশঃ গ্রামের ভিতরে যেখানে অনেকগুলি কোটাবাড়ী সেই অঞ্চলে প্রবেশ করিল। অনুপম গায়, আর কাঁদে। মানুষ তাহা দেখিয়া অবাক হইল। নানারূপ লোক নানা কথা বলিল। কেহ বলিল "সাধু। কেহ বলিল "উন্মাদ। কেহ বলিল "ভণ্ড। কিন্তু অনেকের প্রাণ সে ভাবে গলিতে লাগিল।

অনুপমের হরিভক্তি-মিশ্রিত গীত—তাহার উপর সজল নেত্র—তাহাতে আবার ব্যাকুল স্বর, দেখিয়া শুনিয়া পথের লোক দাঁড়াইয়া সেইদিকে চাহিতে চাহিতে আপনাদের জীবনের অসারত্ব ভাবিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিল। বাটির ভিতর হইতে, বালক বালিকা পথে দৌড়িয়া আসিল। যে যুবতীর স্বামী সে দিন প্রাতে বিদেশযাত্রা করিয়াছে, সে, সেদিন বিছা-নায় বিরহে ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল, এখন ভিখারীর কাতর কণ্ঠধ্বনি শুনিয়া প্রাণে আঘাত পাইয়া জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল। কেহ রান্না ফেলিয়া—কেহ মাথা মুছিতে মুছিতে—কেহ পানসাজা রাখিয়া—কেহ ছেলেকে দুধ খাওয়াইতে যাইতেছিল—তাহাতে ক্ষান্তি দিয়া, বাটির দ্বারদেশে আসিল; সেই ভিখারীর ধর্ম্মভাবে মোহিত হইয়া ভিখারীকে ভিক্ষা দিতে লাগিল। দেখিয়া কোন রমণী কাঁদিল, পাষণ্ডী কেহ বা হাসিল। কোন যুবতী-বিধবা বা ভিখারীর সঙ্গে ভিখারিণী হইবার সাধে দীর্ঘশ্বাস ফেলিল।

যেখানে চণ্ডীমণ্ডপে দুই চারি জন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিল, তারা অনুপমকে রাস্তা হইতে ডাকিয়া, বাটিতে লইয়া নানা কথা কহিতে লাগিল। কেহ উৎসাহ দিল—কেহ ঘরে ফিরাইতে বক্তৃতা করিল, কেহ বা কবিরাজ দ্বারা মস্তিষ্কের চিকিৎসা করাইবার কথা বলিল।

অনুপম কোন দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া, হরিভাবে বিভোর হইয়া সেদিন বেলা এগারটা পর্য্যন্ত গ্রামের পথে পথে, দ্বারে দ্বারে হরিগুণ কীর্ত্তনে আপনার পাপের ভার লঘু করিয়া, চাউল দাউল তরকারী পয়সাতে ঝুলি পরিপূর্ণ দেখিয়া, অবশেষে পদ্ম-লোচনের চণ্ডীমণ্ডপে ফিরিল।

অনুপম চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া রন্ধনাদি করিয়া আহার করিল। যেন অমৃত পান করিল। মা ভগবতীর হাতের ভাত খাইয়া অনুপম ভক্তিতে কাঁদিতে কাঁদিতে ভাবিল 'আমি আজ পথের কাঙ্গাল না স্বর্গের রাজা! এই জন্যই বুঝি ভক্তগণ ভিক্ষাব্রত গ্রহণ করেন।" অনুপম পদ্মলোচনের বাটিতেই অবস্থিতি করিয়া ধর্ম্ম সাধনা করিতে লাগিল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

পরিচ্ছেদ বিশেষে পাঠক পাঠিকাগণ অবগত হইয়াছেন যে, অনুপম স্ত্রীকে মনোক্লেশে রাখিয়া জননীর একান্ত অনিচ্ছায় মতির সঙ্গে বাহিরে গেল। জননী ও স্ত্রী, অনুপমের জন্য নানা-বিধ খাদ্যের আয়োজন করিতে লাগিল।

খাদ্যাদি প্রস্তুত হইলে পর, অনুপমের জননী, বধূকে বলিল "খাবার. থালে বাটিতে সাজাইয়া সরপোষ ঢাকা দিয়ে, ঘরে শোওগে—এখন আসে কি না তার ঠিক কি।"

বলিয়া রত্নাবতী, রান্নাঘরের মেজেতে আঁচল পাতিয়া ক্ষুণ্ণ প্রাণে শয়ন করিল। শুইয়া পুত্রের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে তন্দ্রিতা হইল।

বধূটি শাশুড়ীর কাছে বসিয়া ঢুলিতেছিল—ঢুলিতে ঢুলিতে স্বামীর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। শাশুড়ী কিয়ৎক্ষণ পরে তন্দ্রাভগ্ন হইয়া 'এখনও যে কারও শাড়া শব্দ নাই, তবে বুঝি আজ আর এ'ল না' বলিয়া বধূর দিকে চাহিয়া বলিল 'ওমা! তুমি কেন ঢুলছ—দুটো খাও, আমি শাশুড়ি বলছি—দোষ নাই।" কি করিবে—ঘুমের তাড়না, ক্ষুধার বেগ, শাশুড়ির অনুরোধ, এই তিনের মধ্যে পড়িয়া বধূ কিছু খাইল। তাহার পরে আপনার ঘরে ম্লানপ্রাণে গিয়া শয়ন করিল—ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইল।

রাত্রি কোন প্রকারে পোহাইল। রত্নাবতী জাগ্রত হইয়া দেখিল—সরপোষ ঢাকা খাবার যেমন তেমনি আছে। দেখিয়াই, "হায় ভগবান! এমন পোড়া কপালও ক'রেছিনু,' বলিয়া অঞ্চলে চক্ষু মুছিতে মুছিতে বাহিরে গেল। প্রাণটা ধড়ফড় করিতেছে—কি যেন প্রাণে যাতনা দিতেছে—জননী ছেলের জন্য পাগলিনী হইল। বাহিরে রাস্তায় মতিদিগের বাটীতে পুত্রের অন্বেষণে বহির্গত হইয়া, পথে মতিকে দেখিল—অনুপমকে দেখিতে না পাইয়া ভয়ে চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসিল "ও মতি! কই অনুপম কই?"

মতি নীরসভাবে "জানি না" বলিয়া চলিয়া যায়, দেখিয়া রম্ভাবতী আবার কাতরভাবে জিজ্ঞাসিল "জানি না কিরে! তোর সঙ্গে কা'ল রাত্রে গেল যে! মতি বলিল "আসবে এখন।"

রম্ভাবতী "সাত পাঁচ" ভাবিতে লাগিল। পুত্রের অমঙ্গল কামনা প্রবলতর হইতে থাকিল। রাস্তা হইতে ঘরে ফিরিয়া আসিল। বধূকে বিছানা হইতে উঠাইল। দুজনেই ব্যাকুল হইল।

বধূ বলিল—"চাঁপার বাড়ীতে গেলে বোধ হয় খবর পাওয়া যায়।" শ্বাশুড়ী তাহাই করিল। চাঁপার বাটীতে গেল। চাঁপা তখন তার মণ-প্রমাণ নিতম্বদেশ নাড়িতে নাড়িতে ঘর নিকাইতেছিল। রম্ভাবতী পশ্চাদ্দিকে গিয়া দাঁড়াইবামাত্র, চাঁপা একটু চকিতভাবে ফিরিয়া দেখিল। দেখিয়া "ওমা! বউমা এত সকালে কি মনে ক'রে।" রম্ভাবতী কাঁদু কাঁদুভাবে বলিল, "আর মা! ছেলের জ্বালায় জ্বলে মনু, যদি না হ'তো তো বাঁচতুম। কর্ত্তা কা'ল শুশুরবাড়ী গ্যাছেন। ছেলে কা'ল রাত থেকে মা! নিরুদ্দেশ—ছেলেকে খুঁজতে বেরিয়েছি!

চাঁপা একটু মনে মনে বিরক্ত হইল। ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া বলিল, "তা আমি কি তোর ছেলেকে লুকিয়ে রেখেছি? কা'ল সে শ্রীধরের গুণবতী মেয়ে কাদীর ওখানে গিয়েছে! সেখানে খবর লওগে। আমি কি বেশ্যা! যে আমার কাছে তোমার ছেলে এসে রাত কাটাবে? এ তোমাদের কেমন কথা বল দেখি? এক সময়ে কপাল দোষে একটা বদনাম রটেছিল, তার পর—বুড়ো বয়সে এখন হরিনাম না করে' জলস্পর্শ করি না!!"

রম্ভাবতী চাঁপার উগ্রমূর্ত্তিতে উগ্রবাক্যাবলী শুনিতে শুনিতে ভয় পাইতেছিল—পাছে সেই তিরস্কার তার চৌদ্দপুরুষান্ত করে। চাঁপা ততদূর গেল না, দেখিয়া, রম্ভাবতী যেন নিষ্কৃতি পাইল। পরে চাঁপার মন যোগাইয়া কাজ গুছাইবার জন্য বলিল "খুড়ি! আমি কি সেইভাবে এসেছি। অনুপম তোমার নাতি হয়—তুমি তাকে যত্ন টত্ন কর, আমাদের ভালবাস—তাই যদি সে সকালবেলা তোমার এখানে বেড়াতে এসে থাকে—তাই তল্লাস কর্‌তে এসেছি।

চাঁপা একটু মন নরম করিয়া বলিল "তা—এস—তা—এস, জন্ম জন্ম এস। আমার আর কি মা! তোমাদের নিয়েই আছি। তবে কি না পাঁচ জনে পাঁচ কথা কয় মা! তাতে বড় কষ্ট হয়! লোকে যা বলুক, ভগবান তো সব দেখছেন। তা অনুপম কি কা'ল রাত্রে আদতে বাটীতে যায় নাই?

রম্ভাবতী বিমর্ষস্বরে বলিল, "না মা! তা হ'লে কি এত সকালে কাতলা মাছের মত ছট্‌ফট্‌ ক'র্‌তে করতে আসি।"

চাঁপা একটু যেন সদয় হইয়া বলিল, "তা তুমি এখন ঘরে যাও। একটা কথা কাণে কাণে বলি, কা'কেও ব'ল না! যে গাঁ! শেষকালে আমাকেই পাঁচ জনে খাবে।"

চাঁপা রম্ভাবতীর কাণের কাছে আসিয়া ফিস্‌ফিস্‌ করিয়া বলিল, "কাদীর সঙ্গে অনুপম জুটেছে, কাকেও ব'ল না। "রম্ভাবতী শুনিবামাত্র ভয়ে চমকিয়া উঠিল, যেন বারুদে আগুণ পড়িল। চুপে চুপে বলিল, "খুড়ি। বলিস কি? তা যাই হ'ক মা, এ কথা যেন রাষ্ট্র না হয়। আমি মুখ পোড়াকে এইবার দেশছাড়া ক'র্‌বো।"

চাঁপা মনে মনে ভাবিল, তবে পীরিতে ম'জে গিয়েছে। তার পর রত্নাবতীকে একটু উৎসাহ দিয়া বলিল, "তা তুমি মা ঘরে যাও, আমি তার তল্লাস ক'রে আসছি।" "তাই একটু যত্ন ক'রে দেখে খবর দিস মা" ;—বলিয়া রত্নাবতী গৃহ-প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

চাঁপা গৃহ—কার্য্য সমাপন করিয়া, ঘরে চাবি দিয়া, বাহিরের দরজায় শিকল আঁটিয়া, শ্রীধরের বাটীর দিকে, মনে মনে হাসিতে হাসিতে, কত কি ভাবিতে ভাবিতে চলিল। বাটীর কাছে গিয়া দেখিল—দ্বার খোলা। সম্মুখেই কালীমূর্ত্তি দেখা যাই-তেছে। কালীর দাওয়ায় লাল শাটী পরিধানে গললগ্নকৃতবাসে করযোড়ে কাদম্বিনী চক্ষু মুদিয়া আছে।

আজ কাদম্বিনীকে দেখিবামাত্র চাঁপার প্রাণটায় যেন ধাঁধা লাগিল। মনটা যেন সংসার হইতে ভ্রষ্টভাব ধরিয়া বসিল। হঠাৎ কাদম্বিনীকে দেখিয়া যেন ভক্তির উদয় হইল। পাষাণ প্রাণে কোন দিন এরূপ হয় নাই। চাঁপা কাদম্বিনীকে যে কথা জিজ্ঞাসিতে, লজ্জা—ভয় বোধ করিল। অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিল; "সম্মুখে এইরূপ কালীমূর্ত্তি রাখিয়া আমিও কেন এরূপ করিনা? আর তো বয়স ফুরাল—শ্মশানে যাবার দিন স'রে এলো, এখন আমার ঐরূপ হ'লেইত ভাল।" কথা-গুলা কিয়ৎক্ষণ চাঁপারমনে ছুটাছুটি করিয়া আবার অন্তর্হিত হইল. যেন নিবিড় অন্ধকারে একটু সূর্য্যালোক নাচিয়া ক্ষণিকের মধ্যে অন্তর্হিত হইল। নির্ব্বাতস্থলে একটু মলয় বাতাস ছুটিয়া চলিয়া গেল। আবার চাঁপা ভাবিল, "কাদি ছিনাল—ওর সব দুষ্টামী। বাহিরে ধর্ম্মের ভাণ করে, ভিতরে পাপ করে। ধর্ম্ম আমি

কি করিনা? প্রায় চারি পাঁচ দিন অন্তর তো গঙ্গাস্নান করি। বামুন ফকিরকে দান করি। আমি কি ধর্ম্ম করি না? লোকে আমার নামে বদনাম দেয়—দিক। আমার মত যৌবনে অনেকেই কুকাজ করে, তবে যে ধরা পড়ে সেই চোর।" ভাবিতে ভাবিতে চাঁপা বসিল। বসিয়া ভাবিল—"তাইতো এখনও যে চক্ষু চায় না।" কাদম্বিনী চক্ষু চাহিয়া মাকে প্রণাম করিল। তারপর চাঁপার দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিয়া বলিল "কাল রাত্রে অনুপ এসেছিল।"

চাঁপার মুখে আনন্দ ফুটিয়া পড়িল. বিস্মিত ও উৎসাহিত ভাবে জিজ্ঞাসিল "তারপর"?

কা। তারপর তার মনস্কামনা পূর্ণ হ'লে, শেষ রাত্রে চিত্রপুরের এক ভদ্রলোকের বাটিতে গিয়েছে। সেখানে তার দেখা পাবে। ঠানদিদি। তুমি তার বড় বন্ধু। তার মা বাপ স্ত্রী কেঁদে কেঁদে সারা হ'চ্ছে—তুমি গিয়ে তাকে ধ'রে আন।

চাঁ। তা আমাকে যেতে হবে না, সে তোমার লোভে আবার আসবে এখন।

কা। না—এখন কিছুকাল আসবে না।

চাঁ। কেন? তোর সঙ্গে কি বনিবনাও হয়নি? তাকে কি তোর ভাল লাগেনি?

কা। খুব ভাল লেগেছে। তার মনপ্রাণ একবারে কেড়ে লয়েছি। এখন সে আমার জন্য ম'রতে পারে।

চাঁ। তবে আসবে না কেন?

কা। আমার হুকুম।

চাঁ। কবে আসবে?

কা। তুমি গিয়ে ডেকে দ্যাখগে—যদি আসে।

চাঁ। তার মা কেঁদে কেঁদে সারা হ'চ্ছে।

কা। পূর্ব্বজন্মের দুষ্কৃতির ফল। তুমি আমিতার কি করব বল।

চাঁপা একটু ভাবিতে ভাবিতে বলিল, "তা সেখানে গেলে দেখা পাওয়া যাবেতো।"

কা। যাবে।

চাঁ। তা আমি যদি যাই, তোর কিছু বল্‌বার আছে ?

কা। তাকে ব'ল, কাদি যা ব'লেছে যেন ভোলে না।

কিয়ৎক্ষণ পরে চাঁপা চলিয়া গেল।

চাঁপা অনুপমের অনুসন্ধানে বাহির হইল। মহেশপুর হইতে সে গ্রাম দশ বার ক্রোশ। চাঁপা সেদিন আহারের পর বাহির হইল। পথে এক আত্মীয়ের বাটিতে থাকিল। পরদিন ভোরে চাঁপা চিত্রপুর যাত্রা করিল।

বেলা আটটার সময় চাঁপা সেই গ্রামে পঁহুছিল। গ্রামে পঁহুছিবামাত্র একটি গানের আওয়াজ চাঁপার কাণে লাগিল। সেই গানের শব্দ ধরিয়া চাঁপা অগ্রসর হইল। কিয়দ্দূর গিয়াই দেখিল, অনুপম ঝুলি কাঁধে লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ভাবে বিভোর হইয়া গাহিতেছে :—

এসেছে এক নূতন মাতাল নদীয়ায়,
ও! তোরা কে দেখবি যদি চলে আয়।
মাতালের রঙ্গ দেখে
জল ঝরে সব পাপীর চ'খে—
কুল মান ত্যজে সবে মাতালের ওই পায় লুটায়।

মাতালের মাতলামীতে—

আগুন লাগে পাপের ভিতে

পরম শত্রু হ'লো মিতে পাপে কেউ না থাকতে চায়।

গান যেন ভাবের জোরে আপনি কণ্ঠ ভেদিয়া বাহির হইতেছে। অনুপম গাহিতে গাহিতে চারিদিকে সেই গানের সুরের উপর প্রকৃতির সুর চড়িতে দেখিয়া, চারিদিকের সৌন্দর্য্যে যেন গলিয়া পড়িতেছিল।

চাঁপা দূর হইতে অনুপমের ভিখারীবেশ দেখিয়াই চমকিয়া উঠিল, একটি গাছের আড়ালে দাঁড়াইল। প্রাণটায় যেন একটা কিসের চাপ পড়িল। হৃদয়টা যেন কে মুচড়াইয়া দিল। চাঁপা সেই গানের দিকে এক মনে—নিবিষ্টচিত্তে থাকিল। শুনিতে শুনিতে পাষাণ-প্রাণ গলিয়া গেল। চক্ষু দিয়া অশ্রুকণা বাহির হইল। প্রথমে—ফোঁটা ফোঁটা, তার পরেই স্রোতধারা ঝরিল। চাঁপা এক নূতন জীবনের উষালোক দেখিল।

চাঁপা কাঁদিতে কাঁদিতে ভাবিতে লাগিল। যত ভাবে তত কাঁদে, পাপ-ব্যথায় আকুল হয়। চাঁপা ভাবিলঃ—অনুপমকে এমন করিল কে? কাদি? কাদি তো তবে মহা সতী সাবিত্রী! আমি না জেনে না বুঝে—এত কাণ্ড করিলাম। আমার মত নারকী আর কে আছে? অনুপম কি ছিল কি হইল?" ভাবিতে ভাবিতে চাঁপা অনুপমের গান আবার শুনিতে লাগিল। গাছের আড়াল হইতে উঁকি মারিয়া দেখিল অনুপম ভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে গাহিতেছে। সম্মুখে দুইজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ শুনিতে শুনিতে কাঁদিতেছে। এক বৃদ্ধা অনুপমের ভিক্ষার ঝুলিতে এক-খানি থালে করিয়া চা'ল, ডা'ল, তরকারী ও পয়সা দিতেছে।

চাঁপা আর সে দৃশ্য দেখিতে পারিল না, গাছতলা হইতে সরিয়া পড়িল। অনুপমের সহিত দেখা করা হইল না। কি প্রকারে কথা কহিবে? চাপা ভাবিল, "আমি নরকের কীট, আজ অনুপম স্বর্গের দেবতা, আমি এ পাপ দেহে—এ পাপ মুখে কি প্রকারে কোন সাহসে-তার সহিত কথা কহিব? আমি শ্মশানের কুকুর—আমার পচা মড়া আহার, আমি আজ দেবতার নৈবেদ্য কি প্রকারে স্পর্শ করিব? আমিও ওই পথে যাই। দেখি ভগবান এ পাপীর উদ্ধার করেন কি না"। চাঁপা ভাবিতে ভাবিতে কাঁদিতে কাঁদিতে একদিকে চলিয়া গেল।

চাঁপা কোথায় গেল—গ্রামের কেহ জানিল না। সে এক জনদের বাটীতে একটী টুকনি ভিক্ষা করিয়া, কোন অজানিত জনপদে ভিক্ষা দ্বারা উদরপূর্ত্তি করিবে বলিয়া চলিয়া গেল। পাপবোধ প্রবলতায় আর ঘরে ফিরিল না। সে পথে, জন্মের মত কাঁটা পড়িল।

মহেশপুরে চাঁপার ঘরে কেহ ছিল না। ঘরে চাবি দেওয়াই থাকিল। একদিন, এক সপ্তাহ, একমাস, এক বৎসর, কাটিয়া গেল, চাঁপা গ্রামে আসিল না—ঘরের চাবি বন্ধই থাকিল। অনুপমের মা, বাপ, দুই চারি বার অনুসন্ধান লইয়াছিল। আর কেহ লয় নাই। কেহ লইবার ছিল না।

দেখিতে দেখিতে চাঁপার বাটীর দ্বারের কপাটে উই ধরিল, কপাটের শিকলে, কুলুপে মরিচা পড়িল। প্রাচীরের চালের, ঘরের চালের খড়—খসিতে লাগিল। চালের বাঁখারী বাহির হইল—দড়ির বাঁধন ক্রমশঃ পচিয়া খসিতে লাগিল! চাল ক্রমশঃ খড় শূন্য হইল। চালে ছিটুনির শলা বাঁখারী দাত বাহির

করিল। ক্রমশঃ তাহারাও পচিয়া অদৃশ্য হইতে লাগিল। ঘরের ভিতরে ইদুর, ছুঁচা, আর্সোলা, মশা, পালে পালে আশ্রয় লইল। ঘরের ভিতরে, জানালায়, কপাটে, রান্নাঘরের উননে, মাকড়শা জাল বুনিয়া, ডিম পাড়িয়া, ঘর করিতে লাগিল। উঠান ঘাসে জঙ্গলে পুরিয়া গেল।

তার পর, পাঁচ বৎসর পরে, বর্ষার উপদ্রব সহিয়া সহিয়া, সে ঘর—দেওয়াল, চাঁপার শোকে ভূতলশায়ী হইল—চাঁপার পূর্ব্ব পাপে গলিয়া, পৃথিবীর বক্ষে, মৃত্তিকার স্তূপাকারে—এক অতীত শোক-দুঃখের মর্ম্মস্পর্শী কাহিনীতে পরিণত হইয়া থাকিল।

চাঁপা কোথায় গেল? কেহ বলিল মরিয়াছে; কেহ বলিল—উন্মাদ স্বামীর অন্বেষণে গিয়াছে। দুই এক জন ঠিক্ কথা বলিল—কারণ তাহারা দেখিয়াছিল। তারা বলিল, আমরা দেখিয়াছি—চাঁপা টুকনি হাতে লইয়া, চক্ষের জলে, হরিনাম করিতে করিতে, ভিক্ষা করে। চাঁপার আর সে মূর্ত্তি নাই—চাঁপাকে দেখিলে এখন মনে ভক্তি হয়।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

একদিন আশ্বিন মাসে, (দুর্গাপূজার আনন্দ গ্রাম হইতে নরনারীর অশ্রু জলের ফোটা লইয়া বিদায় হইবার কয়েকদিন পরে) দুপুর বেলায়, পুকুরের পশ্চিম পাড়ে, অশ্বত্থ তলে, একটী দশ বৎসরের বালক ও আট বৎসরের বালিকা, ক্রীড়া করিতেছিল বালক বালিকা প্রাণে প্রাণে মিলিয়া. একমনে পৃথিবীকে আনন্দ ময় করিয়া খেলা করিতেছিল; হঠাৎ বালিকাটী পুষ্করিণী জলের দিকে তাকাইবামাত্র, একটি বড় প্রস্ফুটিত পদ্ম বায়ুভরে দুলিতেছে এবং একটি মক্ষিকা তাহার উপরে উড়িতেছে, দেখিয়া আনন্দে বিহ্বলা হইয়া বালকের দিকে চাহিয়া বলিল "আমায় একটা জিনিস দিবি ?"

বালক বলিল "আমাদের বাগানে আজ বিকালে বেড়াতে যাবি ?"

বা। "যা চাই, যদি আমায় দিস তো যাব।"

বালক, বালিকার টুক্‌টুকে ডান হাত খানি ধরিয়া বলিল, "তুই যা চাইবি তাই দেব।"

বালিকা কচিমুখে একটু কচি হাসি মুক্তাদন্তের ভিতর দিয়া প্রকাশিত করিয়া বলিল "যা চাইব তা দিতে পারবি ?"

বালক উৎসাহের সহিত বলিল "পার্‌বো না তো কি? তুই যা চাইবি তাই দেব।" এই কথা বলিয়া, বালিকার মাথার চুলে ধুলা লাগিয়াছে দেখিয়া, আপনার কাপড় দিয়া ঝাড়িয়া দিল। ঝাড়িয়া দিয়া বলিল "তুই কালীঘাটের কালীর দিব্য বল, যে বৈকালে খেলাতে যাবি।" বালিকা বালকের গলাটী দুহাতে ধরিয়া ঝুঁকিতে ঝুঁকিতে বলিল "কালীঘাটের কালীর দিব্য—মাইরি আমি যাব। তুমিও দিব্য কর যে, আমায়, যা চাইব তা দেবে।" বালক আনন্দের সহিত প্রতিজ্ঞা করিল "মাইরি দেব, মাইরি দেব।" তখন বালিকা মৃদু হাসিতে হাসিতে পুষ্করিণীর জলের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল "ঐ ডাগর পদ্ম ফুলটী যদি এনে দাও, তো, যা বলবে তাই কোরবো।"

বালক পুকুরের দিকে চাহিয়া দেখিল। দেখিয়া প্রথমে ভয় পাইল। পরে একটু সাহস জড় করিয়া বলিল "আচ্ছা দেব—তুই বস—আমি আনিগে।" বলিয়াই কাপড় মালকোঁচা করিয়া পুকুরের জলের দিকে সাহসে ধাবিত হইল। দৌড়িতে দেখিয়া বালিকার একটু ভয় হইয়াছিল বটে, কিন্তু পদ্ম ফুলের লোভ সামলাইতে না পারিয়া এইমাত্র বলিল "দেখ ভাই! যেন ডুবে যেওনা—ওখানে অনেক জল।" বালিকা আরও বলিল, "পার্‌বেতো? দেখ ভাই, দেখ যেন ডুবে যেওনা।" বালক বলিল "পারবো না তো কি—আমি সাঁতার শিখেছি তা, বুঝি জানিস না?" এই কথা বলিতে বলিতে বালক দ্রুতবেগে জলে গিয়া নামিল। একটু জলে দাঁড়াইয়া বালিকার দিকে চাহিয়া বলিল "ডুবন জলে ফু[illegible]টেছে—আমি

একটু একটু সাঁতার জানি—যদি ডুবে যেতে দেখিস, তো, মাকে দৌড়ে গিয়ে খবর দিস।” কথা বলিতে বলিতে, এক গলা জলে উপস্থিত হইল—তারপর জলে সাঁতার আরম্ভ করিল। বালিকা একদৃষ্টে চাহিয়া ভয় পাইতেছিল। বালক সামান্য সাঁতার জানিত, সুতরাং কিয়দ্দূর সাঁতরাইবার পর হাবুডুবু খাইতে লাগিল। বালকের নাকে মুখে জল প্রবেশ করিল—বালক হাঁপাইতে হাঁপাইতে ফুলের দিকে চলিল।” বালিকা দেখিয়া ভয়ে কাঁদিয়া উঠিল—কাঁপিতে কাঁপিতে হত-বুদ্ধি হইয়া “ফুল চাইনা ফেরো ফেরো” বলিতে বলিতে বালিকা জলে আসিয়া পড়িল। বালক প্রাণের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করিয়া পদ্ম ফুলের কাছে যাইবা মাত্র, পাদদেশে কি আঘাত লাগিল। একটু অনুভব করিয়াই বালক তাহার উপর ভর দিয়া উপবেশন করিল। বালক বিপদের সময় সেই অবলম্বন পাইয়া, আনন্দে চীৎকার করিয়া বলিল “ভয় নাইরে—ভয় নাই, আমি দুর্গা-প্রতিমার ঠাটে ব’সেছি।” এই কথা শুনিবামাত্র বালিকার ভয় দূরীভূত হইল। মুখে একটু হাসির রেখা যেন দেখা দিল। বালিকা বলিল “ঐখানে ব’স, আমি তোমার মাকে ডেকে আনি—ওখান থেকে নেমনা ডুবে যাবে।” এই সময়ে বালকটি আহ্লাদে পদ্ম ফুলটী ধরিয়া, ছিঁড়িল। হাতে ধরিয়া, বালিকার দিকে চাহিয়া, ফুলটীকে নাচাইতে নাচাইতে বলিল “ফুল ছুড়ে দি” বলিয়াই ফুল ছুড়িয়াদিল। ফুলটি কিনারার জলে পড়িয়া ভাসিতে লাগিল। বালিকা ফুল ধরিয়া, জলে দাঁড়াইয়া আবার ব্যাকুল ভাবে বলিল “ঐখানেই থাক, তোমার মাকে ডেকে আনি।” এমন সময়ে এক জন স্ত্রীলোক ঘড়া কাঁকে

সেইখানে জল লইতে আসিল, দেখিয়া বালক বলিল, আর মাকে ডাকতে হবে না—ঐ কাদি দিদি ঘড়া এনেছে; ঘড়া ধ'রে সাঁতার কেটে যাব আর ভয় নাই। কথা শুনিয়া ঘড়া দেখিয়া বালিকার সাহস ও আনন্দ হইল। স্ত্রীলোকটী বালককে ভর্ৎসনা করিতে করিতে ঘড়া ভাসাইয়া দিল। বালক সেই ঘড়ার সাহায্যে সে দিনের বিপদ হইতে উদ্ধার পাইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

যে স্ত্রীলোকটী ঘড়া ভাসাইয়া দিল, তিনি কাদম্বিনী। বয়স তখন আঠার। আপাদমস্তক যৌবন-তেজে পরিপূর্ণ অঙ্গখানি যৌবন-রসে যেন স্ফীত—তাহাতে পবিত্রতার মিশ্রণ থাকায়, দেখিলে মনে হইত, যেন নারী-যৌবন স্বর্গে লুটাইতে লুটাইতে কাদম্বিনীর শরীরে প্রবেশ করিয়াছে। সেই মূর্ত্তি পৃথিবীকে দেখিতমাত্র। পৃথিবীর কোথায় দুঃখ কিরূপে লীলা করিয়া বিধাতার মহিমা প্রচার করিতেছে—সুখ কিরূপে শ্মশানের আগুনে মিশিয়া মহাবৈরাগ্যের তত্ত্ব জ্ঞাপন করিতেছে, সেই মূর্ত্তি তাহা দেখিতে দেখিতে যে সুখ পাইত; মানুষের মনোবৃত্তির মর্ম্মস্পর্শী সুরেও আবার সেই আনন্দ পাইয়া কৃতার্থ হইত। এই জগতের মুক্তাচিত্র আপনার নয়নে রাখিয়া মনের সাহসে, আনন্দে, বিশ্বাসে, সমুদয় ব্যাপারে আপনাকে অটল রাখিত। রমণীর অঙ্গে যে স্বর্গফুল ফুটিয়াছিল, তাহার আঘ্রাণে

যেন সে দেহ পরিপূর্ণ হইয়াছিল। যেমন শ্রাবণের নৈশাকাশ, ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হইয়া, বিদ্যুতাঘাতে আহত হইয়াও বিচলিত না হইয়া আপনার গাম্ভীর্য্যকে বিগলিত করিয়া কেবল মাত্র বৃষ্টি-ধারায় পৃথিবীর মনোতৃপ্তি সম্পাদন করে; সেইরূপ কাদম্বিনী আপনার যৌবনভরে পরিপূর্ণ হইয়া, লাবণ্যের তোড়ে আচ্ছন্ন থাকিয়া, বাসনার প্রকোপকে দমিত রাখিয়া, আপনার যৌবন গাম্ভীর্য্যকে মৃদু পবিত্র হাসি রাসিতে বিগলিত করিয়া, পৃথিবীকে ফলরাশিতে যেন সুশোভিত করিত। মুখের সে হাসি, সুশীতলা স্থিরা সৌদামিনীর মত যুবতীর অধরে বাঁধা থাকিত, তাহাতে বিধাতার হাসী—স্বর্গের হাসি—ভক্ত দলের হাসি ঝরিতে দেখা যাইত। সেই হাসি অধরে ফুটিত—চোখের জ্যোতিতে খেলিত—অঙ্গ ফুটিয়া যেন বাহির হইত। সে চাহনী সরলা বালিকার মত উদার। চাঁদ যেমন সকলের দিকে চায়—ফুল যেমন সকলের জন্য ফুটে, সে চাহনী তেমনি সকলের জন্য যেন পৃথি-বীতে উষালোক বিস্তার করিত।

যুবতী যখন গাত্র ধৌত করিয়া, ঘড়া কাঁকে লইয়া, পথের বক্ষে, আপন পদতলের চিত্র আঁকিতে আঁকিতে অন্য মনে যাইতেছিল, তখন সেই বালক বালিকাদ্বয় তাহার পশ্চাতে আসিয়া ডাকিল। যুবতী প্রথমে শুনিতে পাইল না, পরে যখন বালক উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "ঠানদিদি! তোমাদের বাড়ী যাব, দাঁড়াও।" বালকের কথা শুনিয়া, ঠানদিদি পিছু ফিরিয়া দেখিয়া বলিল' "রাখাল! জলে আর অমন ক'রে যেওনা, মারা, যাবে; ভাগ্যে আমি গেছলাম, নইলে কি হত!" বালক কোন উত্তর না দিয়া পশ্চাতে পশ্চাতে চলিল। কিয়দ্দূর গিয়াই ঠানদিদির

বাড়ীতে ঠান্‌দিদির সহিত প্রবেশ করিল। রান্নাঘরে জলের ঘড়া রাখিয়া আসিয়া বড় ঘরের দাওয়ায় ঠান্‌দিদি একখানা পীড়ার উপরে বসিল। বালকবালিকাদ্বয়কে একখানা গুণথ'লে বসিতে দিল, "হাঁ৷ রাখাল! প্রমীলার সঙ্গে কি বিয়ে হ'য়েছে নাকি?" রাখাল কিছু উত্তর দিল না। প্রমীলা বলিল, হাঁ। বিয়ে হ'য়েছে কি হবে?" ঠান্‌দিদি কাদম্বিনী বলিল, তা বেশ! সুখের কথা, তবে আমি শাঁক বাজাই," রাখাল একটু লজ্জায় মুখ হেট করিয়া থাকিল; প্রমীলা হাসিতে হাসিতে বলিল "তা বাজাওনা— তাতে আর ভয়টা কি? জানালার কাছে একটা শাঁক ছিল, কাদম্বিনী উলুধ্বনি দিয়া শাঁক বাজাইয়া হাসিয়া উঠিল। রাখাল তখন লজ্জায় কাঁদিয়া ফেলিল। সে পলাইবার উদ্যোগ করিতেছিল, প্রমীলা আপনার আচল দিয়া রাখালের চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিল; "তুই কাঁদিস কেন ভাই, ঠান্‌দিদি ঠাট্টা ক'চ্ছেরে ঠাট্টা ক'চ্ছে, আর যদিই বে হয় তাতে আর ভয়টা কি।" কাদম্বিনীর হাসির রোল বাড়িয়া উঠিল—প্রমীলার হাতে রাখালের হাত রাখিয়া বলিল, "তোদের আজ বে হ'ল, তোরা আজ হ'তে মাগ ভাতার।" রাখাল আরও কাঁদিতে লাগিল। রাখালের কান্না দেখিয়া, প্রমীলা কাঁদিয়া বলিল, "না ভাই এমন জান্‌লে আস্‌তাম না, এমন ক'রে কি কাঁদতে হয়।" এইরূপ কথোপকথন হইতেছে এমন সময়ে প্রমীলার মা সেখানে আসিয়াই প্রমীলাকে আক্রমন করিল, চুলের ঝুটি ধরিয়া প্রহার করিতে যাইতেছিল; কাদম্বিনীর নিষেধ বাক্য শুনিয়া আর মারিল না—গালি দিল:— "মুখপুড়ি! ভাত খেয়ে অবধি চুলের টিকি দেখ্‌তে পাওয়া যায় না! চল্‌ বাড়িতে চল;" বলিয়া প্রমীলার হাত ধরিয়া হড় হড়

করিয়া ঘরে টানিয়া লইয়া গেল। সকলে চলিয়া যাইলে কাদম্বিনী ভাবিল, "ভগবান্ এদের দ্বারাই আমার জীবনকে ফুটাবেন দেখছি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

রাখাল আপনার ঘরে গেল। মার সহিত সাক্ষাৎ হইবামাত্র তিরস্কার খাইল। মনটী বাড়ীতে থাকিতে চায় না। রাখাল পূজার কাপড় পরিল, জুতা পরিল, জামা গায়ে দিল। মাকে অন্যমনস্কা দেখিয়া বাড়ী হইতে সরিয়া পড়িল। প্রথমে টিপি টিপি নীরব চলনে বাড়ীর চৌকাট অতিক্রম করিয়া পথে নামিল, তার পর একটু দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল, কিয়ৎক্ষণ পরেই প্রবল বেগে দৌড়িয়া প্রমীলাদের বাড়ীতে প্রবেশ করিল। প্রমীলা তখন বাড়ীর রোয়াকে বসিয়া মার কাছে চুল বাঁধিতেছিল। প্রমীলাকে দেখিবামাত্র রাখালের প্রাণ সবল হইল, প্রমীলার প্রাণটীও জীবিত হইল। প্রমীলা ভাবিতেছে, মাথা বাঁধাটা হ'লেই দুইজনে খেলা করবো। প্রমীলার মাথা বাঁধা হইল; প্রমীলার মা রান্নাঘরে গেল। প্রমীলা রাখালের সঙ্গে কথা কহিতে লাগিল। প্রমীলা বলিল, "সেই শিয়ালের গল্পটা বলনা ভাই।" রাখাল আরম্ভ করিল। প্রমীলা প্রাণ মিশাইয়া হাঁ করিয়া গল্প গিলিতে লাগিল। গল্প বলিতে বলিতে সন্ধ্যা হইল, প্রমীলার ঠাকুর মা হরিনামের মালা লইয়া কাছে বসিল। এমন সময়ে রাখালের দিদি

আসিয়া রাখালকে ডাক দিল। রাখাল অনিচ্ছায় মার ভয়ে দিদির সঙ্গে চলিয়া গেল। রাখাল চলিয়া গেলে, প্রমীলার মা প্রমীলার কাছে ভাত আনিয়া দিল, প্রমীলা ভাত খাইতে লাগিল, মনটী কিন্তু রাখালের জন্ত ব্যস্ত। প্রমীলার ঠাকুর মা প্রমীলার মাকে বলিল, "প্রমীলার বে দিলেই হয়—রামনগরের পাত্রটী ভাল, বিষয়ও আছে, তা বয়স একটু যেয়াদা—তাতে কি? প্রমীলা ভাত খাইতে খাইতে বলিল, বের কথা কইলে, ভাত খাবনা বল্‌ছি, সব ভাত দূর ক'রে ফেলে দেব। প্রমীলার ঠাকুর মা বলিল, "আচ্ছা আচ্ছা তুমি ধুমড়ি হ.য়ে থেক, বে কর্ত্তে হবে না।" বিবাহের কথা বন্ধ হইল। আহারাদির পর দ্বিতলের ঘরে গিয়া প্রমীলা মার কাছে শয়ন করিল। প্রমীলা নিদ্রিতা হইলে প্রমীলার মা বলিল, "প্রমীলার আমার রাখালের সঙ্গে যদি বে হয় তো বড় ভাল হয়।" প্রমীলার ঠাকুর মা বলিল, মুখে আগুণ, কপালে আগুণ, ওর বয়স অল্প—বিষয় নাই, ওর মা যে রায়বাঘিনী, তাহ'লে তোমার মেয়ের দফা রফা হবে।" প্রমীলার মা বলিল, "তা বটে, কিন্তু দুজনে যে রকম ভাব, তাতে যেন মনের মিলটা খুব হবে।" এইরূপ কথোপকথন হইতে হইতে সকলেই নিদ্রাভিভূতা হইল। প্রমীলা তখন স্বপ্নে সেই পুকুরের পাড়ে গিয়া রাখালের কাছে বসিয়া গল্প শুনিতে লাগিল। কখনবা রাখালের গলায় শালুক ফুলের মালা পরাইতে লাগিল, কখনবা বকুল ফুলের মালা গাঁথিতে গাঁথিতে নানা বাল্য কথায় আনন্দে মাতিতে লাগিল। স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে হঠাৎ কাঁদিয়া চীৎকার করিল। প্রমীলার চীৎকারে প্রমীলার মা জাগ্রত হইয়া জিজ্ঞাসিল, "ওকি? প্রমীলা রাখালের জলে ডুবিবার স্বপ্নের কথা বলিল। প্রমীলার আর

নিদ্রা হইল না। জননী ও পিতামহীকে নিদ্রিতা দেখিয়া জানালার কাছে বসিয়া আকাশের তারা দেখিতে লাগিল; তারা গুণিতে লাগিল—এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট, নয়, দশ, বার, চৌদ্দ—আর গণিতে জানে না। তারা গণিতে গণিতে কতক্ষণে প্রভাত হয় ভাবিতে থাকিল—কাল কখন আবার রাখালের সঙ্গে খেলিবে মনে মনে ভাবিতে লাগিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—:[০]:—

মধুসূদন গঙ্গোপাধ্যায় মহেশপুরের জমিদার। বাটীতে স্ত্রী, জননী ও একটী মেয়ে প্রমীলা। প্রমীলার সুপাত্রে বিবাহ দিবে বিবাহের সময় খুব ধুম ধাম করিবে—এই আশায় মধুসূদন গঙ্গোপাধ্যায় বিবাহের আগেই নানাবিধ অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়া রাখিতেছেন। প্রমীলাকে বাঙ্গলা শিখাইতেছেন। প্রমীলা আট বৎসরে চাণক্য শ্লোক মুখস্থ করিয়াছিল বটে কিন্তু রাখালের নেশার জন্য মন সর্ব্বদা চঞ্চল থাকিত। প্রমীলা—সুন্দরী—বুদ্ধিমতী। কিন্তু একটু ইচড়ে পাকা বলিয়া লোকে মনে করিত। কথায় কেহ পারিত না। রাখালকে দেখিলে কাহারও কাছে থাকিত না—রাখালের সঙ্গে খেলিবার জন্য ব্যাকুল হইত। বাল্যকালে কবিতা ভাল বাসিত—কথায় কথায় ছড়া বলিত—গান গাহিত। অনেক ছড়া ঠাকুর মা ও মার কাছে শিখিয়াছিল—অনেক গান যাত্রা কবি শুনিয়া মুখস্থ রাখিয়াছিল।

একদিন চৈত্র মাসের বৈকালে, মধুসূদনের খিড়কী পুষ্করিণী সংলগ্ন উদ্যানে, প্রমীলা, রাখাল, সারদা, রামচরণ ও হেমন্ত-কুমারি খেলা ঘর করিয়া খেলিতে লাগিল।

সেদিনকার খেলার বিষয়ঃ—রাখাল, প্রমীলা, সারদা ও রামচরণের বিবাহ। হেমন্তকুমারী গৃহিণী—কন্যাকর্ত্তা-কন্যাকর্ত্রী বরকর্ত্তা-বরকর্ত্রী। প্রথমে হেমন্ত বলিল—আজ সব বউ বউ খেলা হউক। তখন সকলেই তাহাতে আনন্দের সহিত সায় দিল সারদা হেমন্তকে বলিল হেমন্তদিদি! আমি রাখালের ক'নে হব। আর প্রমীলা রামের ক'নে হ'ক।

প্রমীলা বলিল "তা হবে না। আমি রাখালের যেমন বরাবর ক'নে হই—তেমনি আজও [illegible] বরাবর হব—আমি রাখালকে আর কারো বর হতে দেবো না।" হেমন্তকুমারী বলিল—"ওকি ভাই! তুইতো, রোজ রাখালের ক'নে হ'স, আজ না হয় রামের ক'নে হ'না। এতো আর সত্তিকার নয় ভাই।" প্রমীলা রাগিয়া বলিল "আমি তা'হলে খেলবো না।"

রাখাল বলিল, "আমি প্রমীলার বর হব, নাহলে খেলবো না"

তখন সারদা প্রতিজ্ঞা করিল, আমি রামের ক'নে হব না, ও আমায় কাল বড় কিল মেরেছিল। সারদার এই কথা শুনি-বামাত্র, প্রমীলা রাগিয়া সারদাকে এক চড় মারিল। হেমন্ত অমনি প্রমীলাকে এমন কিল দিল যে প্রমীলা কাঁদিয়া উঠিল। অমনি রাখাল একটী কঞ্চিভাঙ্গা লইয়া হেমন্তের পাছায় ছপা-ছপ্ আঘাত করিয়া, "প্রমীলা তুই ছুটে আয়," বলিয়া পলায়ন করিল। সে দিন খেলা হইল না; গোলমালে ভাঙ্গিয়া গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

দেখিতে দেখিতে প্রমীলার বয়স বার বৎসর হইল। দেহে একটা মাধুরি ফুটিল। মুখে, চোখে, হাত—পার আঙ্গুলে—নখে একটা দীপ্তি ফুটিল। গোলাপের কুঁড়ি সবুজ বৃন্তাবরণ ভেদ করিয়া যেন একটু একটু বাহির হইতে থাকিল। প্রমীলা তখন নারীযৌবনের কুঁড়ি।

রাখালের বয়স তখন ষোল বৎসর। বাড়ন্ত গড়ন—তাই তখন গোঁপের রেখা দেখা দিয়াছে; দাড়ির অঙ্কুর বাহির হইয়াছে; ভ্রুযুগলে যৌবনের উদ্দিপনী শক্তি কিয়ৎ প্রকাশিত হইতেছে; শরীর মোলায়েম-লাবণ্য পরিপূর্ণ। মুখ, চোখ সব যৌবনোপযোগী হইয়া উঠিতেছে। রাখাল তখন পুরুষযৌবনের কুড়ি

প্রমীলা রাখালের সঙ্গে খেলিত—তাস খেলিত—অষ্টাকোষ্টে খেলিত—দশপঁচিশ খেলিত—বাঘবন্দি খেলিত। রাখাল গল্প বলিত' প্রমীলা শুনিত। রাখাল প্রমীলাকে কত কি দিত। শালুক, পদ্ম, গোলাপ, মল্লিকা, বকুল প্রভৃতি কত ফুল আনিয়া দিত। আম, জাম, লিচু প্রভৃতি কত ফল আনিয়া দিত। বিলাতী কাপড় হইতে ভাল ভাল পট আনিয়া দিত—প্রমীলা তাহাতে আপনার বাক্স সাজাইত। ঠাকুর বিসর্জ্জনের সময় রাখাল ছড়া ছড়ির ভিতর হইতে ডাকের গহনা আনিয়া দিত—প্রমীলা তাহাতে পুতুলের গহনা করিত। সর্ব্বদাই একত্রে থাকিত—একত্রে স্নান করিত-একত্রে কখন কখন আহারও করিত। বাল্য হইতে একবৃন্তে দুটী ফুলের মত ফুটিতেছিল।

এক দিন বৈকালে প্রমীলা আপনাদের বাটীর জানালায়

বসিয়া আছে। জানালার সম্মুখে বাঁস বনে বাঁসের পাতা বাতাসে কাঁপিতেছে—বাঁসে বাঁসে কড় কড় শব্দ হইতেছে—বাঁসের মাথায় কাক সকল কোলাহল করিতেছে ঘু ঘু ডাকিতেছে, আর ভূতলে বাঁসের কঞ্চির, পাতার ছায়া সকল রৌদ্রের উপর ঈষৎ সঞ্চালিত হইতেছে;—এমন সময়ে প্রমীলা কি ভাবিতে ভাবিতে সেই সব দেখিতেছে, দেখিতেছে ও ভাবিতেছে। প্রমীলা বায়ু সঞ্চালিত বাঁস বনের দিকে তদুপরিস্থ নীলাকাশের দিকে সম্মুখস্থ খিড়কী পুষ্করিণীর তরঙ্গপূর্ণ কাল জলের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিতেছে। প্রমীলার মুখ লাল—ঠোঁট লাল গণ্ডস্থল কচি পাতার কচি রঙে লজ্জামাখান আর সেই সৌন্দর্য্যের উপর গ্রীষ্মজনিত স্বেদ-বিন্দু সকল শত শত মুক্তার ন্যায় শোভা পাইতেছে। প্রমীলা তদবস্থায় প্রকৃতির শোভার দিকে চাহিতে চাহিতে কি ভাবিতে ছিল। বোধ হয় প্রমীলা রাখালের সুন্দর মূর্ত্তি—সেই সুন্দর মুখনির্গত অমৃত কথা—মধুমাখা গল্প, আর গল্প—বলিবার সময়ে সেই সুন্দর মুখের সুন্দর ভঙ্গিমা প্রভৃতি ভাবিতে ভাবিতে একটা যেন আরামে ডুবিয়া রহিয়াছিল। এইরূপে ছোট, বড়, মাঝারি, লম্বা, চওড়া কত প্রকারে রাখালের কত কথা ভাবিতেছিল। ভাবিতে ভাবিতে কখন আনন্দিত কখন বিমর্ষ হইতেছিল। রাখালের একবার বড় বিকার হইয়াছিল—রাখালের মা তখন কাঁদিতেছিল—প্রমীলা রাখালের মাকে কাঁদিতে দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল। একি! ভাবিতে ভাবিতে প্রমীলার একটা দীর্ঘশ্বাস বহিল—প্রমীলার চক্ষে জল আসিল! প্রমীলা চোখ রগড়াইয়া মুখ চোখ আরও লাল করিয়া আরও ভাবিতে লাগিল। ভাবিতে লাগিলঃ—বাবা আমার বের সম্বন্ধ করে,

ছেন!"—ভাবনাটা প্রমীলার বুকের ভিতরে সাপের মত দংশন করিল—বুক ঢিপ ঢিপ করিল! বিবাহ? বিবাহের সম্বন্ধ?—কি ভীষণ বিপদ! সে কথাটা—সে ভাবনাটা প্রমীলার রক্তকে যেন জল করিতে থাকিল। প্রমীলা কাঁদিয়া ফেলিল; কাঁদিতে কাঁদিতে ভাবিল, রাখালের সঙ্গে কি আমার বিয়ে হয় না? এক গ্রামে কি বিয়ে হয় না? জানাশুনার মধ্যে কি বিয়ে হয় না? ওদের শশীর তো তারকের সঙ্গে এক গ্রামে বিবাহ হইয়াছে—আমার তবে হবেনা কেন? বাবা অন্য বর দেখিতেছেন কেন? রাখালের চেয়ে ভাল বর কি আর আছে? এরূপ ভাবিতেছে আর মাঝে মাঝে পিছনে দেখিতেছে কেহ তার ভাব শুনিতেছে কিনা? ভাবিতে ভাবিতে প্রমীলার মুখ শুকাইতে লাগিল—বুক কাঁপিতে থাকিল—প্রমীলার দুচক্ষু দিয়া অশ্রুবিন্দু ঝরিল। প্রমীলা চোখের জল আঁচলে মুছিয়া রক্তিম মুখে সে স্থান হইতে উঠিল।

প্রমীলা রাখালের জন্য কখন না ভাবিত? ভাবিত বটে—সে ভাবনায় আনন্দ লাভ করিত। আজ যাহা ভাবিল তাহা সম্পূর্ণ নূতন। এ ভাবনা বালিকার কচি হাড় গুলাকে যেন ভাঙ্গিবার মত করিল। প্রমীলা প্রাণে দারুণ ব্যথা অনুভব করিতে করিতে অন্যঘরে গেল। অন্যঘরে গিয়া একখানা কাগজ লইল—একখানা কাঁচি লইল। কাঁচি দিয়া কাগজে পদ্ম কাটিল—পাতা কাটিল—কচ্ কচ্ করিয়া কতকি কাটিল—কাটিতে কাটিতে অজ্ঞাতে আপনার আঙ্গুল কাটিয়া ফেলিল রক্ত পড়িল! রক্ত পড়া আঙুলটা চুসিতে চুসিতে কাগজ কাঁচি তুলিয়া রাখিল। তার পর দোয়াত কলম লইল। একখানা লিখিবার খাতা পাড়িয়া

লিখিল "রাখাল—রাখাল—রাখাল"। তাড়া বাঁকা হরপে কতবার লিখিল "রাখাল"। তার পর "প্রমীলা—রাখাল"—"রাখাল—প্রমীলা"। লেখে আর তাহার উপর হিজিবিজি কাটে—আর দেখে কেহ ঘরে আসিতেছে কিনা। লিখিতে লিখিতে আর ভাল লাগিল না। রাখালকে দেখিবার জন্য প্রাণ অস্থির হইল। ভাবিল. রাখাল এতক্ষণ স্কুলহইতে আসিয়াছে; আমি যাই। যাইতে দোষ কি? মা বড় বকে—কেন বকে? আগে তো বকিত না—এখন কেন বকে? সেই রাখাল সেই আমি—তবে মা বকে কেন? মা বলে, তোর বের বয়স হয়েছে, এখন আর পুরুষের সঙ্গে মিশিসনি। রাখাল যদি আমার ঘরের লোক হইত তো মিশিতাম নাকি? তা, মা বকে বকুক; আমি একবার চুপে চুপে যাই। রাখালকে অনেক দিন দেখি নাই—আজ একবার দেখে আসি। ভাবিয়া প্রমীলা ধীরে ধীরে রাখালদের বাটী যাত্রা করিল।

তখন বেলা অবসন্ন হইয়াছে—সন্ধ্যা আগতপ্রায়। গ্রীষ্ম-কাল। রাখাল আপনাদের বাটীর ছাদে বসিয়া, ইউক্লিডের জ্যামিতি লইয়া শ্লেটে অনুশীলনী কসিতেছে। কসিতে কসিতে, ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া, গুণ গুণ স্বরে গান গাহিতেছে—সে গানের কোন ভাব নাই—যা মনে আসিতেছে—তাই স্বরে ফেলিয়া গুণ গুণ স্বরে গাহিতেছে।

প্রমীলা রাখালদের বাটীতে গিয়া হাঁপ ছাড়িল—জলের মাছ জলে আসিল—যেন হাতে স্বর্গ পাইল। কাহারও সহিত দেখা না করিয়া, রাখালের পড়িবার ঘরে গিয়া উঁকি মারিল—দেখিতে পাইল না। আপনি ছাদের সিঁড়িতে

উঠিতে লাগিল—হৃদয়ের আবেগে সিঁড়ি অতিক্রম করিল—ছাদে পঁহুছিল। দেখিল, রাখাল অঙ্ক কসিতেছে। ছাদে গিয়া নীরবে পা টিপিতে টিপিতে, পিছন দিক হইতে, টুক্‌টুকে হাত দুখানি দিয়া, রাখালের চোখ চাপিয়া ধরিল। রাখাল কিছু বলিল না—একটু চুপ করিয়া থাকিল মাত্র। প্রমীলা হঠাৎ রাখালের চক্ষে অশ্রুজল অনুভব করিয়াই চক্ষু ছাড়িয়া দিল। রাখাল অশ্রুপূর্ণ আরক্ত লোচনে প্রমীলার দিকে চাহিয়া মুখ অবনত করিল। প্রমীলাকে বসিতে বলিল। প্রমীলা রাখালের চক্ষের জল দেখিয়া বড়ই বিষণ্ণ হইল। রাখাল প্রমীলার মুখখানি দুহাতে ধরিয়া আপনার ক্রোড়ের দিকে আকর্ষণ করিল—প্রমীলা রাখালের মুখের দিকে সজলনেত্রে চাহিয়া জিজ্ঞাসিল "রাখাল কাঁদ্‌লে কেন?"

রাখাল বলিল, "তুই কাঁদ্‌লি কেন?"

প্র। তোমার কান্না দেখে।

রা। আমি কেন কাঁদলাম তা ব'ল্‌বো?

প্র। বল না?

রা। তোর বিয়ে হবে—তুই আর আমার কাছে আস্‌বি না, তাই আমি যখন ভাবি, তখনি প্রাণের কষ্টে কেঁদে ফেলি।" বলিয়াই রাখাল মুখ অবনত করিল—রাখালের চক্ষু দিয়া টস্‌টস্‌ করিয়া জল পড়িল। রাখাল যখন বিবাহের কথা বলিল, তখন শুনিতে শুনিতে প্রমীলার বুক ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল। বিবাহ না যম! নরক! শ্মশান! শুনিতে শুনিতে প্রমীলার মুখ দুঃখে ভরিয়া উঠিল। রাখালকে কাঁদিতে দেখিয়া কাতর প্রাণে কাতর চাহনীতে রাখালের দিকে কিয়ৎক্ষণ যেন পাষাণ দৃষ্টিতে চাহিয়া

থাকিল—সে চাহনী হৃদয়ের অকৃত্রিম প্রেমের নীরব অভিব্যক্তি।

রাখাল মুখ তুলিয়া বালিকার সেই প্রেমমূর্ত্তি দর্শন করিল—সে চাহনী দেখিয়া রাখালের প্রাণ ভাঙ্গিয়া গেল। রাখাল ব্যাকুল প্রাণে প্রমীলার কাছে সরিয়া গেল—দক্ষিণ হাতখানি প্রমীলার গলায় রাখিল। প্রমীলা রাখালের করস্পর্শে এলাইয়া পড়িল—হৃদয়ের আবেগে রাখালের বুকের উপরে ঝুঁকিয়া পড়িল। রাখাল স্নেহে ব্যাকুল হইয়া প্রমীলার মুখে একটা চুম্ খাইল—সরল প্রাণে সরল স্নেহে প্রকৃতির বলে অভিভূত হইয়া রাখাল প্রমীলার মুখ-চুম্বন করিল; আর প্রমীলা সেই মুখচুম্বনের ভিতর দিয়া আপনাকে গলাইয়া রাখালে হারাইতে থাকিল। রাখাল চুম্বন করিয়া—প্রমীলার মুখে মুখ রাখিয়া ধীরে ধীরে বলিল "প্রমীলা; তোমার কবে বিবাহ হবে?" প্রমীলা কোন উত্তর করিল না—কেবল মনের যাতনায় রাখালের গণ্ডোপরি উত্তপ্ত অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিল মাত্র—সেই অশ্রুজলে প্রমীলা বড় গভীর রহস্যপূর্ণ উত্তর প্রদান করিল। রাখাল মুখ হইতে মুখ তুলিয়া প্রমীলার চোখের জল মুছাইতে মুছাইতে আবার জিজ্ঞাসা করিল, কাঁদ কেন? তোমার কোথায় বিবাহ হবে?

প্রমীলা তখন রাখালের আলিঙ্গন হইতে উঠিয়া বসিল; কাপড়ে চোখ মুছিল। তার পর মুখ হেঁট করিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "তা কি জানি।" কথাটার সঙ্গে প্রমীলার চোখের জল ঝরিল।

কি মর্ম্মস্পর্শী দৃশ্য!

এমন সময়ে রাখালদের বাটির প্রাঙ্গণে প্রমীলার ঠাকুরমা, "ও পেমি" বলিয়া ডাকিল। যেন দুজনের মাথায় বজ্র পড়িল।

প্রমীলা আর থাকিতে পারিল না। অনিচ্ছায় বহু মনোক্লেশে সেই সুগন্ধময় পুষ্পপরিপূর্ণ রাখালের সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। প্রমীলা যাইবার সময় "আবার কাল এমনি সময়ে আসিব" বলিয়া ছাদের নিচে গেল। রাখাল নিরানন্দে বসিয়া থাকিল। সে দিন আর জ্যামিতি কসা হইল না। রাখাল ছাদে বসিয়া কি ভাবিতে লাগিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

রাখাল স্কুলে পড়িত। সতের বৎসর বয়সে এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া এল, এ পড়িতেছিল। মহেশপুর হইতে হুগলিকলেজে পড়িত। এণ্ট্রান্সে বৃত্তি পাইয়াছিল। খুব বুদ্ধিমান্ ছাত্র ছিল।

প্রমীলার প্রেমাস্বাদনে যত মাতিতে লাগিল, ততই লেখা পড়ায় অমনোযোগ বাড়িতে লাগিল। পড়িবার সময়ে, মনে কখন না বলিয়া প্রমীলার রূপ ফুটিত—কল্পনায় প্রমীলা আসিয়া ছুটাছুটী করিত। রাখাল বই খুলিয়া পত্রে পত্রে প্রমীলার রূপ-জ্যোতি অবলোকন করিত। রাখালের পড়া শুনা আর হয় না। পুস্তক বন্ধ করিয়া দুচক্ষু মুদিয়া বালিসে মাথা রাখিয়া প্রমীলা-মূর্ত্তি ধ্যান করিত। সেই বাগানে বউ বউ খেলার কথায়, হৃদয়ে মহা ঝড় উঠিত—কল্পনা-রাজ্যে সেই ঝড়ে প্রমীলার হাসি—চাহুনি—কথা উড়িয়া আসিত; রাখাল নীরবে গোপনে তাহা সম্ভোগ করিত,—যেন অনন্ত কাব্য-সাগরে অনন্ত সুখ-স্পর্শ করিত।

প্রমীলা বাটীতে রাখালের পড়া বন্ধ করিল—ক্রমশঃ খাওয়া কমাইতে লাগিল—নিদ্রায় ব্যাঘাত দিতে থাকিল। রাখাল ভাত খাইতে খাইতে প্রমীলাকে ভাবে—স্নান করিতে গিয়া প্রমীলার চিন্তায় ডুবিয়া যায়। ক্রমশঃ প্রমীলা-চিন্তা এত বাড়িল যে রাখালকে কলেজ ছাড়িতে হইল। বাস্তবিক রাখাল কলেজ ছাড়িল।

রাখালের পিতা দেখিয়া শুনিয়া ভাবিত হইল—অমন বুদ্ধিমান্ ছেলে পাগলের মত হইতেছে কেন? অবশেষে রাখালের পিতা আপন কার্য্যস্থল পাটনায় রাখালকে লইয়া যাওয়া স্থির করিল।

রাখাল পিতার প্রস্তাবে স্বীকার পাইল। পিতা দিন স্থির করিয়া দিয়া পাটনায় চলিয়া গেল।

একদিন নিশীথ সময়ে—আকাশে কেবল তারাগুলি জ্বলিতেছে—চাঁদ পশ্চিমে চলিয়া পড়িয়াছে—ফুর ফুর করিয়া বসন্ত বাতাস বহিতেছে। রাখাল বিছানা হইতে উঠিল। বাটীর বাহিরে গেল। প্রমীলাদের বাটীর খিড়কীর যে বাগানে বউ বউ খেলিত, সেই বাগানে উপস্থিত হইল। একটী আম গাছের তলায় বসিয়া, প্রমীলা যে ঘরে থাকে, সেই ঘরের দিকে তাকাইয়া কত কি ভাবিতে লাগিল। প্রমীলা যে বাতায়নে বসিয়া থাকে, সেই বাতায়ন খোলা ছিল। রাখাল বাতায়ন ভেদ করিয়া দৃষ্টি বলে ঘরের অন্ধকার অবলোকন করিতেছিল। সেই অন্ধকারের ভিতরে তার হৃদয়ালোক স্বরূপা প্রমীলা কি প্রকারে ঘুমাইতেছে, তাহাই কল্পনাচক্ষে দেখিতে দেখিতে অশ্রুমোচন করিতে লাগিল।

রাখাল কাঁদিতে কাঁদিতে ভাবিতেছিল—প্রমীলা কি বাতায়ন পথে আসিয়া বসিবে না? দাঁড়াইবে না? সে কি নিশ্চিন্ত প্রাণে আছে? বোধ হয়—না।

রাখাল প্রমীলার তৃষ্ণায় অধীর হইল। কাতর ভাবে, আপন দৃষ্টিকে যেন শৃঙ্খলময়ী করিয়া তাহাতে প্রাণ পাখীকে বাঁধিয়া সেই বাতায়ন পথে ছাড়িয়া দিল;—সেই গৃহের অন্ধকারে আপনার প্রেম-বিগলিত অস্তিত্ব ঢালিয়া দিয়া, কল্পনা তরঙ্গাঘাতে প্রমীলা-পুষ্পকে যেন স্পর্শ করিতে লাগিল। একবার বোধ হইল যেন প্রমীলা উঠিয়া বসিয়াছে—জানালার কাছে বসিবার উদ্যোগ করিতেছে, কিন্তু কই এখনও আসিতেছে না কেন? রাখাল আবার ভাবিল, প্রমীলা নিশ্চয় জানালায় বসিবে—যদি আমার ভালবাসা প্রকৃত হয় নিশ্চয় জানালায় আসিবে। আবার ভাবিতেছে, প্রমীলা যদি আজ না আসে—আমি কতক্ষণ বসিয়া থাকিব। এইরূপে কত ভাবনায় ভাসমান হইয়া ক্ষণে ক্ষণে রাখাল প্রমীলার নিদ্রিত দেহকে আলিঙ্গন করিতে লাগিল।

রাখাল এইরূপে কত কি ভাবিতেছে, হঠাৎ জানালার কপাটে একটু শব্দ হইল—রাখালের প্রাণ আনন্দে চমকিয়া উঠিল—একদৃষ্টে সেই দিকে প্রমীলাকে দেখিবার জন্য চাহিয়া থাকিল। দেখিল অন্ধকারে একটী পদ্ম ফুটিল। রাখাল আহ্লাদে স্বর্গ প্রাপ্ত হইল—সেই অন্ধকার-সমাচ্ছন্ন রমণী-মুখখানিকে দেখিয়া রাখাল বৃক্ষতল হইতে সরিয়া, একটু মৃদুস্বরে প্রমীলাকে ডাকিয়া, কোটার দেয়ালের কাছে সরিয়া আসিল। প্রমীলা বাগানের দিকে চাহিয়া দেখিল রাখালের মত কে? ভাল চিনিতে পারিল না কিন্তু আঁচে বুঝিল।

প্রমীলা বাতায়ন-পথে মুখ বাড়াইয়া নিম্ন দৃষ্টিতে দেখিয়া, কোটার গা হইতে একটী অশ্বত্থ-পল্লব ছিঁড়িয়া রাখালের মাথার উপরে ফেলিয়া দিল। সেই অস্ফুট জ্যোৎস্না মিশ্রিত তরল আঁধারে প্রণয়ের হৃদয়োচ্ছ্বাস—প্রণয়ের সঙ্কেত—প্রণয়ের গন্ধ, প্রকৃত স্বর্গ প্রকাশ করিয়াছিল।

প্রমীলা রাখালকে তত রাত্রে বাগানে তারই জন্য আসিতে দেখিয়া আনন্দে ফুটিয়া উঠিল। আস্তে আস্তে ঘরের দ্বার খুলিয়া নিম্নে আসিল। খিড়কির দ্বার খুলিয়া বাগানে প্রবেশ করিল।

এই সময়ে প্রমীলার বয়স চৌদ্দ বৎসর হইয়াছিল। কুলীন কন্যা। তখনও বিবাহ হয় নাই। রাখালের বয়স তখন ১৮ কি ১৯ বৎসর। সেই নিশীথনিভৃতে যুবক-যুবতী কল্পনাতীত সৌন্দর্য্যমধুরাস্বাদনে উন্মাদ হইবার জন্য প্রকৃতির যৌবন-দ্বার খুলিল।

রাখাল প্রমীলাকে বাগানে প্রবেশ করিতে দেখিল—অন্ধকার ভেদ করিয়া সেই স্বর্গজ্যোতি রাখালের দিকে অগ্রসর হইল। রাখাল ধীরে ধীরে প্রমীলাকে দুই হাতে আলিঙ্গনে বাঁধিল। আলিঙ্গনে ধরিয়া সেই আম্র বৃক্ষতলে গমন করিল। যে বৃক্ষতলে এক সময়ে বউ বউ খেলিত' সেই সুখস্থানে নায়ক নায়িকা উপস্থিত হইল।

প্রমীলা বলিল. "বাড়ির কাছে, এ গাছতলায় থাকা ভাল নয়—চল ঐ পুকুরের পাড়ে, বকুল তলায় যাই; উহার কাছে জ্যোৎস্নালোক আছে।

রা। প্রমীলা! তোমার ভয় করছে নাকি?

প্র। না—আজ আর আমার ভয় নাই।

প্রণয়াবেশে বালিকারও সাহসের সঞ্চার হইয়াছে। কথা কহিতে কহিতে দুই জনে বকুলতলে উপস্থিত হইলে, রাখাল বলিল "তোমার মা যদি জান্‌তে পারে?"

প্র। পারুক—আর চাপিয়া রাখিতে পারিনা।

রা। কি চাপিয়া রাখিতে পারনা?

প্র। আমার মন—তোমার জন্য আমার প্রাণের ছটফটানি!

সে কথা শুনিয়া রাখাল আত্ম-বিস্মৃত হইল, প্রমীলাকে আলিঙ্গনে চাপিয়া, নীরবে কি সম্ভোগ করিতে লাগিল। কিয়ৎ-ক্ষণ পরে, ধীরে ধীরে বলিল "তোমার মা বাপ জানতে পারলে তোমায় কেটে ফেলবে? আমার বাবা আমায় পাটনা ল'য়ে যেতে চেয়েছেন।"

শেষ কথাটার ভিতর দিয়া আকাশের বজ্র যেন প্রমীলার মাথায় পড়িল, প্রমীলা বিস্মিতা হইয়া বলিল—"তুমি কি যাবে? তুমি কি আমায় ফেলিয়া যাবে?" বলিয়া কাঁদ কাঁদ মুখখানি রাখালের বুকে রাখিল।

রা। জানিনা কি করিব—বোধহয় যেতে হবে।

প্র। আমিও যাব।

দুজনে থামিল। আলিঙ্গন-সুখে হঠাৎ যেন বিষ-সিঞ্চিত হইল—অমৃতে হলাহল ভাসিল; প্রমীলা রাখালের বুকে ঠেস দিয়া যেন রাখালে মিশিবার উদ্যম করিল; কিন্তু প্রকৃতি বাধা দিল। রাখাল অন্য কথা আনিল:—"এ রাত্রে আমার কাছে আসতে লজ্জা হ'ল না—লোকে যে নিন্দা ক'রবে।"

প্রমীলা উৎসাহিতা ভুজঙ্গিনীর ন্যায় মাথা তুলিয়া উত্তর

করিল।—আমি আমার স্বামীর সঙ্গে আছি, কাহাকেও ভয় করিনা।”

রাখাল প্রণয়ের বুকে হাসি-আহ্লাদ চাপিয়া বলিল;—“বিবাহ তো হয় নাই।”

প্রমীলা পূর্ব্বের মত প্রেমের তেজ জাগ্রত করিয়া বলিল,—“না হউক—লোকে বিয়ে ক’রে স্বামী পায়, আমি বিয়ে না ক’রে স্বামী পেয়েছি।

প্রমীলার মুখে এই প্রণয়পূরিত কথাগুলি, অন্ধকারে রাখালের প্রাণে অমৃত ছড়াইতেছিল। রাখাল প্রেমোন্মত্ত হইয়া প্রমীলাকে আলিঙ্গনে চাপিল—প্রমীলার চন্দ্রবদনে, চুম্বনাকারে প্রণয় বর্ষণ করিল—প্রমীলাও রাখালকে চুম্বনামৃতে ডুবাইয়া ফেলিল। সেই অন্ধকারময়ী রজনীতে, সেই উদ্যান মধ্যে, ইহা অপেক্ষা স্বর্গ-সুখ, পাঠক পাঠিকা! আর কিছু আছে বলিয়া কি বোধ হয়?

তখন দুইজনে বকুলতলে উপবেশন করিল। রাখালের বুকে ঠেস দিয়াই প্রমীলা আলিঙ্গন মধ্যে থাকিল। রাখাল বলিল, “প্রমীলা! আমায় পাটনা যাইতে হবে?” প্রমীলা একটু চুপ করিয়া একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিল! কিয়ৎক্ষণ পরে রাখাল আবার বলিল, “প্রমীলা! তোমার সহিত বোধ হয় এই শেষ দেখা।” বলিতে বলিতে কয় ফোটা অশ্রুজল প্রমীলার মুখে পড়িয়া গেল। প্রমীলা তখন ভাবভরে প্রণয়বেগে উদাসিনীর মত কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিল, “রাখাল! আমি আর ঘরে যাব না, চল তোমার সঙ্গে অন্ধকারে লুকাই। যদি লোকলজ্জা লোকভয় হয়তো, গভীর অন্ধকারে দুজনে বাস করিব চল। আমি আজ

তোমায় আর ছাড়িব না।” বলিয়া প্রমীলা রাখালের বুকে মাথা গুঁজিয়া উষ্ণ অশ্রুজলে বক্ষদেশ ভাসাইতে লাগিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, যদি মানুষ না হ'য়ে তোমার ছায়া হ'তাম'। রাখাল প্রমীলার সেই নয়নাশ্রুপাতে এবং মর্ম্মভেদী বাক্যে হতবুদ্ধি হইল—প্রণয়োচ্ছাসে অধীর হইয়া. প্রমীলার অশ্রুপ্লাবিত বদনে, আপনার বদন রাখিয়া যেন প্রেমস্রোতস্বিনী তটে একটু আরাম পাইল—সে যন্ত্রণায় আরাম ব্যতিত আর কিছু রাখাল অনুভব করিল না! রাখাল প্রমীলার চ.ক্ষর জল মুছাইতে মুছাইতে বলিল' “প্রমীলা! যে পথে পা দিয়েছ' এ পথে অনেক কণ্টক। এখনি এত অধীরা হওয়া ভাল নয়। আমি পাটনা যাইলে তোমার ক্ষতি কি?

প্রমিলা ব'লল, আমি তোমায় দেখিতে পাইব না।

রা। মনেতো দেখিতে পাইবে। স্বপ্নে তো দেখিতে পাইবে?

প্র। তাহাতে তৃপ্তি হয় না—তোমাকে এখনকার মত দেখিতে চাই।

রা। পাটনায় আমি ছয় মাস থাকিয়া ছুটীতে আবার আসিব।

প্রমীলা একটু ভাবিতে লাগিল—হৃদয়কে প্রশান্ত করিয়া বলিল,“আমায় যদি ভুলিয়া যাও।” শুনিয়া রাখালের বুকের পাঁজরা যেন মড় মড় করিয়া ভাঙ্গিতে লাগিল। রাখাল তেজের সহিত বলিল, “প্রমীলা! তুমি ভুলিতে পার--আমি ভুলিব না। প্রমীলা! তোমার বিবাহ হইলে একজনকে পাইয়া আমায় ভুলিতে পার—তুমি বাপের কাছে বিবাহের জন্য অধীন। আমি বিবাহ যদি না করি—কেহ কিছু করিতে পারিবে না। হয়তো

তোমার বিবাহ হইলে, আমায় তুমি বাধ্য হইয়া ভুলিবে; কিন্তু তুমি দেখিও—রাখাল প্রমীলাকে হৃদয় হইতে কখন বিস্মৃত হইবে না; বলিয়া রাখাল এক ভীষণ যাতনায় অধীর হইতে লাগিল।" প্রমীলা তাহা বুঝিলনা, কিন্তু রাখালের মাথায় হাত দিয়া বলিল, "যদি আমার পিতা আর কাহারও সহিত বিবাহ দেন, সে বিবাহ নামমাত্র। আমার বিবাহ সে দিন হইয়াছে—যে দিন ঠানদিদি তোমার হাতে আমার হাত রাখিয়া শাঁক বাজাইয়াছে। রাখাল—তোমার সহিত আমার একদিন বিবাহ হয় নাই—অনেক দিন বিবাহ হ'য়েছে। যে দিন প্রথম তোমার ক'নে সাজিয়া খেলা করি, সে দিন হ'তে আমি তোমার জনমের মত ক'নে হইয়া গিয়াছি।

রাখালের যাতনায় অমৃত-বৃষ্টি হইল। রাখাল প্রাণে আরাম পাইয়া জীবিত হইল। দুইজনে এইরূপ অনেক প্রেমালাপ হইতে লাগিল। রাখালের পাটনা যাওয়ার বিষয় ভাবিতে ভাবিতে প্রমীলা বলিল, "তুমি যদি পাটনা যাও ভালই; ভাল করিয়া পড়া শুনা করিবে। কিন্তু আমার একটী অনুরোধ রাখিবে কি না?

রাখাল বলিল, "তোমার জন্য এখনি মরিতে পারি, শত শত লোকের প্রাণবধ করিতে পারি, তোমার অনুরোধ রাখিব না? কি অনুরোধ? প্রমীলা আমার আছে আবার অনুরোধ কি?

প্রমীলা একটু গম্ভীর ভাবে বলিল, "বাবা আমার সম্বন্ধ ক'রছেন। বিবাহও দিবেন"। বলিতে বলিতে, প্রমীলার দুচক্ষু বহিয়া অশ্রুধারা ঝরিল—কষ্টে বেগ সম্বরণ করিয়া আবার বলিল, "আমি তখন কি করিব? তুমি এ বিপদ হ'তে

উদ্ধারের জন্য যা বলিবে তাই করিব। তুমি কি বল?

রাখাল ভাবিতে লাগিল। ভাবিয়া বলিল, "তুমি যা ভাব তাই করিবে, তুমি আগে হ'তে বলনা আমি বিবাহ করিব না।

প্র। লোকে ঠাট্টা করিবে—হাসিয়া উড়াইয়া দিবে। লোকে জ্যাটা মেয়ে বলিবে।

রা। তবে কি করিবে? যা হয় হউক, তুমি চুপ করিয়া সব সহ্য করিবে।

প্র। কি সহ্য করিব?

রা। বিবাহের মন্ত্র, বাসরঘর।

প্র। তার পর?

রাখাল একটু হাসিয়া বলিল, তারপর ফুলশয্যার পূর্ব্বে আমি তোমায় লইয়া পলায়ন করিব। তোমার সতীত্বনাশ করে কার সাধ্য? বিবাহে অমত করা স্ত্রীলোকের সাজে না; তাতে পিতা মাতার অপমান হয়। আর ফুলশয্যার পূর্ব্বে আমার সঙ্গে পলাইলে কেবল সেই হতভাগারই অপমান। রাস্তার লোকের অপমানে পাপ নাই। তবে নিন্দা আছে।

প্র। থাক। তাতে ডরাই না। তোমায় পাইলে কিছু ভয় করি না। এই যে অন্ধকারাচ্ছন্ন বনদেশ ইহা তোমার সহবাসে স্বর্গতুল্য বোধ হচ্ছে, অন্ধকারে আলোক বর্দ্ধিত হচ্ছে ভয়ানক স্থলে সাহসের সঞ্চার হচ্ছে।

রা। তাই হবে—কৃষ্ণ রুক্মিনীহরণ করবেন।

প্র। তবে তাই হবে। আমি বিবাহের পূর্ব্বে তোমায় পত্র লিখবো।

স্বা। প্রমীলা! আর অধিক না—রাত্রি শেষ হবার মত বোধ হ'চ্ছে। যাও ঘরে যাও। আমি বিদায় হই। লোকে দেখ্‌তে পাবে।

শুনিয়াই প্রমীলার বুকটা গুর গুর করিল—যেন স্বর্গ হইতে নরকে পড়িবে—এমন একটা সংবাদ শুনিয়া মৃতপ্রাণা হইল। তখন নায়ক-নায়িকার আলিঙ্গন ও চুম্বনে বন্যা আসিল—সে তোড় স্বর্গ উল্‌টাইবার প্রয়াস পাইল। দুইজনে আলিঙ্গন ও চুম্বনে পরস্পরকে আর্দ্র করিয়া, পরস্পরকে মনে মনে চুরি করিয়া, প্রস্থান করিতে বাধ্য হইল। সেই রজনীর প্রকৃত স্বর্গ-লীলার অবসান হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

রাখাল পাটনা যাইবার পূর্ব্ব দিবস অপরাহ্নে পদ্মদীঘিতে বেড়াইতে যাইল। কেয়াবনের ধারে বসিয়া একবার আকাশ, একবার সরোবর, একবার বৃক্ষরাজি অবলোকন করিতে লাগিল। প্রমীলার মাধুর্য্যময়ী-মূর্ত্তি দৃষ্টিপথে সর্ব্বদাই ক্রীড়া করিতে থাকিল। সরোবরতীরে বসিয়া রাখাল কত কি ভাবিতে লাগিল। একদিন প্রমীলার জন্য সেই সরোবর জলে, পদ্মফুল তুলিয়াছিল—সে কথা মনে পড়িল। একদিন সেই পুকুরের জলে প্রমীলা ডুবিয়াছিল—রাখাল অনেক কষ্টে জল হইতে উদ্ধার করে। প্রমীলা জলে ডুবিয়া কত ক্লেশ পাইয়া-

ছিল—সেই সুনীলপদ্ম-তুল্য হাস্যপূর্ণ নেত্রদ্বয় সলিল-সংযোগে লোহিত বর্ণ ধারণ করিয়াছিল—নাসিকারন্ধ্রে জলরাশি প্রবিষ্ট হওয়ায় প্রমীলার প্রাণ যাইবার সম্ভাবনা হইয়াছিল; এই সব ভাবিতে ভাবিতে রাখালের প্রাণে প্রমীলার সেই সব ক্লেশ উপস্থিত হইতে লাগিল।

ভাবিতে ভাবিতে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া, যে অশ্বত্থতলে বাল্যখেলা করিত, সেইখানে পদচারণা করিতে করিতে উপস্থিত হইল। সেইখানে কোমল তৃণাসনে একবার বসিয়া, বাল্যের সেই সুখময়ী অতীতস্মৃতিতে ডুবিয়া, প্রমীলার সহবাসের জন্য রাখালের প্রাণ ব্যাকুল হইল! সে স্থান কিয়ৎক্ষণ পরে যেন মহা যন্ত্রণার কারণ বলিয়া বোধ হইল, রাখাল সেস্থান হইতে উঠিল। তখন সন্ধ্যা আগত প্রায়। বেড়াইতে বেড়াইতে গ্রামের মধ্যেই প্রবেশ করিল। বড় রাস্তার ধারে, যে প্রকাণ্ড বকুল গাছগুলি সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া আছে, সেই বকুল তলে প্রমীলার সহিত কতবার বকুল ফুল কুড়াইয়া মালা গাঁথিত;—সে কথা রাখালের প্রাণে আসিয়া রাখালের হৃদয়ে উচ্ছাস তুলিল। রাখাল মনে মনে যেন সেইখানে সেইভাবে খেলা করিতে লাগিল।

আর একদিন সেই বকুলতলে প্রমীলা বালীর মন্দির গড়িয়া তাহার উপরে বকুল ফুল সাজাইয়াছিল—সারদা হঠাৎ পদাঘাতে সেই মন্দির ভাঙ্গিয়া পলাইয়া যায়; প্রমীলা কাঁদিতে কাঁদিতে রাখালের কাছে নালিস করে—সে সব কথাও ক্রমশঃ জাগ্রত হইয়া রাখালকে বড়ই ব্যাকুল করিল। রাখাল সেই বকুল তলে উপস্থিত হইল। গাছগুলি যেন কত বাল্যের কথা মুখস্থ

রাখিয়াছিল, এখন রাখালের কাণেঃ কাণে বলিতে লাগিল। একটি গাছের গায়ে প্রমীলা ছুরির ডগা দিয়া গভীর দাগে রাখালের নাম লিখিয়াছিল। রাখাল সেই দাগ এখনও বিলীন হয় নাই দেখিয়া ভাবে অভিভূত হইল; সে দিনের কত কথা যেন আঁচে আঁচে মনে ভাসিতে লাগিল। খেলা করিতে করিতে একদিন হেমন্তকুমারী প্রমীলাকে গাছের গুঁড়িতে চাপিয়া ধরিয়া বুকে কিল মারিয়াছিল, সেই কথা মনে হইবামাত্র প্রমীলার অতীত ক্লেশ-স্মরণে রাখাল কাঁদিয়া ফেলিল। রাখাল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সেইখানে থমকিয়া দাঁড়াইল। সেই গাছতলায় তাহাদের খেলার প্রধান আড্ডা ছিল। সেইখানে ঠাকুর গড়িয়া পূজা করিত—মিছা লুচি সন্দেশ প্রস্তুত করিয়া যজ্ঞ সমাপন করিত। রাখাল এই সব ভাবনায় যেন প্রমীলাতে আপনাকে হারাইতে লাগিল। রাখাল বকুলগাছে উঠিয়া ফুল পাড়িত—প্রমীলা তলায় কুড়াইত। রাখাল পেয়ারা গাছে পেয়ারা পাড়িত, প্রমীলা কোঁচড়ে রাখিত; ইত্যাদি কত বাল্যলীলার প্রাণারাম কুসুমের ঘ্রাণে রাখালের অস্তিত্ব পরিপূর্ণ হইতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা অতীত হইল। রজনীর অন্ধকারে খদ্যোৎ জ্বলিতে লাগিল। রাখাল প্রমীলাকে আর একবার দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইল; কিন্তু কি প্রকারে দেখা হইবে ভাবিতে লাগিল।

রাখাল ঘরে ফিরিল—অনিচ্ছায় নিরানন্দে ঘরে পঁহুছিল। জননীর কাছে বসিল, জননীর কথা অন্যমনে অনিচ্ছায় শুনিতে শুনিতে প্রমীলা-চিন্তায় অধীর হইতে লাগিল। পরদিন

পাটনা যাইবে বলিয়া জননী পুত্রের জন্য কত খাবার প্রস্তুত করিয়াছিল, জননী সে সব আদরে বাটিতে সাজাইয়া কাছে আনিয়া দিল। রাখাল মার অনুরোধে একবার মাত্র স্পর্শ করিতে লাগিল। পেটে ক্ষুধা ছিল, কিন্তু খাইতে ইচ্ছা নাই। অনেক কষ্টে সে দায়ে নিস্তার পাইয়া বিছানায় শয়ন করিল, কিন্তু কে যেন বিছানায় কাঁটা ছড়াইয়াছে—মনকে কে যেন দড়ি বাঁধিয়া প্রমীলার দিকে প্রবলবেগে টানিতেছে। বাটির অন্যান্য সকলে নিদ্রিত হইল। সেদিন রাত্রে রাখালের জননী অনেকক্ষণ রাখালের সহিত কথা কহিয়াছিল—রাখালের তাহা ভাল লাগে নাই, বরং বিরক্তির কারণ হইয়াছিল; মার কথায় অনেক সময়ে বাধ্য হইয়া উত্তর দিয়াছিল; কিন্তু 'না' স্থলে 'হাঁ,' হাঁ, স্থলে 'না 'বলায়, রাখাল যে অন্যমনস্ক, তা তার জননী বুঝিতে পারিয়াছিল। কথা কহিতে কহিতে রাখাল একবার প্রমীলার নাম বলিয়া অপ্রতিভ হইল। কথা কহিতে কহিতে জননীর একটু তন্দ্রা আসিল। রাখাল সেই অবসরে উঠিয়া—প্রমীলা দর্শনের অভিলাষে ঘরের খিল আস্তে আস্তে খুলিল, কিন্তু কপাট খুলিবামাত্র হঠাৎ জননীর সংজ্ঞা লাভ হইল। জননী "কেও" বলিয়া ডাকিবামাত্র "আমি প্রস্রাব যাব" বলিয়া রাখাল ঘরের বাহিরে গেল! জননীর আবার তন্দ্রা আসিল—তন্দ্রায় স্বপ্নে রাখালের পাটনা যাইবার আয়োজন করিতে লাগিল। রাখাল এদিকে বাটির বাহিরে উপস্থিত। তখন অনেক রাত্রি। রাখাল ভাবিল, "আজ গেলে দ্যাখা হবে কি? যদি দ্যাখা না হয়।" রাখাল আবার ভাবিল "প্রমীলার ঘরের কাছে একবার যাই—যদি বাতায়ন-পথে আসে তো দ্যাখা হবে—প্রাণ শীতল

হবে।” বাটির বাহিরে গিয়া ভাবান্তর হইল। “আর প্রমীলাকে কষ্ট দেওয়া কেন? অদৃষ্টে যদি সুখ থাকে তো প্রমীলাকে জীবনের মত পাইব; আর গিয়া কাজ নাই।” রাখাল বাহির হইতে বাড়ীর ভিতরে গেল—বিছানায় শয়ন করিল। নিদ্রা হইল না—একটু তন্দ্রা মাত্র আসিল। সেই তন্দ্রায় সেই খিড়কীর বাগানে প্রমীলার সাক্ষাত পাইল। প্রমীলা রাখালের হাত ধরিয়া খিড়কি পুকুরের জলে নামিল। দুজনে সাঁতার দিতে লাগিল। সাঁতার দিয়া ঘাটে উঠিল। কাপড় পরিয়া সেই বকুল তলে খেলাঘর পাতিল। আবার বউ বউ খেলাইতে লাগিল। হেমন্তকুমারী আসিয়া যেন খেলাঘরে রাখালের সহিত প্রমীলার বিবাহ দিল। সেই বকুলতলে পাতা বিছাইয়া শয্যা হইল। সেই শয্যায়প্রমীলা শয়ন করিল, রাখাল শায়িতা প্রমীলাকে আলিঙ্গনে বাঁধিয়া মুখ চুম্বন করিতে যাইবে এমন সময়ে জননীর ডাকে রাখালের সুখ স্বপ্ন ভঙ্গ হইল। জননীর সেই আহ্বানে রাখাল যেন স্বর্গের নন্দনকাননভ্রষ্ট হইয়া পৃথিবীতে পড়িয়া গেল।

পর দিবস মনের ক্লেশ মনে রাখিয়া অনিচ্ছায় রাখালচন্দ্র পাটনা যাত্রা করিল।

তৃতীয় খণ্ড।

——]ঃ—ঃ[——

প্রথম পরিচ্ছেদ।

——ঃ[০]ঃ——

ডাক্তারেরা "থারমামেটারে" রোগীর জ্বরের অবস্থা বুঝেন। আর দেশীয় কবিরাজগণ হাতে হাত রাখিয়া অনুভূতিবলে তাহা স্থির করেন। অনুশীলন গুণে কবিরাজের ঐ অনুভূতি এতদূর প্রবল হইতে পারে, যে, তিনি কেবল মাত্র নাড়ি অনুভব করিয়া রোগের সমুদয় বিবরণ জানিতে পারেন। এমন কবিরাজ আছেন যে, কেবল মাত্র নাড়ি দেখিয়া এই শরীরের পূর্ব্বাপর সমুদয় অবস্থা যথাযথরূপে বলিয়া দিতে পারেন। এমন গণক আছেন যে মানুষের মুখের দিকে তাকাইয়া, তাহার ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান অতি সুন্দর রূপে বলিয়া দেন। যে শক্তি দ্বারা এরূপ আশ্চর্য্য বলা যায়, তাহার নাম অনুভূতিশক্তি। মানুষের অতীত ও ভবিষ্যৎ যদি অনুভূতিবলে বলা যায়—তবে কোন গাছের—কোন নক্ষত্রের—চন্দ্র সূর্য্যেরই বা বলা যাবেনা কেন? যদি অনুভূতির কর্ষণ হয় তো, জগতের একটী ঘাসের ভিতরে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া, সমুদয় জগতের ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান অক্লেশে বলা যাইতে পারে। তুমি অনুভূতি বলে তোমার পদাঙ্গুলি হইতে মাথার কেশ পর্য্যন্ত অনুভব কর—মাথায় উকুন নড়িলে জানিতে পারিয়া সে স্থান চুলকাও, পৃষ্ঠে মশা কামড়াইলে অমনি চপেটা-

দ্বাতে মশকের প্রাণনাশ কর; অর্থাৎ শরীরের সকল স্থানের সংবাদ তুমি অনুভূতিবলে বুঝিতে সক্ষম। আবার একটা যষ্টি ধরিয়া শরীরের বাহিরের পদার্থ সকলের বিষয়ও কিছু কিছু জানিতে পার। অন্ধ তাহার হাতের যষ্টির ভিতর দিয়া অনুভূতি-বলে তাহার পার্শ্বস্থ পদার্থ সকলের জ্ঞান লাভ করিয়া থাকে। আমার অনুভূতি যেমন লাটির ভিতর দিয়া কাজ করিতে পারে; সেইরূপ উৎকর্ষাধিক্যবশতঃ বায়ুকে অবলম্বন করিয়া—পৃথিবীর মাটীকে ধরিয়া, অনেক দূরের খবরও বলিয়া থাকে। যেমন অনুভূতিশক্তি দৃষ্টি ও শ্রবণপথে দূরবীক্ষণাদির সাহায্যে বর্দ্ধিত হইয়া সূর্য্যচন্দ্রের খবর বলিতে পারে; সেইরূপ উক্ত শক্তি যোগ-বলে আশ্চর্য্য উন্নতিলাভ করিয়া দূরদেশের সংবাদ দিতে পারে। ভারতবর্ষের ঋষিরা অনুভূতিবলে জগতের ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান অতি সুন্দররূপ জানিতে পারেন।

যাঁহারা ঈশ্বরের প্রকৃত সাধক—প্রকৃত ভক্ত—তাঁহাদের এই অনুভূতিশক্তি অত্যন্ত প্রবলা হয়। তাঁহারা মানুষের দিকে চাহিবামাত্র তাহার সমুদয় তত্ত্ব বলিতে পারেন। সে কি করিয়াছে—কি ভাবিতেছে—কি করিবে—সমুদয় অভ্রান্ত রূপে বলিয়া দেন। যিনি সৌভাগ্যবশতঃ ভগবৎসাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, যাঁহার রিপু সকল মূলোৎপাটিত হইয়াছে—যিনি প্রেম ব্যতীত আর কিছুই আপনার বলিয়া রাখেন নাই,—তিনি ধ্যান বলে সমুদ্রের তলে, বজ্রধ্বনির হুঙ্কারে, কুসুমের নিভৃত গন্ধাগারে, এবং বিহঙ্গের সুমধুর ঝঙ্কারের ক্ষুদ্রতম স্বরহিল্লোলে মহাসুখে বিচরণ করেন; এবং আপন সুখ দুঃখের ন্যায় প্রাণীপুঞ্জের সুখ দুঃখ সমান ভাবে অনুভব করেন। জগতে যাহা ঘটে ভক্তের

খাঁটি হৃদয়ে তাহার প্রতিবিম্ব পতিত হয়। তিনি সামান্য পিপি-লিকার কাতর শব্দ পর্য্যন্ত অনুভব করিয়া প্রেমাশ্রুপাত করেন। তখন তিনি ও জগৎ পৃথক নহেন। তখন তাঁহার চেতনা ও জগতের চেতনা একীভূত হয়—তখন তাঁহার ধ্যান জগতের কেন্দ্রীভূত মহাশক্তি। সেই ধ্যানে তিনি ও ভগবান একীভূত হন। ইহাই যোগীর মহাযোগ—প্রেমিকের মহাসমাধি। তখন এই মহাযোগে—মহাসমাধিতে অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ, ইহকাল ও পরকাল, ভূত ও ভবিষ্যৎ, একীভূত হয়। তখন সাধকই ঈশ্বর। ইহাই মানুষের শেষ—ইহাই জীবন গ্রন্থের পরিসমাপ্তি। এই স্থানেই হিন্দুর "সোঽহং"।

দেখিতে দেখিতে কাদম্বিনীর আধ্যাত্মিক উন্নতি পরাকাষ্ঠা লাভ করিল। কাদম্বিনী প্রকৃতির প্রত্যেক স্থলে বিশ্বাস ভক্তির লীলা দেখিতে লাগিলেন। ঈশ্বরবিশ্বাসই ঈশ্বরের প্রকৃত মন্দির। ঈশ্বরপ্রেমই ঈশ্বরের প্রকৃত পূজা! বিশ্বাসের কনিকা মাত্র বুকে ধরিয়া যদি কেহ পৃথিবীতে দাঁড়ায়, তো, তাহার তেজে পাহাড় পর্য্যন্ত কাঁপিতে থাকে, পাপিষ্ঠ মানুষ তো সামান্য কথা। বিশ্বাসীর হৃদয়ে যে বল আছে, সমুদয় জগতে সে বল নাই। বিশ্বাসীর কথায় জগতের অবিশ্বাস যত বিনষ্ট হয়, সহস্র দর্শনের তর্কে তাহার তিলাংশও হয় না। ভক্তি ও বিশ্বাস যে পাইয়াছে সে জগতের মুক্ত রহস্যাগারের চাবি হস্তগত করিয়াছে।—সে কি না করিতে পারে? কাদম্বিনী জ্ঞানচক্ষে দেখিলেন দেহ খাঁচা। জীব পাখী। ইচ্ছা করিলেই খাঁচা ফেলিয়া যাওয়া যায়। পাখী পুরাতন খাঁচা হইতে নূতন খাঁচায় যাইতেছে মাত্রঃ—

কাদম্বিনী জ্ঞান চক্ষে দেখিলেন, আকাশে আকাশ নাই; চাঁদে চাঁদ নাই; পাহাড়ে পাহাড় নাই;—সবই আত্মস্বরূপে ডুবিয়া গিয়াছে:—

কখনও আপনি ফুলে ফুল—ফুলে গন্ধ; সমুদ্রে সমুদ্র—তাহাতে গাম্ভীর্য্য; আগুণে আগুণ—তাহাতে শক্তি। আপনি সতীতে সতীত্ব, ভক্তে ভক্তি, প্রেমিকে প্রেম:—

দেখিলেন আপন দৃষ্টিতে ফুলে চাঁদে মিশিয়া যায়, রৌদ্রে জ্যোছনায় মাখামাখি হয়, গাম্ভীর্য্যে হাসি লুকাইয়া পড়ে, পাপে পুণ্য জ্বলিয়া উঠে:—

দেখিলেন জগতে কেহ কাঁদিয়াও কাঁদেনা; হাসিয়াও হাসেনা; ফুল ফুটিয়াও ফুটেনা; নদী বহিয়াও বহিতেছে না; সব অস্থির হইয়াও স্থির; মৃত হইয়াও জীবিত; পৃথক হইয়াও এক; সবই এক—এক অনন্ত এক—তাহাই আপনি।

কাদম্বিনীর অনুভূতি শক্তি অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল। কে কি ভাবিতেছে—কি ভাবিবে—কি করিবে—কাদম্বিনী সব জানিতে পারেন। মানুষ কাছে আসিলেই তাহার ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কাদম্বিনী ধাঁ করিয়া ধরিয়া ফেলেন। কখনও কোন প্রশ্ন করিতে হয় না—কাদম্বিনী আপনি মর্ম্মকথা জানিতে পারিয়া তাহার উত্তর দেন। গ্রামে কে কবে মরিবে, কাহার কন্যা কবে বিধবা হবে, কার অদৃষ্টে কি ঘটিবে, পিতাকে সব চুপে চুপে বলিয়া থাকেন। বিদেশে কে কখন মরিয়াছে—কে কি বিপদে পড়িয়াছে—আগে জানিতে পারিয়া কাদম্বিনী পিতার কাছে আবশ্যকমত বলিয়া থাকেন।

কাদম্বিনীর ক্রমশঃ আহার বন্ধ হইয়া আসিল। অন্নত্যাগ

করিলেন। ফল মূল দুগ্ধই দেহ রক্ষার উপায় হইল। তাহাও ক্রমশঃ কমিল। কোন দিন আধ খানা পেয়ারা, কোন দিন কিছু নারিকেল, কালীর নৈবেদ্যের ২।১ খানা পেঁপে। কোন দিন আদতে কিছু নয়। পরিশেষে ২।৩ দিন অন্তর ২।১ টী ফল মাত্র। আহার কমিল, দেহে বল কমিল না—দেহের লাবণ্য কমিল না। মুখের হাসি দিন দিন বাড়িল—দেহের লাবণ্যে মা ভগবতীর রূপ ফুটিতে থাকিল। সে দেহ আর মানবদেহ রহিল না। কাদম্বিনী দেবী হইলেন। দেবীর আকর্ষণে শ্রীধরের বাটীতে সাধু সমাগম হইতে লাগিল। কোন সাধু উক্ত গ্রাম দিয়া যাইবার সময়, (কিজানি কেমনে) জানিতে পারিয়া শ্রীধরের বাটীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে পাগলের মত বাটীর দিকে তাকাইয়া থাকিতেন—শ্রীধর দেখিবা মাত্র যত্ন করিয়া তাঁহাকে বাটীর ভিতরে লইয়া যাইতেন। সাধু তখন মনের সাধে দেবীকে দেখিয়া জন্ম সার্থক করিতেন। সাধু ভক্ত দলের মধ্যে একটা গোল পড়িয়া গেল। শ্রীধরের কন্যা 'দেবতা,' 'সিদ্ধপুরুষ,' ভাল লোকেরা এই কথা বলিতে লাগিলেন। যাঁহারা গোপনে আসিয়া দেবী দর্শন করিতেন, দেবী তাঁহাদিগকে বলিতেন, আমি খড়ের কুটা, আমাকে যাহা ভাবেন, আমি তাহা নই।

কাদম্বিনীদেবীর কাছে বসিলে মনে হয় যেন মার কাছেই বসিয়াছি। তুমি কখনও কাদম্বিনীর সংবাদ রাখ নাই—যদি একবার ভাগ্যবলে কাছে বসিতে পার; তো তাঁহার স্নেহে অভিভুত হইবে, এবং মনে মনে ভাবিবে এঁরই গর্ভে জন্মিয়াছি, এঁরই স্তন্যপান করিয়া এত বড় হইয়াছি। কাদম্বিনীর বয়স এখন ২৬ বৎসর; কিন্তু ৮০ বৎসরের বুড়া যেন তাঁর কোলের আদরের

ছেলে। যিনি যেরূপ পাষণ্ড হউন না কেন, কাদম্বিনীর কাছে বসিলে—তাঁহার একটী কথা শুনিলে আপনাকে তাঁহার সন্তান বলিয়া অনুভব করিতে করিতে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে হইবেক; এবং মাতৃভক্তিতে পরিপূর্ণ হইয়, সেই দেবীমূর্ত্তির দিকে চাহিয়া "মা", "মা" বলিয়া প্রাণ জুড়াইতে হইবেই হইবে। সে মূর্ত্তি দেখিলে অস্তিত্ব ডুবাইয়া ভক্তির স্রোত ছুটিতে থাকে; ঘর বাড়ি ছাড়িয়া সেই পদতল সার করিতে ইচ্ছা হয়; সোনার সিংহাসন দূরে ফেলিয়া সেই চরণধূলি মাথায় ধরিতে হৃদয় চীৎকার করিতে থাকে। যদিও কাদম্বিনীর সন্তান হয় নাই—সে সম্ভাবনা আদতে দেখা দেয় নাই, তথাপি সবই তাঁর সন্তান কেহ জোরে ঘাস মাড়াইলে কাদম্বিনীর প্রাণে ব্যথা ধরে; জোরে একটী গাছের পাতা ছিঁড়িলে কাদম্বিনীর প্রাণ মুচড়াইয়া যায়, কাঁচা ফল গাছ হইতে তুলিলে তাঁর যেন একটা আঙুল ভাঙিয়া যায়—কাহা-কেও জোরে মারিলে তাঁর গায়ে দাগ পড়ে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আশ্বিন মাস। প্রাতঃকাল। বাতাস সেফালির গন্ধে পরিপূর্ণ হইয়া মন্দ মন্দ বহিতেছে। সূর্য্য এইমাত্র উঠিয়াছে। তাল নারি-কেল প্রভৃতি বড় বড় গাছের মাথায় পাতায়, ঘরের ছাদ, চালে, রৌদ্র চক্‌মক্ করিতেছে। আকাশে পাখী উড়িতেছে। সাদা মেঘ ধীরে ধীরে আকাশের নীল সাগরে পাড়ি দিতেছে। বাঁস গাছের

মাথা, নারিকেল ও তাল গাছের পাতা, অল্প অল্প দুলিতেছে। পুকুরে মাছরাঙা মাছে ছোঁ মারিতেছে। মাঝেমাঝে চিল ডাকিতেছে—আকাশের অতি দূরে শকুনি চিল উরিতেছে। সেফালির গন্ধ নাকে বড় আরাম দিতেছে।

প্রাতঃক্রিয়াদি সমাপন করিয়া মাথার ভিজা চুল এলো করিয়া পা মেলিয়া কাদম্বিনী বড় ঘরের দাওয়ায় বসিয়া আছেন। বাটির উঠান নিকান হইয়াছে। নিকান তুলসী তলাটী বড় মসৃণ, গড়াগড়ি দিতে ইচ্ছা যায়। বড় ঘরের দাওয়া, ঠাকুর ঘরের দাওয়া ঝক ঝক করিতেছে। মাটীর ঘর হইলে কি হয়? এমনি নিখুঁত উলাটি, এমন পরিচ্ছন্নতা যে দেখিলে প্রাণ জুড়ায়—সে মেজেতে শুইতে ইচ্ছা করে। শ্রীধরের বাটীর চারিদিকে মাটীর প্রাচীর, প্রাচীরে ঘরে নূতন ছাউনী। বড় ঘরের দ্বারদেশে দু-পাশে কাঁথের গায়ে দুদিকে দুটা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পদ্মের ঝাড়;—কাদম্বিনী নিজ হাতে তাহা আঁকিয়াছেন। পদ্মের পাতা ডাঁটা ফুল সবারই গৈরিক রং, উপরে একটী ক্ষুদ্র কুলুঙ্গিতে সিদ্ধিদাতা গণেশের মৃত্তিকাময়ী মুর্ত্তি। ঘরের কোথাও অপরিষ্কার দেখা যায় না। চালের কোথাও একটী মাকড়সার জাল পর্য্যন্ত দেখা যায় না, ইঁদুরের উপদ্রব চিহ্ন কোথাও নাই। কেবল গণেশশোভিত কুলঙ্গির মাথার উপর, কুম্ভীর পোকা একটী ঘর বাধিয়াছে মাত্র। কেবল দাওয়ায় উঠিতে ডাইন দিকে খুঁটির মথার কাছে একটা ছিদ্রে—একটী ভ্রমর অর্দ্ধ প্রবিষ্ট হইয়া গুণ গুণ গুণ গুণ করিতেছে। দেয়ালের গায়ে একটা টিকটিকি লেজ নাড়িতেছে। চালের তলায় দুটী ভ্রমর ভোঁ ভো শব্দে উড়িতে উড়িতে মুখামুখী হইয়া মাঝে মাঝে লড়াই করিতেছে;—লড়াই করিতে করিতে

দুটাতে জড়াজড়ি করিয়া ভূতলে ঠক্ করিয়া পড়িয়া গেল। তার পর উল্টিয়া পাল্টিয়া কিয়ৎক্ষণ পরে পৃথক্ হইয়া ভোঁ ভোঁ শব্দে দুদিকে দুটা চলিয়া গেল। কাদম্বিনী দাওয়ায় বসিয়া তুলসী-তলায় দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া কি ভাবিতেছিলেন। একটা বিড়াল তখন তুলসীতলে গম্ভীর ভাবে ওত মারিয়া অতি সতর্কে বসিয়া আছে। কাদম্বিনী তাহা দেখিতে দেখিতে কি ভাবিতেছিলেন। শ্রীধর তখন কালীপূজা করিতেছেন। কালীর সম্মুখে আসনে বসিয়া কালীর চরণে আপনাকে বলি দিতেছেন। গা খোলা; বুকে চুল, পেটে চুল। বুকে চন্দন—কপালে চন্দন। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। ভক্তিতে কাঁদিতে কাঁদিতে রাঙা জবা এক একটী করিয়া মার চরণে দিতেছেন। ভাবভরে কাঁদিতে কাঁদিতে ফুল হাতে লইয়া বলিতেছেন;—

মা! এই নে!
মা! এই ফুল নে!
মা! এই বেলপাতা নে!
মা! এই আমাকে নে!

শেষ কথাটী বলিবার সময় ভাবে কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতেছে—চক্ষু তেজোময়—অশ্রুপূর্ণ—হইতেছে। পূজা সমাপন করিয়া আপনাকে মার চরণে বিকাইয়া, ঠাকুর ঘর হইতে বাহিরে আসিলেন। বড় ঘরে উঠিলেন। উঠিয়া কন্যাকে বলিলেনঃ—

মা! এই বার পূজা করগে!

মেয়ে বলিল, 'যাই'।

শ্রীধর। আমি আজ একবার সেখানে যাই। কাল থেকে স্বস্ত্যয়ন আরম্ভ করতে হবে। ৮।৯দিন বিলম্ব হবে

কাদম্বিনীর প্রাণে কি খট্ করিল—চক্ষু জলে ভরিয়া গেল—কাদম্বিনী সম্মুখে ইষ্টদেবতার প্রকাশ দেখিলেন। সর্ব্ব শরীর সিহরিয়া উঠিল। কাদম্বিনী গম্ভীর ভাবে পিতার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন "গিয়া কাজ নাই—আজ থাক;—আর কাহাকেও পাঠাও।

দেয়ালে টিকটিকী পড়িল, টিক্ টিক্ টিক্। শ্রীধর ও একটা হাঁচি ফেলিল।

শ্রীধর চকিত ভাবে বলিল "তোমার নিষেধ, তার উপর আবার হাঁচি টিক্ টিকি। কোন বিপদ হবে না তো?

কা। বিপদ কেন হবে? বিপদই আমাদের সম্পদ।

শ্রীধর কোন দূরস্থ জমিদারের বাটিতে স্বস্ত্যয়ন উদ্দেশে যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। এখন উপর্য্যুপরি বাধা পাইয়া ভাবিলেন. "যখন কথা দিয়াছি তখন না গেলে অধর্ম্ম হবে"—এইরূপ ভাবিতেছেন, এমন সময়ে কাদম্বিনী পিতার মর্ম্মকথা বুঝিয়া বলিলেন, যাওয়া তোমার হবে না—আর কাহাকেও পাঠাও।

শ্রীধর ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ভাবিতে ভাবিতে দাওয়ায় এ দিক ওদিক পদচারণা করিতে থাকিলেন। তারপর বিমর্ষ মনে "তাই ওপাড়ার রামেশ্বরকে পাঠাই" বলিয়া নামাবলী গায়ে দিয়া, কটকী জুতা পায়ে পরিয়া, বাটীর বাহির হইলেন।

কাদম্বিনী কালী পূজায় গেলেন। কালীপূজা সমাপন করিয়া রন্ধনাদি করিলেন। রন্ধনাদি করিয়া ভাবিতেছেন, "আর বাবাকে রাঁধিয়া খাওয়ান আমার আজ হইতে শেষ হইল; আজ বাবার শেষ অন্নাহার। আর আট দিন পরে বাবাকে এ ঘরে দেখিব না আট দিন পরে বাবা আমায় চিরকালের মত ফেলিয়া

যাইবেন।” আবার ভাবিলেন—“এ সব কথা বাবা আপনিই জানিতে পারিবেন, আমাকে আর বলতে হবে না।”

ভাবিয়াই মৃদু হাসিলেন--পিতার মৃত্যুপথে যেন সে হাসি ছড়াইয়া পথকে সহজ করিলেন।

রন্ধন সমাপ্ত না হইতে হইতে, শ্রীধর রামেশ্বর চক্রবর্ত্তীকে জমিদারের বাটীতে আপনার প্রতিনিধি স্বরূপ পাঠাইয়া বাটীতে ফিরিলেন। বাটীতে আসিয়া দেখেন, কন্যা রন্ধনাদি শেষ করিয়াছেন। কন্যার দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন “মা! বুঝেছি আমার আর অধিক দিন নাই”—পথে আসিবার সময় পঞ্চাননতলায় দাঁড়াবা মাত্রই, কে যেন বলিল “তোর আর অধিক দিন নয়”। কাদম্বিনী গম্ভীর হাস্যে বলিলেন,বাবা। অমৃতধাম তোমাকে ছাড়িয়া আর কত দিন থাকিবে। মাটীর পৃথিবীতে কি তোমার শোভা পায়।

শ্রীধরের চক্ষু দিয়া জল ঝরিল। শ্রীধর ভাবিল, এমন কি পুণ্য আছে, যে স্বর্গে যাইব। মনে প্রশ্ন উঠিল, তবে আমার আর অমৃত ধামের কয়দিন বাকী আছে। শ্রীধরের মনের ভাব বুঝিয়া কাদম্বিনী বলিলেন “বাবা! পাপ পৃথিবীতে তোমার আর আট দিন বাকী”। কন্যার কথার বর্ণে বর্ণে যেন ভগবানের কথার সুর জড়ান, অনুভব করিয়া ভক্তিভরে শ্রীধর বসিয়া পড়িলেন। নীরবে আপনার জীবনের অতীত ঘটনা সকল স্মরণ করিতে করিতে আত্মবিস্মৃত হইতে লাগিলেন। এক একটা পাপের কথা মনে পড়িল—মন পুড়িয়া গেল, অস্তিত্ব ফাটিবার মত বোধ হইল! ঐ একটা—ঐ একটা—কি ভয়ানক ব্যবহার! আমি কি পাষণ্ড! শ্রীধরের যাতনা বড় অসহ্য হইল।

চক্ষের জলে বুক ভাসিয়া গেল। কিন্তু ঈশ্বর কৃপা হঠাৎ আকাশে প্রাণে চৈতন্যরূপে আবির্ভূত হইল। প্রাণে অমনি ভক্তির উচ্ছ্বাস উঠিল, শ্রীধর আপনার পাপ তাপ ভুলিয়া ইষ্টদেবতার ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন।

কন্যা পিতার ভাব গতিক – টের পাইয়া, উৎসাহপূর্ণ ভাষায় কহিলেন, বাবা! তোমার বড় সুখের মৃত্যু! কিছু ভয় নাই। যে মূর্ত্তি দেখিতেছেন ঐ মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে স্বর্গধামে চলিয়া যাইবেন।

পিতার হৃদয়ে সাহস জাগ্রত হইল; যেন ফুৎকারে মায়ার বন্ধন ছিঁড়িয়া গেল—মৃত্যু সুখের দ্বার—অমৃতসোপান বলিয়া অনুভূত হইল—শ্রীধর ভাবিলেন, শুভস্য শীঘ্রম্। শ্রীধরের মন, প্রাণ, সমুদয় প্রবৃত্তি পৃথিবী ছাড়িয়া পরলোকের দিকে ধাবিত হইল। এপৃথিবী যেন ছার পদার্থ, আর পরলোক যেন সুখের ঘর।

শ্রীধর বীরের ন্যায় মরিতে প্রস্তুত হইলেন—সেই নূতন দেশে যাইবার জন্য কৌতূহলাক্রান্ত হইলেন—সে দেশে যেন তাঁর কত আরাম!

মরিবার দিনের কথাটা মানুষের কাছে বড়ই লুকান—এমন লুকান আর কিছু নাই। যদি না লুকান থাকিত, তো মানুষের যাতনার অবধি থাকিত না—মানুষের জীবনের আনন্দোৎসব আদতে থাকিত না—এমন যে সুখের বিবাহ তাহা মানুষের শ্মশানের একটা অংশ হইয়াই থাকিত। তাহা হইলে—মানুষ ফাঁসির কয়েদী হইয়া, এক একটা মুহূর্ত্তে যমের ভীষণ পাদবিক্ষেপ গণিতে গণিতে আতঙ্কিত হইত। জগতের উৎসাহ—আশা সব শ্মশানের অগ্নিকেই প্রজ্বলিত করিত মাত্র। মৃত্যু! কি ভীষণ

নাম! কি বিকট শব্দ! বজ্রের হুঙ্কার উহার কাছে অতি কোমল। মৃত্যু?—এই অদৃশ্য নিরাকার ভীষণ জন্তুকে কে সৃজন করিল? ক্রমাগতই খাইতেছে, ক্রমাগতই গিলিতেছে—এক এক বারে কত কোটী প্রাণীকে গিলিয়া ফেলিতেছে! মৃত্যু জিনিষটা কি? অন্ধকার! অচৈতন্য! না অন্ধকারে অচৈতন্যে মিশান একটা যন্ত্রণাময় শূন্যদেশ। সে কি প্রকার ভীষণ অন্ধকার? মানুষ ঘুমাতে ঘুমাতে যে অন্ধকারে ডুবে—যে অচৈতন্যে মিশে—উহা কি তাই? অথবা ঐ দেশের পর পারে যে দেশ—যেখানে ঘুম আর ভাঙ্গেনা—যেখানে নিদ্রার কুল নাই, কিনারা নাই, তলা নাই—যে খানে নিদ্রা অচৈতন্যের অসাড় দেহে একীভূত হইয়াছে—উহা কি সেই দেশ? সেই দেশের বহির্ভাগেই শ্মশানের ভীষণ মূর্ত্তি। মানুষের শোক শ্মশানে গিয়া—চিতা-ভস্মে গড়াগড়ি দিতে দিতে, সেই দেশকে ডাকিতে থাকে; কিন্তু সে দেশ হইতে কেহ একটী বারও সাড়া দেয় না। জনকজননীর পাষাণভেদী ক্রন্দন শ্মশানের মাটীকে আর্দ্র করে, শ্মশানবিক্ষিপ্ত নরকঙ্কাল সকলকে বিগলিত করে, কিন্তু সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন অদৃশ্য চির বধির দেশের কেহই সে কান্নার একটী মাত্র শব্দ শুনিতে পায় না। আহা! বিধাতার কি ভীষণ নিষ্ঠুরতা! এমন নিষ্ঠুর দেশে, একলা এই সোনার দেহ, সাধের সংসার ফেলিয়া মুহুর্ত্তের আহ্বানে যাইতে হইবে। পলকের ডাকে চাঁদ আকাশে ডুবিবে, সূর্য্য আঁধারে নিবিবে, পাখীর গান থামিবে, ফুল ফুটিতে ফুটিতে বিলীন হইবে, স্নেহ শুকাইবে, মায়ার বড় বড় শিকল ছিড়িয়া যাইবে! আহা! প্রাণ যে ফাটিয়া যায়! ভাবিতে ভাবিতে মানুষ তখনি যেন মৃত্যুর ভয়ঙ্কর ছায়ায় বিষজর্জ্জরিত হইয়া

ঢলিয়া পড়ে—মৃত্যুর ভীষণ কণ্টকপূর্ণ প্রকাণ্ড শরীরের উপর আছাড় খাইয়া পড়িয়া যায়।

মোহপূর্ণ মানুষ মরিবার আগে জানিতে পারিলে, এইরূপ যাতনায় অস্থির হয়! সে আপন-শ্মশানচুল্লির ভীম অগ্নি রাশিকে আপনার অশ্রুজলেই নিবাইতে যেন ব্যস্ত হয়; আত্মীয় জনের ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে শুনিতে নীরবে অশ্রুমোচন করে, এবং আপ-নার শ্মশানের অন্ধকারময়ী ভীষণতার মূর্ত্তি দূর হইতে অব-লোকন করিয়া সশঙ্কিত হইতে থাকে।

শ্রীধরের পবিত্র প্রাণে সাহসের সঞ্চার হইল। এ সব ভাব আদতে দেখা দিল না। হৃদয় প্রাণ স্বর্গীয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইল—অস্তিত্ব ভক্তিরসে ডুবিয়া গেল।

শ্রীধর গম্ভীর ভাবে আহারে বসিলেন। জগজ্জননীকে সব নিবেদন করিলেন। নিবেদন করিবার সময় দুচক্ষু মুদিত হইল। মুখে স্বর্গীয় দীপ্তি ফুটিল। মুদিত চক্ষু দিয়া জল ঝরিল। শ্রীধর সেই স্থানে বসিয়া কত বৎসর আহার করিতেছেন—সেই স্থানে জগজ্জননীর স্তন্য পান করিতেছেন। শ্রীধরের বয়স এই সত্তর বৎসর। প্রত্যহ দুবেলা সেই স্থানে বসিয়া ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণ করিয়াছেন—সে স্থানের সহিত সত্তর বৎসরের আত্মীয়ত'— জননীর ন্যায় সেই স্থান তাঁহাকে পালন করিয়াছেন। শ্রীধর সেই স্থানে জগজ্জননীর রূপ দর্শন করিলেন,—সেই স্থানে জগ-জ্জননীর পালনী শক্তির আবির্ভাব অনুভব করিয়া ভক্তি রসে ডুবিতে থাকিলেন।

আর শ্রীধরের সেই পোষা বিড়াল—সেটা আজ শ্রীধরের আসে পাসে ফিরিতে ফিরিতে শ্রীধরের গায়ে কেবল লেজ

বুলাইতেছে—মাঝে মাঝে শ্রীধরের মুখের দিকে তাকাইতেছে কখন দ্বার হইতে উঠানে নামিতেছে—নামিয়া তখনি আবার উঠিতেছে—উঠিয়া শ্রীধরের পৃষ্ঠ ঘেসিয়া গায়ে লেজ বুলাই-তেছে। শ্রীধর চক্ষু চাহিয়া বিড়ালটার ভাব গতিক দেখিতে দেখিতে কিয়ৎক্ষণ তাহার দিকে তাকাইয়া থাকিলেন। পাতের মাছগুলি সব তাহাকে ধরিয়া দিলেন—দুগ্ধের বাটীটি তার সম্মুখে স্নেহের সহিত ধরিলেন—কিন্তু বিড়াল—কেবল মাত্র মাছ ও দুগ্ধের উপরে মুখ রাখিয়া মুখ উত্তোলন করিল—সরিয়া গেল—আদতে কিছু খাইল না;—কেবল ঘড় ঘড় শব্দ করিতে করিতে কখনও শ্রীধরের কোলে কখন পৃষ্ঠে লেজ বুলাইতে লাগিল, পরি শেষে শ্রীধরের পৃষ্ঠের কাছে গুটি মারিয়া নীরবে শুইয়া মাঝে মাঝে লেজটি আন্দোলিত করিতে থাকিল।

কাদম্বিনী পিতার কাছে বসিয়া পিতাকে খাওয়াইতে বসি-লেন। এটা খাও. ওটা খাও বলিয়া পিতাকে আগ্রহের সহিত অনুরোধ করিতে লাগিলেন। শ্রীধর প্রতিগ্রাসে ভগবানের প্রেম রস আস্বাদন করিলেন। আহার করিবার পর ভগবানকে এই বলিয়া প্রণাম করিলেন হরি! এজন্মে অনেক খাওয়াইয়াছ কিন্তু রক্তে মলিনতা ঘুচিল না, যদি আর কখনও খাওয়াও তো যেন রক্তে পবিত্রতা জন্মে।" শ্রীধর অশ্রুপূর্ণ নয়নে দীপ্তিময় মুখে আচ-মন করিলেন। পৃথিবীতে অন্নাহারের কথা একবারে ভুলিলেন।

আহারাদির পর শ্রীধর বাক্স হইতে একটা বড় চাবি বাহির করিয়া একটা বড় সিন্দুক খুলিলেন। সিন্দুকের ঢাকুনি খুলিবা মাত্র কয়েকটা আরসোলা বাহির হইল। শ্রীধর কতকগুলা পুরা-তন খাতা খুলিয়া হিসাবে বসিলেন—কে কত তাঁর কাছে পায়;

আগে সেই হিসাব করিলেন। তার পর, তিনি কার কাছে কি পান, তার একটা ফর্দ্দ লিখিলেন। তাঁর কাছ হইতে লোকের পাওনা মোটে দেড় শত টাকা সাড়ে বার আনা হইল। কতক টাকা বাক্স হইতে বাহির করিলেন। বাকী টাকার জন্য ভাবিতেছেন, এমন সময়ে কাদম্বিনী আপনার পিতৃদত্ত বালা আপনার বাক্স হইতে আনিয়া দিয়া বলিলেন, ইহা বেচিলে ঠিক পঞ্চাশ টাকা হইবেক—আর মার বাক্সে যা আছে, তাহাতে বাকি টাকার কুলান হইবেক। শ্রীধর বালা লইয়া বেচিতে বাহির হইলেন। বেচিয়া ঠিক পঞ্চাশ টাকাই পাইলেন। কন্যার নিকট হইতে বাকী টাকা লইয়া কয়েক ঘণ্টা এদিক ওদিক ঘুরিয়া, যার যা পাওনা কড়ায় গণ্ডায় পরিশোধ করিলেন। এসব কার্য্য শেষ করিতে অপরাহ্ণ প্রায় পাঁচটা বাজিল।

শ্রীধর বাড়িতে ফিরিলেন। কাদম্বিনী তখন কালীর দাওয়ায় বসিয়া আছেন। কাদম্বিনীর কাছে একটি বুনো শালিক। কাদম্বিনী স্নেহভরে তাহাকে আতপ চাউল খাওয়াইতেছিলেন। সেটি কাদম্বিনীর হাত হইতে নির্ভয়ে চাউল খাইতেছিল। চাউল খাইয়া ফুড়ুৎ করিয়া উড়িয়া একটি নারিকেল গাছের পাতার উপরে বসিল। তখন কাছে একটা আম গাছে একটা ফিঙ্গা বসিয়াছিল। কাদম্বিনী তাহার দিকে হাত বাড়াইয়া 'আয় আয়' বলিয়া ডাকিবা মাত্র সেটা তখনি ফড়ুৎ করিয়া উড়িয়া, একবারে কাদম্বিনীর মাথার উপরে বসিল—বসিয়া কয়েকবার পুচ্ছ নাচাইয়া কাদম্বিনীর জানুর উপরে বসিল। কাদম্বিনী হাতে করিয়া চাউল ধরিলেন্ আনন্দে পাখীটি চাউল খাইতে লাগিল। কাদম্বিনী বুনো পাখীদিগকে স্নেহের রবে এইরূপে ডাকিয়া

খাদ্য দ্রব্য খাইতে দিতেন। বুনো পাখী তাঁর ডাক শুনিত।

পাখীটা—জানুতে বসিয়া কাদম্বিনীর হাত হইতে খাবার খাইতেছিল—হঠাৎ শ্রীধর বাটিতে প্রবেশ করিবা মাত্র, পদশব্দ পাইয়া পাখীটা ফড়্‌ত করিয়া উড়িয়া গেল। কাদম্বিনী উঠিয়া পিতার পিছু পিছু বড় ঘরে উঠিলেন। শ্রীধর কন্যাকে কহিলেন, "সব দেনা শোধ করিলাম—আর কেউ পাবে কি না জানি না—খাতায় পাইতেছি না, মনেও পড়িতেছে না।"

কাদম্বিনী কহিলেন "সাতুর মার যে টাকা তোমার কাছে... গচ্ছিত ছিল—তার দরুণ বাকী পাঁচ টাকা কাল সাতুকে আমি সকালে দেব এখন।" "ঠিক বলেছিস মা" বলিয়া শ্রীধর আনন্দিত হইলেন।

সন্ধ্যাকার্য্যাদি সমাপন হইলে শ্রীধর নৈশ ভোজনাদি করিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিতে ভাবিতে শয়ন করিলেন। কাদম্বিনী তখন কালীর ঘরে—কালীর সম্মুখে ধ্যাননিমগ্না। শ্রীধর শয়ন করিয়া হঠাৎ উঠিলেন। কি একটা ধাঁ করিয়া মনে পড়িয়া গেল, শ্রীধরের বুক কাঁপিয়া উঠিল, কি সর্ব্বনাশ ভাবিয়া শ্রীধর তাড়াতাড়ি কোন স্থানে যাইবার জন্য উদ্যত হইলেন। নামাবলী গায়ে দিলেন। ছড়ি ও লণ্ঠন লইলেন্। বিড়ালটি পায় কাছে ঘুরিতে লাগিল, তার পর বিছানার এক পাশে গিয়া গুড়ি মারিয়া শুইয়া পড়িল। শ্রীধর লণ্ঠনে আলো লইয়া. ছড়ি হাতে, নামাবলি গায়ে; চটি জুতা পায়ে, যাত্রা করিলেন। ঘর হইতে উঠানে নামিলেন। কন্যাকে কালীর ঘরে দেখিয়া আর কিছু বলিলেন না। চঞ্চল প্রাণে কাতর ভাবে দ্রুত চলিলেন। গ্রাম পার হইয়া মাঠে পড়িলেন। তখন মাঠে অন্ধকার, চাঁদ তখন ও

উঠে নাই—আকাশে নক্ষত্র কাঁপিতে কাঁপিতে মিট্‌ মিট্‌ করিতেছে। পশ্চিমাকাশে—কাল মেঘ চোস্ত ভাবে আকাশে—স্থির হইয়া আছে। সেই চোস্ত মেঘে মাঝে মাঝে বিদ্যুৎতরঙ্গ দিগন্তে কাঁপিয়া জ্বলিতেছে ও নিবিতেছে—যেন মেঘ মাঝে মাঝে জ্বলিয়াই নিবিতেছে। শ্রীধর মাঠে দ্রুত চলিলেন—চলিতে চলিতে গায়ে ঘাম বাহির হইতে লাগিল। শ্রীধর তিন ক্রোশ অতিক্রম করিয়া একটী গ্রামে পহুছিলেন। এক জংদের কোটা বাটির দ্বারের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইয়া হাপ ছাড়িলেন। তখন জ্যোৎস্না উঠিয়াছে। রাস্তায় জ্যোৎস্না পড়িয়াছে, সেই দ্বারদেশের সম্মুখে জ্যোৎস্না পড়িয়া হাসিতেছে। গ্রাম নিস্তব্ধ। কেবল পথে দুএকটা কুকুর মাঝে মাঝে ছুটিতেছে। দূরে কুকুরের শব্দ হইতেছে। শ্রীধর বাটির সম্মুখে দাঁড়াইবা মাত্র একটা কুকুর দূর হইতে ঘেউ ঘেউ করিতে লাগিল। শ্রীধর থাম থাম বলিবা মাত্র সেটা থামিল। শ্রীধর দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া প্রবল স্বরে ডাকিলেন, চাটুয্যে মহাশয়! চাটুযো মহাশয়! কোন উত্তর পাওয়া গেলনা। সেই কুকুরটা ভাক ভাক করিয়া ডাকিল মাত্র।

শ্রীধর দ্বারে ধাক্কা মারিয়া ডাকিতে লাগিলেন। চাটুয্যে মহাশয় শাড়া পাইয়া ভিতর হইতে বলিলেন "কেও?"

উত্তর—আমি শ্রীধর ভট্টাচার্য্য।

প্রশ্ন—এত রাত্রে কোথা হতে?

বলিতে বলিতে চাটুযো মহাশয়, হুড়ুৎ করিয়া দ্বার খুলিলেন।

শ্রীধর চাটুয্যে মহাশয়কে আপন লণ্ঠনের আলোকে দেখিবা মাত্র কাঁদিয়া ফেলিলেন, কাঁদিতে কাঁদিতে দুপা জড়াইয়া ধরিলেন। চাটুয্যে মহাশয় চমকিত হইয়া, করেন কি? করেন কি? বলিয়া শ্রীধরের দুহাত ধরিয়া ফেলিলেন।

শ্রীধর কাঁদিতে কাঁদিতে বসিয়া পড়িলেন। বসিয়া কাতর ভাবে বলিলেন, "আমার একটা অপরাধ আপনার কাছে হইয়াছে। সেটার ক্ষমা এতদিন না চাহিয়া ভগবানের কাছে অপরাধী আছি। সেই অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন কি? সেজন্য যেরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে বলিবেন, আমি তাহাই করিব, এখনি করিব। বলিতে বলিতে শ্রীধরের ভাবভরে কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। চাটুয্যে মহাশয়, শ্রীধরের কাতরতা,কথায় পুণ্যস্মর অনুভব করিয়া কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিলেন, "আমাকে এ প্রকারে নরকস্থ করা কি আপনার উচিত। আপনি দেবতা তুল্য ব্যক্তি—

শ্রীধর অশ্রুপূর্ণ নয়নে কাতর স্বরে কহিলেন, আমি বড় বিপদে পড়িয়া এত রাত্রে আসিয়াছি।

চা। কি বিপদ।

শ্রী। আমার অপরাধ হইয়াছে এই বিপদ।

চা। কবে অপরাধ করিয়াছেন, যে আপনার বিপদ?

শ্রীধর তখন কম্পিত স্বরে কহিলেন, দুই বৎসর আগে, বেলপুকুরের জমিদারের সভায় ন্যায়ের তর্কে আপনাকে একটা রুক্ষ কথা বলিয়াছিলাম, তজ্জন্য আপনার কাছে এ পর্য্যন্ত ক্ষমা চাওয়া হয় নাই, এই আমার বিপদ।

চাটুয্যে মনে মনে বড় বিস্মিত হইলেন, তার পর কাঁদিয়া ফেলিলেন। চক্ষের জল মুছিয়া, হৃদয়ের বেগ সম্বরণ করিয়া, চাটয্যে মহাশয় শ্রীধরের দুহাত ধরিয়া কহিলেন, আমার তো কিছুই স্মরণ নাই। আর যদি কিছু বলিয়াই থাকেন, তজ্জন্য আপনার কিছু অপরাধ হয় নাই। আপনি বয়সে জ্ঞানে সর্ব্ব প্রকারে বড়।

শ্রীধর তেমনি মনের ভাবে উত্তর করিলেন, "বয়সে বড় বটে কিন্তু ব্যবহারে বড় ছোট।" শ্রীধর আবার যাতনার সহিত কহিলেন, "এখন যদি আমায় ক্ষমা করেন তো বাঁচি"। চাটুয্যে একটু অপ্রতিভের ন্যায় কহিলেন, "যদি তাহাতেই সন্তুষ্ট হন তো তাহাই হইল"।

শ্রী। তা হলে আমায় ক্ষমা করিলেন তো?

চা। করিলাম।

শ্রী। তবে আমি যাই।

চা। এত রাত্রে যাওয়া হবে না—এই খানেই রাত্রি যাপন করুন।

শ্রী। আমার থাকা হবে না—বিশেষ প্রয়োজন।

শ্রীধর বিদায় হইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শ্রীধর বাড়িতে ফিরিলেন! রাত্রি তখন খানিকটা আছে। গাছে, পালায়, লতায়, পাতায়, ঘাসে, পথে শিশির পড়িয়াছে। জ্যোৎস্নায় আকাশ হাসিতেছে। আকাশ শীতল, পৃথিবী শীতল, —বাতাস শীতল। সেই শীতল রাত্রি, শেফালির শীতল গন্ধে পরিপূর্ণ হইয়াছে। শ্রীধর শীতে কাঁপিতেছেন—কাঁপিতে কাঁপিতে বাটির সম্মুখে আসিলেন—একটা কুকুর শুইয়া ঘুমাইতেছিল। কাদম্বিনী তখনও কালীর ঘরে বসিয়া ধ্যানমগ্না ছিলেন। পিতা বাটীর ভিতরে কাঁপিতে কাঁপিতে প্রবেশ করিবা মাত্র কন্যার ধ্যানভঙ্গ হইল। কন্যা ধীরে ধীরে উত্থান করিলেন। পিতার পিছু

পিছু বস্ত ঘরে প্রবেশ করিলেন। ঘরে আলো জ্বালিলেন। আলো জ্বালিয়া—তাড়াতাড়ি বিছানা করিয়া দিলেন। শ্রীধর তখন কাঁপিতে কাঁপিতে পা, হাত, মুখ, ধুইয়া শুইয়া পড়িলেন। খুব কম্প দিয়া খুব জ্বর বাড়িল। লেপের উপর লেপ তবুও শীত কমে না—খুব কম্প—খুব জ্বর।

রজনী প্রভাত হইল। জ্বর কমিল না—শীত ও কম্প নিবারিত হইল। শ্রীধর জ্বরকে গ্রাহ্য করিলেন না। জ্বরের মধ্যে শ্রীভগবানের চিন্তায় ডুবিয়া জ্বরের যাতনাকে ভুলিয়া গেলেন। চারিদিকে রোদ উঠিল—গ্রামে লোকের শব্দ শুনা যাইতে লাগিল—কিন্তু একজনও শ্রীধরের সে জ্বরের সংবাদ শুনিয়া আসিল না। শ্রীধর বিছানায় এপাশ ওপাশ করিতেছেন, কাদম্বিনী গায়ে হাত বুলাইতেছেন, বিড়ালটা লেপের এক পার্শ্বে শুইয়া ঘড় ঘড় শব্দ করিতেছে।

শ্রীধর কাদম্বিনীকে কহিলেন, "বিড়ালটার তো খাওয়া বন্ধ হয়েছে—আমি মলে এর দশা কি হবে।"

কন্যা কোন উত্তর দিলেন না—চুপ করিয়া পিতার গায়ে হাত বুলাইতে থাকিলেন।

শ্রীধর আবার ধীরে ধীরে কহিলেন, "আমাকে যেন ঔষধ খাওয়াইওনা, মার চরণামৃত আমার পরমৌষধ।" কন্যা আর্দ্র স্বরে কহিলেন, 'তা না তো আবার কি বাবা!' বলিয়াই পিতার গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন। পিতার একটু নিদ্রার আবেশ হইল। সে আবেশে কেবল স্বপ্ন দেখিলেন। কত সাধু যোগী ফকির—কত দেবালয় দেবমূর্ত্তি কত তীর্থস্থল স্বপ্নে দেখিতে দেখিতে ভক্তির জল বর্ষণ করিলেন। যেন শ্রীক্ষেত্র যাইতেছেন

ভক্তিতে কাঁদিতে কাঁদিতে জগন্নাথ মূর্ত্তি দেখিতেছেন, যেন শ্রীক্ষেত্র হইতে কাশী—কাশী হইতে হরিদ্বার। শ্রীধর জীবনে যত তীর্থ দেখিয়াছিলেন সমুদয় দেখিতে লাগিলেন। তীর্থস্থানে অনেক মৃত বন্ধু-বান্ধবদিগকে দেখিলেন। দিনের পর দিন যাইল জ্বর আদতে নিবারিত হইল না—জ্বরের বেগ কমিল বটে কিন্তু জ্বর ছাড়িল না। শরীর ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইতে হইতে শ্রীধরের মৃত্যু দিন উপস্থিত হইল।

শ্রীধর কহিলেন "কাদু! আমার গঙ্গা যাত্রার উপায় কি?" শ্রীধরের চক্ষু দিয়া জল ঝরিল।

কাদম্বিনী স্নেহের স্বরে কহিলেন "বাবা ভয় নাই কেহ না আসে আমি কোলে করিয়া লইয়া যাইব।

শ্রীধর হৃদয়ের আবেগে কহিলেন "কেহ আসিবে না। আমি গরিব—তায় গ্রাম ঐক্য হ'য়ে আমাদের একঘরে করেছে। তবে ভগবান্ আছেন। মা কালীকে ঘরে বাঁধিয়াছি—ভয় আমার কি মা"! শ্রীধর আর অধিক কথা কহিতে পারিলেন না—ভাব ভরে কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। শ্রীধরের দু-চক্ষু বাহিয়া ভক্তির স্রোত ঝরিল। শ্রীধর কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন "না পার তো মার ঘরে আমায় লয়ে চল; আমি মার শ্রীচরণ দেখিতে দেখিতে মার কোলে লুকাইব। মার পদতলে পড়ে আছে গয়া গঙ্গা বারানসী।"

শ্রীধর এইরূপ কত কথা কহিলেন। প্রাণের তলা হইতে ফোয়ারার জলের ন্যায় কত ভক্তির কাহিনী ছুটিল। মৃত্যুশয্যা রোগশয্যা সাধনাশয্যায় পরিণত হইল।

শ্রীধর কহিলেন "মা তুমি গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে যখন

থামিয়েছ তখন তোমার মত কে তোমার কাছে বসিয়া আমার গায়ে যেন হাত বুলাইতেছেন, দেখেছ মা ?

কাদম্বিনী তেজোপূর্ণ চক্ষে পিতার দিকে চাহিলেন হাসিয়া কহিলেন "বাবা ! ভক্তের পীড়া হইলে মা আপনি আসিয়া সেবা করেন।"

সন্ধ্যা আসিল। তখন শ্রীধর আবার কন্যাকে কহিলেন, "মা ! মা-গঙ্গা আমায় ডাকছেন, আমি তাঁর কুলু কুলু ধ্বনি শুনিতেছি।

কন্যা। বাবা ! ব্যস্ত হবেন না, আর একটু পরে লইয়া যাব

শ্রী। একলা পারবি ?

কা। মায়ে ঝিয়ে পারিব না ?

কথাটা শুনিয়া শ্রীধরের ক্ষীণদেহে উৎসাহ ও আশার তেজ ফুটিল। শ্রীধর আবার কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "মা কাদু ! মা গঙ্গা আমার কাছে দাঁড়িয়েছেন, শ্বেত বরণী আমার শিয়রে বসিয়া আছেন. দেখিতেছ না কি" ? শ্রীধরের ভক্তির উচ্ছাস বড় প্রবল হইল—শ্রীধর মুচ্ছিতের ন্যায় হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মুর্চ্ছাভঙ্গ হইলে কাদম্বিনী কহিলেন "বাবা ! মা যখন তোমার শিয়রে এসেছেন, তখন আর ভয় নাই—তোমার গঙ্গালাভ হইয়াছে"।

শ্রীধর কহিলেন "মা ! আর নয়—আমায় লইয়া চল।

কাদম্বিনী অমনি পিতাকে শয্যা হইতে কোলে তুলিলেন। মা যেমন ছেলেকে বুকে ধরে সেই প্রকারে কন্যা পিতাকে বক্ষে ধরিলেন। বিছানায় একখানা মোটা কম্বল ছিল, কন্যা সেইখানা পিতার গায়ে জড়াইয়া দিলেন মাত্র। তার পরে বুকে করিয়া ঘর

হইতে বাহির হইলেন। ঘর হইতে নামিয়া মা কালীর ঘরে গেলেন। পিতা কন্যার কাঁধে মাথা রাখিয়া ইষ্ট মন্ত্র জপিতেছিলেন। কালীর ঘরে গিয়া কন্যা পিতাকে কহিলেন "বাবা! মাকে একবার ভাল করিয়া দেখ।"

শ্রীধর কাঁধ হইতে মাথা তুলিলেন—অনিমেষলোচনে মার দিকে লক্ষ্য করিলেন—দুচক্ষু জলে পুরিয়া গেল—মাথার চুল খাড়া হইল গায়ের লোম খাড়া হইল—ভক্তিতে কাঁপিতে কাঁপিতে শ্রীধর বলিলেন "আমি মাকে ছাড়িয়া আবার কোথায় যাইব! মার কোল ছাড়িয়া আর কোথাও যাব না। কাদু। আমায় কোল হতে নামাও। আমি মার পূজা করি।

শ্রীধরের তখন বলের সঞ্চার হইয়াছে—শ্রীধর মহা উৎসাহে কোল হইতে নামিলেন। কালী মূর্ত্তির সম্মুখে বসিলেন। বসিয়া কহিলেন, কাদু! আমার কাপড়? কাদু অমনি কাপড় আনিয়া পিতাকে পরাইয়া দিলেন। শ্রীধর কাপড় পরিয়া করযোড়ে মার সম্মুখে বসিলেন। বসিয়া কহিলেন, "কাদু!

কা। কেন? আমি দাঁড়িয়ে আছি।

শ্রী। পূজার জবাফুল?

কাদু আগেই জানিতে পারিয়া জবাফুল তুলিয়া রাখিয়াছিলেন। তখনি ফুলের সাজি হইতে একরাশি রাঙ্গা জবা আনিয়া দিলেন।

শ্রীধর পূজা আরম্ভ করিলেন—যে পূজায় কাষ্ঠে সচ্চিদানন্দ প্রকাশিত হন—পাথরে চৈতন্য ফুটিয়া উঠে—যে পূজায় ধূপধুনার গন্ধে পাপীর প্রাণে স্বর্গ হাসিয়া উঠে—যে পূজায় মন্ত্রের আঘাতে মৃত জাতির উত্থান হয়—শ্রীধর সেই জীবন্ত পূজায় বসিলেন। তখন শরীরে আবার তেজ ফুটিল—চক্ষে জ্যোতিঃ

জলিল—নিশ্বাসে বিশ্বাস ছুটিতে থাকিল—মেরুদণ্ড উৎসাহে তেজস্বী হইল। শ্রীধর ভক্তিতে কাঁদিতে কাঁদিতে কাঁপিতে কাঁপিতে এক একটী করিয়া রাঙা ফুল মার রাঙা পায়ে নিক্ষেপ করিলেন। একটি একটি করিয়া, সব ফুরাইল—তখন আপনি ভক্তি প্রেমে কাঁপিতে কাঁপিতে পাদমূলে ফুলের রাশির উপর পতিত হইলেন দু হাতে মার পা জড়াইলেন। কিয়ৎক্ষণ নীরবে ফুলিতে লাগি-লেন—ভক্তিতে গলিয়া গেলেন—এ পৃথিবী ছাড়িয়া চিন্ময় রাজ্যে আপনাকে অনুভব করিতে করিতে—"মা! মা! কালি" আর নয়—শ্রীধরের কণ্ঠরোধ হইল—জগজ্জননীর চিন্ময়ী-মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে আনন্দের হাসি হাসিয়া ভক্ত শ্রীধর মর্ত্ত লোক ছাড়িয়া স্বর্গ-ধামে চলিয়া গেলেন।

কাদম্বিনী অমনি মার সম্মুখে বসিয়া ধ্যান নিমগ্না হইলেন। আত্ম-রাজ্যে প্রত্যাদেশ পাইলেন "আমার শ্রীধরকে আমার পিছনে রাখিয়া দাও—দেহ পুড়াইও না।"

কাদম্বিনী তাহাই করিলেন। পিতার মৃত-দেহ মা কালীর পিছনে সমাধিস্থ করিলেন।

চতুর্থ খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পৃথিবীতে খাঁটি যশ পাওয়া যায় না। যশটা একটু দাগী হইবেই হইবে। যশটাকে পৃথিবীর কুচরিত্র লোকগুলা ঠুকরাইয়া ঠুকরাইয়া কলঙ্কিত করিবেই করিবে। অমন বুদ্ধ, অমন চৈতন্যও কলঙ্কের হাত এড়াইতে পারেন নাই। কবিকুল-চূড়ামণি কালিদাস ও সেক্সপীয়রের নিন্দুকও দেখিয়াছি। তুমি যাহার যতটুকু প্রশংসা কর ততটুকু তোমার নিজের প্রশংসা; আর যতটুকু নিন্দা কর, ততটুকু তোমার নিজের নিন্দা। আমরা অনেক সময়ে বুঝিতে না পারিয়া অনেকের মহত্ত্বের নিন্দাবাদ করি—করিয়া আপনাদের মহত্ত্বতার পরিচয় দি। আমাদের চরিত্রের দোষে অনেক সাধুকে মহাদেবের মত কেবল বিষপান করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। তাঁহারা কেবলমাত্র চরিত্রের বলে সেই হলাহলেই অমৃতাস্বাদন করিয়া অমর হয়েন। তাঁহারা একটুও না হেলিয়া, অটল অচলের ন্যায় সংসারের ঝড় তুফান সহ্য করেন।

কাদম্বিনীর অদৃষ্টে তাহাই ঘটিয়াছিল। কাদম্বিনী প্রথমাবস্থায় ধর্ম্মভাবে স্ববশে থাকিতেন না। পৃথিবীর পারে যখন দেহ ছাড়িয়া যাইতেন, তখন অঙ্গের কাপড় কিছু বিশৃঙ্খল হইত—কাদম্বিনী এলো মেলো হইয়া পড়িতেন। লোকে ভাবিত,

কাদম্বিনী বেহায়া। কাদম্বিনী ভক্তিভাবে কখনও হাসিতেন কখনও কাঁদিতেন; লোকে ভাবিত কাদম্বিনী বড়ই খারাপ। কাদম্বিনী কখন ঘরে, কখন বাগানে, কখন প্রান্তরে কখন জলে, কখন রৌদ্রে;—লোকে মর্ম্ম না বুঝিয়া দুষ্টামি মনে করিয়া তদ্রূপ রটনা করিত।

ধীরেন্দ্র যখন কাদম্বিনীর সংস্পর্শে নরক ছাড়িল—দেশে আর দেখা দিল না, তখন লোকে কাদম্বিনীর ঘাড়ে কোন দোষ চাপাইতে পারে নাই। কিন্তু অনুপমের দেশত্যাগের পর গ্রামে একটা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। গ্রামস্থ লোকে—কাদম্বিনীর নানা কলঙ্কের কথা রটাইল। অনুপমের মা মাসী পিসী একে একে বাটীতে আসিয়া হাত মুখ নাড়িয়া দাঁত খিঁচাইয়া কাদম্বিনীকে যৎপরোনাস্তি গালাগালি দিয়া গেল। অনুপমের পিতা শ্রীধরকে ডাকিয়া বড়ই ভৎর্সনা করিল—অমন মেয়েকে ঘর হইতে তাড়াইবার পরামর্শ দিল। শ্রীধর কথা শুনিল না—গ্রাহ্য করিল না—দেখিয়া গ্রাম ঐক্য করিয়া শ্রীধরকে একঘরে করা হইল। শ্রীধরের অনেক যজমান ছিল; তাহাদের কেহ কেহ শ্রীধরকে ছাড়িল—অনেকে ছাড়িল না। গ্রামে দুদল হইল।

শ্রীধরের স্বর্গ প্রাপ্তির কয়েক মাস পরে কাদম্বিনীর স্বামী অনেক বৎসরের পর দেশে ফিরিলেন।

মহেশ পুরের দুক্রোশ পশ্চিমে বীরহাটা গ্রাম। সেই গ্রামে নিকুঞ্জর বাটী। বাটীতে কেহ ছিলনা। বাটীর উঁচু পোতাটা ছিল মাত্র। পিতা, মাতা, ঘর বাড়ি সব একে একে নিকুঞ্জর বাল্যকালেই অন্তর্হিত হয়। নিকুঞ্জ বাল্যকালে এক জ্ঞাতিখুড়ার অন্নে—প্রতিপালিত হয় যৌবনে বিবাহের পর সেই খুড়ার

সঙ্গে বিবাদ করিয়া গভীর মনোদুঃখে নিকুঞ্জ দেশত্যাগী হয়। বিদেশে কাদম্বিনীর পুণ্যবলে একটী ভাল চাকুরী জুটিয়া যায়। চাকুরী জুটিল কিন্তু চরিত্র খারাপ হইল। কোন বেশ্যার প্রেমে ডুবিয়া নিকুঞ্জ অমন সাধ্বী স্ত্রীকে ভুলিয়া গেল। জগতে সতী স্ত্রীর ভাল স্বামী লিখিতে ভগবান ভুলিয়াছেন বোধ হয়। নিকুঞ্জ বিদেশ হইতে অনেক বৎসর পরে দেশে ফিরিল। নিকুঞ্জ যখন দেশ ছাড়িয়াছিল—তখন শুধু পা—ছেঁড়া কাপড়—গায়ে জামা ছিল না; একখানা মলমলের পুরান উড়নি—মাথায় ভাঙ্গা ছাতা।

এক দিন বেলা তৃতীয় প্রহরের সময়—বীরহাটা গ্রামের সদর রাস্তায় একখানা পাল্কীর শব্দ পাওয়া গেল। নিকুঞ্জর পৈত্রিক ভিটার কাছে সেই জ্যাতিখুড়ার চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখে পাল্কী নামিল। পাল্কীর ভিতর হইতে বুটজুতাপরা মোজাআঁটা দুটা পা বাহির হইল। তার পর কালকোটআঁটা সোনার চেন লাগান ভেড়িওয়ালা এক বাবু বাহির হইলেন। যাঁর বাড়ী তিনি চণ্ডীমণ্ডপের একটী ধারে বসিয়া চকমকী ঠুকিতেছিলেন। লোকটী বুড়া। পাল্কীর শব্দ কাছে শুনিবামাত্র একবার সেই দিকে তাকাইলেন। দেখিলেন একখানা কাল পাল্কী, কয়টা বেহারা, কয়েকজন বালক বালিকা, মধ্যে একজন বাবু—বুকে কাল পোষাকের উপর সোনার চেন ঝক্ মক্ করিতেছে!

বুড়া দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, ভাবিল—কে।

বৃদ্ধ চণ্ডীমণ্ডপের নীচে নামিল। বাবুটী তখন লম্বভাবে দাঁড়াইয়া ঘড়ী দেখিতেছিলেন—কয়টা বাজিয়াছে।

বুড়া একটু থতমত খাইয়া কাছে গিয়া জিজ্ঞাসিল' আপনি কি হাকিম?

বাবুটী একটু হাসিয়া বলিল "কাকা! আমি"

এমন সময়ে পাড়ার দুই একজন মুরুব্বী লোক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ছেলেরা আগেই পাল্কীর সঙ্গে সঙ্গে সেই খানে আসিয়া হাজির হইয়াছিল। ছেলেরা বাবুটীকে আদতেই চিনিতে পারে নাই। মুরুব্বী ধরণের যাঁহারা তাঁহারা চিনিয়া ফেলিলেন। বলিলেন "কেও—নিকুঞ্জ নয়"!

"আজ্ঞে হাঁ!" বলিয়া নিকুঞ্জ প্রথমে খুড়ার পদধূলি গ্রহণ করিলেন। তার পর অন্যান্য গুরুজন দিগকে প্রণাম করিলেন। সকলে দেখিয়া অবাক্! সেই নিকুঞ্জের আজ এই দশা!

খুড়ার আর পূর্ব্বের বৈরীভাব থাকিল না। ঘড়ীর চেইনের চক্‌চকানি দেখিয়াই তাঁহার প্রাণ গলিয়া গিয়াছে। খুড়া অতিশয় স্নেহের ভাবে ভাইপোর হাত ধরিয়া কাঁদ্ কাঁদ্ হইলেন; কহিলেন "এত নিষ্ঠুর হয়েছিলি বাবা"! কাছের লোক দিগের মধ্যে কেহ খুড়ার পূর্ব্ব ভাবের সহিত বর্ত্তমান ভাবের তুলনা করিয়া মনে মনে ভাবিলেন "পয়সায় কিনা হয়"! কথাটা বাড়ীর ভিতরে বিদ্যুতের ন্যায় গিয়াছিল। অমনি শ্রীনাথ চাকর—(সে তখন ভাত খাইতেছিল) তাড়াতাড়ি ভাতের পাথরটা খিড়কী পুকুরে ডুবাইয়া হাত মুখ ধুইয়া দ্রুত আসিয়া বড় ঘরের দাওয়ার উপর একখানা সতরঞ্চি বিছাইয়া দিল। নিকুঞ্জর খুড়ী একটা ভাল ঘটী করিয়া মুখ হাত ধুইবার জন্য জল রাখিয়া দিল। শ্রীনাথ তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া প্রণাম করিল, আর মাঝে মাঝে বাবুর চেইনের দিকে চাহিতে চাহিতে পাল্কীর ভিতর হইতে বাক্স পোঁটলা নামাইতে লাগিল। বাক্স পোঁটলা একে একে শ্রীনাথ অতি যতনে বাটীর ভিতরে বহন করিল। এই

শ্রীনাথ এক সময়ে নিকুঞ্জর দুরবস্থা দেখিয়া কত অপমানের কথা শুনাইয়াছিল—এখন আর সে শ্রীনাথ নাই, এখন যেন বাবুরই বড় সখের চাকর।

এরি মধ্যে পাড়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, বৈদ্যুতিক বেগে গ্রাম-ময় সংবাদটা ছড়াইয়া পড়িয়াছে। রাম চক্রবর্ত্তীর বাটীর ভিতর পাড়ার কতক গুলি স্ত্রীলোক একে একে উপস্থিত হইল। বাহিরে ছেলে, মেয়ে যুবা অনেক হইল। কোন ছেলে বাবুর কাছে ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল,—কোন ছেলে বাবুর কোটটীর গায়ে একবার হাত বুলাইয়া আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিল, অনে-কেই ঘড়ীর চেইনের দিকে চাহিয়া থাকিল। বুড়দের মধ্যে কেহ সেই চকচকে চেন দেখিয়া হিংসায় মরিল। যুবার মধ্যে কাহা-রও সেইরূপ চেইন পরিবার সাধটা জাগিয়া উঠিল। নিকুঞ্জ বেহারা দিগকে বিদায় করিয়া দিলেন। তার পর জুতার মস্ মস্ শব্দে গলা খেঁকুরি দিয়া বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিলেন— কতকগুলা ছেলে পিছনে পিছনে চলিল। নিকুঞ্জ বাটীতে প্রবেশ করিয়াই সম্মুখে খুড়িকে দেখিয়াই প্রণাম করিলেন। প্রণাম করিবার সময় খুড়িমা কাঁদ্ কাঁদ্ হইয়া কহিলেন "খুড়িমাকে মনে পড়েছে"। বলিয়া খুড়িমা আঁচলে চোখ মুছিলেন। কাছে পাড়ার কোন বয়স্কা সেভাব দেখিয়া মনে মনে হাসিলেন এবং এক সময়ে ভাত খাইবার সময়ে নিকুঞ্জকে তাঁহা কর্তৃকই ঝাঁটা মারার কথাটী ভাবিলেন্।

নিকুঞ্জ তার পর মুখ হাত ধুইয়া বিছানায় বসিলেন। শ্রীনাথ তখন অতি ব্যগ্রভাবে বাজারে জলখাবার কিনিতে গিয়াছিল। সে তাড়াতাড়ি এক ঠোঙা খাবার আনিয়া হাজির করিল।

নিকুঞ্জর এক খুড়তুত বোন (যে নিকুঞ্জ বাড়ী ছাড়িলে, হাড় জুড়াল, বলিয়া হাঁপ ছাড়িয়াছিল) একটা রেকাবে সাজাইয়া দাদাকে খাবার খাইতে দিল। নিকুঞ্জ খাবার খাইতে আরম্ভ করিলেন। ছেলে গুলা একদৃষ্টে সেই দিকে চাহিয়া থাকিল। নিকুঞ্জ যখন খান কতক খাইয়া জলের গ্লাশে হাত দিলেন তখন ছেলে গুলার একটু আশা হইল। নিকুঞ্জ জলের গ্লাশ বাঁ হাতে ধরিয়া পাতের অবশিষ্ট মিষ্টান্ন একে একে ছেলে গুলাকে বণ্টন করিয়া দিলেন। ছেলে গুলার বড় আনন্দ—নিকুঞ্জর খুড়ি ও বোন কিছু বিরক্ত। ছেলে গুলাকে প্রফুল্লমনে খাইতে দেখিয়া খুড়িমা খরদৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকাইতে থাকিলেন। যখন খুড়ি দেখিলেন, ছেলে গুলা খাইয়া আবার দাঁড়াইয়া আছে—আগতে নড়েনা—তখন খুড়ি মুখ বাঁকাইয়া প্রকাশ্যে কহিলেন, "আর কেন—খাওয়া তো হ'ল এখন ঘরে যানা" আর মনে মনে কহিলেন "যমের অরুচি"।

শ্রীনাথ জল খাবার দিয়া তাড়াতাড়ি একখানা খ্যাপলা জাল লইয়া পুকুরে মাছ ধরিল। নিকুঞ্জ আহারাদি করিয়া বিশ্রাম করিল। নিকুঞ্জর খুব আদর যত্ন হইল। খুড়ার পুকুরের মাছ দিন দিন কমিতে লাগিল। নিকুঞ্জ আসিয়াছে অনেক টাকা আনিয়াছে—রাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমণ্ডপে আর লোক ধরেনা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অনুপম কাদম্বিনীর আদেশানুসারে দেশত্যাগ করিয়াছিল। দুই বৎসরের জন্য দেশছাড়া হইয়াছিল। সেই রজনীতেই গ্রাম

ছাড়িয়া অন্যত্র যাইয়াছিল। দুই বৎসর অতিবাহিত হইলে গৈরিক বসন পরিধানে গ্রামে প্রবেশ করিল। আপন বাটিতে যাইল না। কাদম্বিনীর বাটিতেই আশ্রয় পাইল। অনুপমের পিতা, মাতা, স্ত্রী, শ্বশুর, সকলে অনুপমকে ঘরে আনিবার জন্য কত কান্নাকাটি করিতে লাগিল। কিন্তু অনুপমের হৃদয় কিছু-তেই সেদিকে ঝুঁকিল না। অনুপম কাদম্বিনীর বাটিতে কালীর ঘরে থাকিত—কালীর প্রসাদ খাইত। কালীর পূজার পুষ্প চয়ন করিত--কালীর ঘর পরিষ্কার করিত—কাদম্বিনী যাহা বলিত প্রাণপণে তাহা সম্পন্ন করিত।

অনুপম যে ধর্ম্মভাবে পবিত্র-হৃদয়ে কাদম্বিনীর কাছে থাকিয়া আপনার মুক্তির পথ পরিষ্কার করিতেছে, গ্রামের লোকে তাহা বুঝিল না। লোকে দুজনের নামে বদনাম রটাইতে লাগিল। শ্রীধর কন্যার জন্য গ্রামে পূর্ব্ব হইতেই এক ঘরে হইয়াছিল।

অনুপম যখন কাদম্বিনীর পবিত্র আশ্রমে, স্বর্গসুখ সম্ভোগ করিতেছিল, তখন কাদম্বিনীর স্বামী নিকুঞ্জ, বিদেশ হইতে স্বদেশে আসিল। নিকুঞ্জ দেশে আসিয়াই স্ত্রীর কলঙ্কের কথা শুনিল—ক্রোধে অধীর হইল, কিন্তু হাঙ্গাম না করিয়া পুনরায় বিবাহ করাই শ্রেয়ঃ বোধে বিবাহের যোগাড় করিতে লাগিল।

নিকুঞ্জ দেশে আসিয়া কোটা করিল—নূতন বাগান তৈয়ার করিল—পুকুর কাটাইল—নানাপ্রকারে অর্থব্যয় করিতে লাগিল। নিকুঞ্জ দেশে আসিয়া খুব বাবুগিরি করিতে লাগিল।

একদিন মহেশপুরে বেড়াইতে বেড়াইতে প্রমীলাকে পদ্মদীঘিতে স্নান করিতে দেখিয়া, তাহাকে বিবাহ করিবার

জন্য নিকুঞ্জ ব্যাকুল হইল। তখন প্রমীলার বয়স প্রায় পনর বৎসর হইয়াছে। পিতা বিবাহ দিতে পারে নাই। প্রমীলার সেই নবযৌবনের মুনি-মনোহারিণী মূর্ত্তি দেখিবামাত্র নিকুঞ্জ বিবাহ করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিল। সে মূর্ত্তি দর্শনে অনেকের মন মাতিয়া উঠিত। পাঠক পাঠিকা প্রমীলার সে নবযৌবনের একটু বর্ণনা শ্রবণ করুন:—

প্রমীলার অবয়ব হইতে বাল্য আপনার লীলা লইয়া, নবোদ্গত-কুসুম-কলিকায় প্রস্থান করিলে, সৌন্দর্য্য নামে এক স্বর্গজ্যোতি, প্রস্ফুটিত গোলাপ, কমল ও পূর্ণচন্দ্রিকার অন্তিম দশা আগত প্রায় দেখিয়া, প্রমীলার কোমলাঙ্গে আপনার প্রাণারাম লীলাক্ষেত্র নির্দ্দেশ করিল। প্রমীলা তাহাতে কোন বাধা দিল না। সেই পদার্থ যৌবন নামে অভিহিত হইল। যাহা নিশীথশেষে পূর্ব্বাকাশ ভেদিয়া উষার মৃদুহাস্যরূপে প্রকটিত হয়; কুসুমের অঙ্গে কান্তিরূপে সঞ্চরণ করে; নীল জলের তরঙ্গ তরঙ্গে কৌমুদীরূপে বিহার করে; বালকের অধরে কচি হাসির লহরে ফুটিতে থাকে; ইন্দ্রধনুর সর্ব্বাবয়বে ভুবনমোহন রূপে উথলিয়া উঠে;—সেই পদার্থই যৌবনরূপে প্রমীলার সর্ব্বাঙ্গে উছলিয়া উঠিল। যৌবনরূপী সেই শোভা, প্রমীলার বক্ষ-স্পর্শে প্রকৃতির ঐন্দ্রজালিক গুণে, স্বর্গাকারে ঘনীভূত ও উন্নত হইলে, লোকের নিকট 'স্তন' নামে অভিহিত হইল। জগতের মধ্যে যাহা কোমল, যাহা উন্মাদক, যাহা প্রাণপ্রদ, যাহা সুখস্পর্শ, সে সমুদয়ই যেন আপনাদের বাস্তুভিটা ছাড়িয়া, সেই ঘনীভূত লাবণ্য রাশিতে আপনাদিগকে মিশাইয়া এক অপূর্ব্ব পদার্থের সৃষ্টি করিতে লাগিল। জগতের কবি, দেবতা, সাধু, অসাধু

সকলে যেন আর সব সৌন্দর্য্যকে অগ্রাহ্য করিয়া সেইদিকে চাহিয়া, আত্মহারা হইবে বলিয়া, মহাকবি বিধাতা প্রমীলার বক্ষ স্বর্গে দুটি স্তনরূপী স্বর্গচূড়া রচনা করিতে লাগিলেন। যেমন ভূতলে পর্ব্বতচূড়া তেমনি বক্ষস্বর্গে স্তনচূড়া।

প্রমীলা যৌবনের নিঃশব্দ পদসঞ্চার শুনিতে না পাইলেও যৌবন সমাগমে পৃথিবীতে নবভাবাবলীতে বিভোর হইতে লাগিল। বসন্তপবনে, কোকিল স্বরে, নূতন স্পর্শ, নূতন আরাম ও উদ্দীপনা এবং হৃদয়ের নবনৃত্য দেখিয়া বিস্মিতা হইল। আপনার হৃদয় প্রাণে আর একটি হৃদয় প্রাণ জীবনের মত মিশাইয়া পৃথিবীকে সঙ্গীতময় করিতে অভিলাষ হইতে লাগিল। আগে তাহা হইত না। প্রমীলা একটি নূতন জগৎ অনুভব করিতে লাগিল। আগে যে গানে, সুরে, শব্দে, দৃশ্যে প্রাণ ভিজিত না, এখন ভিজিতে লাগিল। আগে যাহাতে লজ্জা হইত না, এখন তাহাতে দিন দিন লজ্জা সরম বাড়িতে থাকিল। আগে যে সকল বালকের সহিত বাল্যক্রীড়া করিয়াছিল, এখন তাহাদিগকে দেখিলে মুখ হেঁট করিতে লাগিল। প্রমীলাকে দেখিলে পথের যুবা তাকাইয়া থাকে, আগে থাকিত না;—প্রমীলা ইহা ভাবিতে ভাবিতে কখন মুচকিয়া হাসে—কখন রাগে।

যৌবন প্রমীলার সর্ব্বাঙ্গে নূতন উত্তাপ সময়ে সময়ে ছড়াইতে লাগিল; শিরায় রক্তস্রোতে নূতন বিদ্যুৎ মিশাইতে থাকিল রোমাবলীকে আনন্দ বিস্ময়-লজ্জা স্পর্শে সিহরিতে উপদেশ দিল। অধরের হাসি রাশিতে ভুবন ভুলান নিরব গান গাহিতে উপদেশ দিল—অঙ্গ ভঙ্গিমায় বায়ু প্রবাহে মাধুরী ঢালিতে,

মানুষের দৃষ্টিপথে স্বর্গ কুসুমাবলী বিস্তার করিতে উপদেশ দিল। প্রমীলার বাল-স্বরে মধুরতা একটু তীক্ষ্ণ—উন্মাদক ভাব ধরিল। আগে বালিকা-স্বরে মানুষের প্রাণ বিগলিত হইত; এখন সে স্বর বিগলিত উদ্দীপ্ত করিতে নূতন ভাব ধারণ করিল। সে স্বরে এখন প্রণয়-মন্ত্র-পাঠের সামর্থ্য আসিল। প্রমীলার চাহনি একটু তেজোময়—মর্ম্মভেদী ভাব ধরিল। সে চাহনীতে এখন একটু নূতন ধার হইল—তাহা মানুষের পাঁজর কাটিয়া প্রাণ কাটিতে সক্ষম। অস্ত্র যেমন কাটে, কিন্তু জানেনা, প্রমীলার সে দৃষ্টি সেইরূপ মানুষের হাড়—পাঁজর—হৃদয় কাটিত, কিন্তু জানিত না। যৌবনের প্রথম সমাগমে প্রমীলার এ সবে হুঁস হয় নাই; কিন্তু যত যৌবনের চাপ অস্তিত্বে—বিশেষতঃ বক্ষদেশে ও নিতম্বে—অনুভূত হইতে থাকিল, ততই প্রমীলার নূতন প্রণয়ের অভিজ্ঞান জন্মিল।

নিকুঞ্জ সে যৌবনসৌন্দর্য্যে যে অভিভূত হইবে আশ্চর্য্য কি? বিশেষতঃ যখন সরোবর-জলে সেই রূপ-রাশির জলকেলি হইতেছিল, তখন যে নিকুঞ্জর মাথা ঘুরিয়া যাইবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি?

নিকুঞ্জ প্রমীলার পিতার নিকট বিবাহ করিবার ইচ্ছা লোকদ্বারা প্রকাশ করিল। "নিকুঞ্জবাবু এক পয়সা না লইয়া বিবাহ করিবে," শুনিয়া প্রমীলার পিতার আনন্দের পরিসীমা থাকিল না। বিবাহে উভয় পক্ষই সম্মত হইল। ১৫ই শ্রাবণ বিবাহের দিন স্থির হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

-ঃ[০]ঃ

রাখালচন্দ্র পাটনায় গিয়া নামমাত্র কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছিল। প্রমীলা-ধ্যান সেখানে বাড়িল। বুদ্ধি, স্মৃতি প্রভৃতি মনোরাজ্যের যাবতীয় বিভাগে প্রমীলা শাসন-কর্ত্তৃ হইলেন। অন্তরে এমন ভাব উঠিত না, যাহাতে প্রমীলার ছাব নাই; কোন ভাবে প্রমীলার শোভা, কোন ভাবে প্রমীলার হাসি, কোন ভাবে লজ্জা, কোন ভাবে প্রেম, কোন ভাবে আলিঙ্গন, কোন ভাবে লোমাঞ্চকারী অমৃতসঞ্চারী চুম্বন, রাখালের হৃদয়ে লীলা করিতে লাগিল। রাখালের কাছে সংসারের যাবতীয় পদার্থ স্বচ্ছতাগুণে ভূষিত হইল। সকলের ভিতরে রাখাল প্রমীলার ছবি দেখিতে লাগিল। মহেশপুরের প্রমীলাভবনে প্রমীলামূর্ত্তিকে পথের পাহাড়, বন, নদী ভেদ করিয়া দেখিতে থাকিল! কেবল জাগ্রতে বিচ্ছেদ হইত বটে, কিন্তু রাত্রে স্বপ্নযানে আরোহন করিয়া প্রমীলা রাখালের বাসনা পূর্ণ করিতে লাগিল।

একদিন শ্রাবণ মাসে প্রাতঃকালে উঠিয়া, রাখালচন্দ্র পোষ্টাফিসের দিকে গমন করিল। পূর্ব্ব রাত্রে স্বপ্নে একখানি চিঠি পায়, সেই চিঠিখানি স্বপ্নভঙ্গে বিছানায় হারাইয়া ফেলে। যদি সেখানি দুষ্টামি করিয়া পোষ্টাফিসে গিয়া থাকে; সেই অনুসন্ধানে রাখাল পোষ্টাফিসে চলিল। পথে পত্রবাহকের সহিত সাক্ষাৎ হইল, পত্রবাহক একখানি পত্র দিল। পত্র পাইবামাত্র রাখাল একটী আনন্দের দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িল।

পত্রের উপরে প্রণয়মসীতে প্রমীলার হস্তাক্ষর ; যেন রাখালের কাছে স্বর্গরাজ্য উদঘাটিত হইল। রাখাল উপরের লেখা কত বার পাঠ করিয়া পত্রখানি খুলিল। তার পর পড়িতে লাগিল।

সেবিকা শ্রীমতী প্রমীলাসুন্দরী দেবী।

আমাকে ভুলিয়াছ বলিয়া বোধ হয়। সেই তোমার ছেলে-বেলার—খেলাঘরের স্ত্রী—প্রমীলার আজ মহা বিপদ উপস্থিত। লোকের চান্দ্রায়ণের আয়োজনে যেরূপ মনের ভাব হয়, আমার সেইরূপ হইয়াছে। আমার মহাপাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য, বাবা বিবাহের আয়োজন করিয়াছেন। ১৫ই শ্রাবণ রাত্রিতে তোমার প্রমীলা দাসীর যমালয়ে প্রবেশ হইবে। কাদম্বিনীর স্বামী—শ্রীধরের জামাই—নিকুঞ্জ যমদূত, তার হাতে আমায় হাত রাখিয়া বসিতে হবে। যে হাত তোমাকে জন্মের মত তোমার সেবার জন্য উৎসর্গ করিয়াছি—তাহা কি প্রকারে পরপুরুষের হাতে রাখিব, তাহা ভাবিতে ভাবিতে মৃতপ্রায় হইয়াছি। কয়দিন হইতে আমার আহার নিদ্রা নাই। জাগ-রণে স্বপনে তোমাকে দেখি। বিধাতা যদি স্বপ্নের সৃষ্টি না করিতেন তো, এত দিনে মরিতাম।

এখন আমার উপায় কি হবে? আমায় সে দিন রাত্রে কে রক্ষা করিবে? আমার এ বিপদে কি বন্ধু কেহ নাই? আমি রাত দিন, ভগবানকে ও তোমাকে ডাকি। আমার বিপদের কথা আর কেহ বুঝিবে না। তুমি যদি আমায় না ভুলিয়া থাক, তো ১৫ই শ্রাবণ—দিবসে, মহেশপুরে উপস্থিত থাকিতে চাও। যদি সে দিন তোমায় না দেখি, রাত্রে গলায় দড়ি দিব,

বা জলে ডুবিব, বা বিষ খাইয়া মরিব। আর কি লিখিব। আমার ধর্ম্ম তুমি না রক্ষা করিলে আমায় কাজেকাজেই মরিতে হবে। ইতি।

তোমার প্রমীলা।

পত্র পাঠ করিয়া রাখাল কাঁদিতে লাগিল। রাখাল সেই দিনই যাইবার জন্য অস্থির হইল। ভাবিতে লাগিল, প্রমীলা আমায় বাস্তবিক ভাল বাসিয়াছে। আমি প্রমীলাকে এ বিপদে কি প্রকারে রক্ষা করিব? আমি যদি দেশের জমিদার বা রাজা হইতাম, তো লোক-বলে গ্রাম শাসন করিয়া প্রমীলাকে বুকে রাখিয়া প্রণয়-সুখ দানে সুখী করিতাম। আমার অবস্থা আজ সেরূপ নয়। আমি সামান্য লোক। রাখাল আবার ভাবিল, বিবাহ এখনও হয় নাই। বিবাহ হইলে কি আমার প্রতি প্রমীলার এভাব থাকিবে? রাখাল আপনার সন্দিগ্ধ-চিত্ততায় একটু দোলায়মান হইয়া একটু মনে যাতনা পাইল। আবার ভাবিল, "প্রমীলার চিন্তা আমার শরীরে অমৃত বর্ষণ করে, ভাবিলেই যেন প্রমীলাকে স্পর্শ করিতেছি বোধ হয়, আমার চ'খে স্বপ্নের মত কি ভাসিতে থাকে। আজ ছয় মাস প্রমীলাকে চক্ষে দেখি নাই. তথাপি সেরূপ—গোলাপের গন্ধে পরিপূর্ণ হইয়া আমার প্রাণে এক নব জগতের রচনা করিতেছে। মনে হয় যেন এজগৎ ছাড়িয়া আমি প্রমীলা-জগতের অধিবাসী হইয়া পড়িয়াছি। আমার প্রমীলাকে আর এক জন পথের লোক স্ত্রীভাবে স্পর্শ করিবে? আমি তাহা হইতে দেবনা।" রাখাল এই সময়ে ক্রোধে উন্মত্ত হইল। গাত্র দিয়া যেন অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ ছুটিতে লাগিল। রাখাল মনে মনে বলিল, "পাপিষ্ঠ

নিকুঞ্জ—না আর ভাবিতে পারি না, আজই আমি যাব। আজ মাসের ১৩ই ; আজ যাত্রা করিলে কাল পঁহুছিব। বিবাহের পূর্ব্ব দিন রাত্রে, প্রমীলাকে বুকে করিয়া অজ্ঞাতদেশে প্রস্থান করিব। না হয় ভিক্ষা দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করিব।

রাখাল বাসায় ফিরল। পিতাকে কিছু মাত্র বলিল না। পিতা আপিসে যাইলে. রাখাল পিতার অজ্ঞাতে দুটার ট্রেণে রওনা হইল।

ট্রেণের গতিকে রাখাল মনে মনে অনেক গালিবর্ষণ করিল। ট্রেণ বড় আস্তে যাইতেছে—রাখালের ইচ্ছা ট্রেণখানা আধ ঘণ্টায় হুগলিতে পঁহুছায়। মনে মনে মনোরথের প্রসংশা কলের গাড়ি আবিষ্কার-কর্ত্তার বুদ্ধির নিন্দা করিতে করিতে যাত্রা করিল। আবার ভাবিল, যদি ট্রেণ না থাকিত তো কি হইত? ষ্টিফেনসন সাহেব না জন্মিলে প্রমীলার দশা কি হইত? ষ্টিফেন-সন বুদ্ধিমানই ছিল। তবে এমন লোক জন্মিতে পারে, এক ঘণ্টায় এক শত ক্রোশ যাইতে পারে—এমন ইঞ্জিন প্রস্তুত করিবে। এইরূপে ভাবিতে ভাবিতে কখন মনোরথে আরোহন করিয়া প্রমীলার বাটীতে যাইল, প্রমীলাকে ডাকিল—প্রমীলার বিবাহের আয়োজন বন্ধ করিল; নিকুঞ্জকে বিবাহ সভায় অপমান করিতে লাগিল—তাহাকে দ্বীপান্তর পাঠাইবার উপায় করিল। গাড়ি খানি বেশ যাইতেছিল, "আসেন্সোলে" আসিয়া একবারে এক দিনের জন্য থামিল। রাখাল কারণ অনুসন্ধানে জানিল, ওদিকের লাইন বন্ধ ; একখানা মালগাড়ি উল্টিয়া পড়ায় পথ বন্ধ হইয়াছে। তখন রাখাল দুঃখে রাগে রাস্তার ইঞ্জিনিয়ারদিগকে মনে মনে তীব্র তিরস্কার করিতে

লাগিল। এক জনের সহিত উচ্চ ভাবে আলাপ করিতে থাকিল ; এসকল মূর্খ লোকদিগের বদলে যাহাতে ভাল লোক ভর্ত্তি হয়, তজ্জন্য খবরের কাগজে জোরে প্রবন্ধ লেখা উচিত— আর ভাল ড্রাইভার কি পায়না ! ব্যাটারা মদ খেয়ে সর্ব্বনাশ করে ! সে দিন যাত্রীদিগকে "আসেনসোলে" থাকিতে হইল। রাখালচন্দ্র বাধ্য হইয়া থাকিলেন ; কিন্তু সমস্ত দিনই মনের জ্বালায় রেলের কর্ম্মচারীদিগকে গালিবর্ষণ করিতে ছাড়েন নাই। আর এক ভদ্রলোক নূতন শ্বশুর বাড়ী যাইতেছিল, তার সহিত রাখালের খুব আলাপ হইয়াছিল। সে ব্যক্তি রাখালকে বলিল, "আমার খুড়া "নিরবে" প্রবন্ধ লিখেন, তাঁহা দ্বারা এবিষয়ের শ্রাদ্ধ করাইব—যাহাতে রাস্তা ভাল থাকে— এরূপ বন্দবস্তর জন্য তিনি প্রবন্ধ লিখিলে বিলাত পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিবে।"

রাখাল ১৩ই শ্রাবণ রেলে চড়ে। পথে বিলম্বের দরুণ হুগলি পঁহুছিতে অনেক বিলম্ব হইল। ১৫ই শ্রাবণ সন্ধ্যার পর প্রায় রাত্রি ১০টার সময় হুগলিতে পঁহুছিল।

ষ্টেশনে নামিয়াই রাখাল দ্রুতবেগে গ্রামের দিকে চলিল। রাখাল কখন দ্রুত চলিল, কখন ছুটিতে লাগিল ! যাইতে যাইতে রাখাল প্রমীলার চাপে হৃদয় ফাটাইয়া কাঁদিতে থাকিল। আসন্নবিপদের প্রাণান্তকদংশন সহিতে সহিতে রাখাল চলিতেছে। দুই ক্রোশ রাস্তা কুড়ি ক্রোশ বলিয়া বোধ হইল। চলিতে চলিতে গ্রামের কাছে উপস্থিত হইল। গ্রাম দেখিবামাত্র রাখালের প্রাণের ভিত্তিভূমি বিদীর্ণ করিয়া, দুঃখের উপর দুঃখের মহা বন্যা মহা উচ্ছ্বাস লইয়া উপস্থিত হইল। রাখালের শিরা ও অস্থি

সকলকে যেন ভীমশক্তিতে চাপ দিতে লাগিল—জীবন ফাটিবার উপক্রম হইল। রাখাল ভাবের সাগরে যেন সন্তরণ করিতে করিতে চলিল। পদ্মদীঘির ভিতর দিয়া রাস্তা! পদ্মদীঘিতে উপস্থিত হইবামাত্র সে স্থানে প্রমীলার জীবনের মধুময় কুসুম সকল সৌন্দর্য্যে উথলিয়া চারিদিকে ফুটিতে লাগিল। কোন স্থানে প্রমীলার হাসি ঘুমাইতেছিল—ক্রন্দনের ধ্বনি লুকাইয়া ছিল—মধুমাখা কথা সকল সরোবরতরঙ্গস্বরে মিশিয়াছিল; সে সব যেন রাখালের পদশব্দে জাগ্রত হইল—প্রমীলার বিপদের কথা জানাইতে লাগিল। রাখালের পা কাঁপিতে থাকিল—মাথা যেন ঘুরিয়া পড়িল—গ্রামে প্রবেশ করিতে ভয় হইল। তখন রাত্রি দশটা বাজিয়াছে। গ্রামে প্রবেশ করিয়াই বিবাহের জনরব শুনিল—বাজি পুড়িতেছে—বোমের শব্দ হইতেছে। শুনিয়া রাখাল যমসদনে প্রবেশ করিতে লাগিল। গ্রামের একজনকে দেখিয়াই জিজ্ঞাসিল, হাঁগা! বিবাহ হয়ে গেছে কি? রাখাল উত্তর পাইয়াও বুঝিল না—দ্রুতবেগে চলিয়া গেল। বরাবর প্রমীলাদিগের গৃহাভিমুখে তীরবেগে চলিল। আপনাদিগের বাটির কথা—মার কথা একবার মনে আসিয়াই পলায়ন করিল। সে মস্তিক, হৃদয়, তখন প্রমীলা মদিরায় ফুটিতেছে—রাখাল তখন প্রমীলানেশায় আত্মহারা! প্রমীলার জন্য আগুণে—জলে—হলাহলে মরিতে প্রস্তুত। রাখাল পাগলের ন্যায় দিশেহারার মত চলিয়াছে। রাখাল প্রমীলার জন্য উন্মত্ত, অথচ প্রমীলা যেন তার স্পর্শে—নয়নে—কর্ণে প্রতি নিশ্বাসে প্রেমমাধুরি লইয়া অমৃত লেপন করিতেছে।

রাখাল অবশেষে, প্রমীলাভবন দেখিল; সম্মুখে আলো জলি

তেছে—কয়েকজন ভদ্রলোক গোলমাল করিতেছে—একটা কুকুর শুইয়া আছে! আগে যে বাটী দেখিলে রাখালের হৃদয়ে অমৃত স্রোত প্রবাহিত হইত, চারিদিক কুসুমশোভিত বলিয়া বোধ হইত; আজ সেই বাটী যেন যমপুরি—ভীষণ কারাগার বলিয়া বোধ হইল—প্রমীলা সেই কারাগারে বন্দিনী। রাখালের জীবনোদ্যানে কুসুম সকল শুকাইয়াছে—কে যেন রাখালের স্বর্গ ভাঙ্গিতেছে।

রাখাল বাটীর সম্মুখে আসিয়াই, ধীরে ধীরে পা ফেলিতে লাগিল—যেন অগ্নিরাশি ভেদ করিয়া যাইতেছে। দ্বারদেশে পদার্পণ করিবামাত্র বিপিনের সহিত সাক্ষাৎ হইল। বিপিন জিজ্ঞাসিল বরাবর নাকি? রাখাল কোন উত্তর দিল না—গ্রাহ্য করিল না। উন্মাদের মত একবার কেবল বিপিনের দিকে তাকাইল মাত্র; তার পর সভার দিকে চলিল। দেখিল সে যমসভায় যম। রাখালের অস্থিতে বারুদ জ্বলিল। রাখাল আপনার পিস্তলের জন্য অস্থির হইল। অনেকে অনেক কথা জিজ্ঞাসিল—প্রমীলার আত্মীয়গণ আদর অভ্যর্থনা করিল—সকলেই বসিতে বলিল। রাখাল বসিল না—কাহারও কোন কথার উত্তর দিল না—কেবল ইতস্ততঃ পাগলের মত তাকাইল মাত্র। জ্বলিতে জ্বলিতে আপনার বাটীর দিকে চলিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

রাখাল আপনার বাটির দ্বারদেশে উপস্থিত হইল। রাখাল তখন কাঁপিতেছে, গায়ে ঘাম ছুটিতেছে—নিশ্বাসে যেন আগুণ জলিতেছে! রাখাল দ্বারদেশে গিয়া একবার দাঁড়াইল—চখের জল ফেলিল—হাত মুষ্টি বদ্ধ করিল। রাগে দুঃখে মনোলোভে বুকের পাঁজরা ভাঙিতে ভাঙিতে রাখাল ভাবিল—এখন উপায় কি? সে প্রশ্নে রাখালের অস্তিত্ব যেন ভাঙ্গিবার মত বোধ হইল, রাখালের কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। সেই ভাবে অবনতমুখে রাখাল বাটির ভিতরে চলিল। ভারি গম্ভীর রুক্ষ স্বরে মাকে ডাকিল! মা মহা আনন্দে ঘরের দ্বার খুলিয়া দিলেন। মা জিজ্ঞাসিলেন—কিরে? সব ভাল তো? আজ এলি যে?

রাখাল কোন উত্তর করিল না—কাঁপিতে কাঁপিতে ফুলিতে ফুলিতে বলিল, "সিন্ধুকের চাবি দাও।"

ছেলের ভাব গতিক দেখিয়া মা হতবুদ্ধি হইলেন, ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসিলেন "কিরে? আমার কথার উত্তর দিস না কেন? সব ভাল তো? রাখাল বিরক্তির সহিত কহিল, সব ভাল এখন আমায় শীঘ্র চাবি দাও!

মা! রাত্রে চাবির কি দরকার?

রা। দরকার আছে।

মা। পাগল হলি নাকি? মুখ হাত ধো,

রা। শিগগির চাবি দাও।

মা। কেন? চাবি এখন কেন?

মা। তোমার শ্রাদ্ধ করিব তাই।

হঠাৎ রাখালের মস্তিষ্ক ঘুরিয়া উঠিল—রাখাল ঘুরিয়া পড়িবার মত হইল। দুহাতে মাথা চাপিয়া বসিয়া পড়িল। অনেক কষ্টে অবস্থার নির্য্যাতন সহ্য করিতে করিতে যাতনাপূর্ণ ভাষায় বলিল "মাথা ঘুরছে—মাথায় জল দাও।" বলিয়াই রাখাল কাঁদিয়া ফেলিল। জননী অতটা বুঝিলেন না। জননী মাথায় জল দিতে দিতে নিকটবর্ত্তী ঘর হইতে রাখালের পিশীকে ডাক দিলেন। রাখাল নিষেধ করিল, খবর দার ডাকিওনা—ব্যারাম বাড়িবে, এখন শীঘ্র চাবি দাও।

পুত্রের ভাব গতিক দেখিয়া জননী অতিব্যস্তভাবে সিন্ধুকের চাবি আনিয়া দিলেন। চাবি দিয়া জননী বৃদ্ধা কালা ননদকে উঠাইতে গেলেন। রাখাল তাড়াতাড়ি সিন্ধুক খুলিয়া পিস্তল হাত গত করিল। একটা বাক্স হইতে ক্যাপ ছ্যাটরা, বারুদ হস্ত গত করিল। পকেটে ছ্যাটরা, বারুদ, ক্যাপ, রাখিয়া—বগলে পিস্তল লইয়া "মা আমি বে বাড়ি চল্লাম" বলিয়া দ্রুত বাটির বাহিরে ধাবিত হইল।

রাখাল বাটির বাহিরে আসিয়া পিস্তল ধাসিল। বগলের নিম্নে পিস্তল রাখিয়া গায়ে চাদর এমনি মুড়িল যে কেহ পিস্তল না দেখিতে পায়।

রাখাল সেই ভাবে বিবাহ বাটিতে চলিল। পথে পার কাছে, কুকুর ডাকিল রাখাল তার পৃষ্ঠে প্রবল বেগে পদাঘাত করিল কুকুর ঘেউ ঘেউ করিতে করিতে দ্রুত পলায়ন করিল। রাখাল বিবাহ বাটিতে প্রবেশ করিল। রাখালকে দেখিয়া একজন বলিল "রাখাল যে?" রাখাল সে কথা শুনিয়াও শুনিল না। রাখাল

তার প্রশ্নে বিরক্ত হইয়া বিবাহ স্থলে চলিল—তখন বর বিবাহ সভা হইতে উঠিয়াছেন! রাখাল বিবাহক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। বিবাহ স্থল নানা বিঘ্নসঙ্কুল অরণ্যের মত রাখালের নিকট প্রতীয়মান হইল। বিবাহ স্থলে জনতা দেখিয়া রাখালের প্রাণ আতঙ্কে, রাগে, প্রতিহিংসায় কাঁপিয়া উঠিল। বিবাহের বর—দান সামগ্রী—আলপোনা প্রভৃতি দেখিয়া রাখাল বাঘের মত ফুলিতে লাগিল—মাথার যন্ত্রণায় যেন জগৎ ভাঙ্গিয়া পড়িল। রাখাল চেলির কাপড় পরা বরের দিকে চাহিয়া দেখিল—যেন কালকূটপূরিত সর্প তার প্রমীলাকে গ্রাস করিবার জন্ত ফণা তুলিয়া আছে। রাখাল আরও ভিতরে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু পা আর চলে না—চক্ষু একবারে মুদিয়া আসিল. রাখাল চক্ষু মুদিয়া জগতে লয় পাইতে প্রার্থনা করিল। উন্মত্ত রাখাল প্রেমে উদ্ভ্রান্ত হইয়া আর একবার চক্ষু চাহিল, একদিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া দেখিল, চেলির কাপড় পরা—ও কে? রাখালের জীবনস্রোত আর বহিতে চায় না; রক্তস্রোত নিশ্বাসস্রোত রুদ্ধ প্রায় হইয়া আসিল—জ্ঞানজগতে ঘোরান্ধকার উপস্থিত হইল। রাখাল সেই আঁধারে ভাবিল, ওই বুঝি প্রমীলা?—ওই বুঝি আমার সেই খেলা ঘরের স্ত্রীরত্ন? ওই বুঝি আমার আরামের নিকেতন? রাখাল আত্মবিস্মৃত হইল। আর চক্ষু চাহিবার সাধ্য নাই, আজ তার হৃদয়াকাশের পূর্ণচন্দ্রিকা রাহু কবলে নিপতিতা! রাখাল তাহা কি প্রকারে দেখিবে? কে তার শান্তিনিকেতনে অগ্নি প্রদীপ্ত করিয়াছে? রাখাল সে ভীষণদৃশ্য আর দেখিতে পারে না, রাখাল পাগলের স্থায় সেস্থান হইতে চলিয়া গেল!

এদিকে প্রমীলা অবগুণ্ঠনবতী। বিবাহে না শ্মশানক্ষেত্রে?

প্রমীলা যেন্ যমপীড়নে বাধ্য হইয়া নিকুঞ্জর কাছে বসিয়াছে। প্রমীলা ভাবিতেছে, আমায় জীবন্ত অবস্থায় গোরে দিলে, আগুণে পোড়ালে বাঁচি। প্রমীলার দুঃখ যখন যন্ত্রনার শেষ সীমায় উপস্থিত হইল তখন আর কিছু না ভাবিয়া রাখালের ধ্যানে নিমগ্ন হইল। গরল সমুদ্রের তলে যাতনা ভেদ করিয়া রাখাল রত্ন লাভ করিবার জন্য ডুবিতে লাগিল। এখনও বরের হাতে ক'নের হাত আসে নাই—বিবাহের মন্ত্র উচ্চারিত হয় নাই। কন্যা ও পাত্র বসিয়াছে মাত্র।

এদিকে. রাখাল বাহির বাটি হইতে আবার ভিতর বাটীতে আসিল। অনেক ধৈর্য্যে মনের দুঃখ, আশা, চাপিয়া ধীরে ধীরে, অবনত মুখে সেই ভীষণ আতঙ্কদায়ক বিবাহ-শ্মশানে উপস্থিত হইল। অবগুণ্ঠনবতী প্রমীলার সম্মুখে দাঁড়াইল। একদৃষ্টে যেন দৃষ্টিবলে প্রমীলাকে নাড়িতে লাগিল। শোকে ডুবিয়া, দুঃখে পুড়িয়া. আক্ষেপে বুক ভাঙ্গিয়া, সেই স্বর্ণাবগুণ্ঠনভিতরে কল্পনা বসে প্রবেশ করিয়া যেন আপনার মনশ্চুল্লি হইতে প্রেমাগ্নি-রাশি প্রমীলার প্রেমহৃদয়ে ঢালিতে লাগিল। রাখাল ভাবভরে, নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া আছে ; নয়নের দৃষ্টিতে আপনাকে পরিণত করিয়া প্রমীলার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া তাহার দগ্ধপ্রাণে প্রণয়রস ঢালিতেছে :—

এমন সময়ে হঠাৎ অবগুণ্ঠন ভেদ করিয়া প্রমীলার দুই চক্ষু রাখালকে দেখিতে পাইল। সে অশ্রুভার বিকম্পিতা দৃষ্টি ক্ষণেকের মধ্যে. বিদ্যুতের ন্যায় রাখালের প্রাণে "বজ্রপাত" করিয়া অবগুণ্ঠন মধ্যেই অন্তর্হিত হইল। সে দৃষ্টি স্থির থাকিতে প্রয়াস পাইলেও, দুঃখভারে, যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল প্রমীলার

শরীর থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। প্রমীলা সেই বিবাহ স্থলে মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। "কি হ'ল কি হ'ল" বলিয়া একটা গোলযোগ উঠিল। অনেকে সেই দিকে ধাবিত হইল। প্রমীলার পিতা প্রমীলাকে ধরিয়া তুলিল—প্রমীলা তখনও মূর্চ্ছিতা। দুএক জন স্ত্রীলোক কাঁদিয়া উঠিল। রাখালের তখন মস্তিস্কে হৃদয়ে কি যেন জ্বলিয়া উঠিল—রাখাল অতি কৌশলে পিস্তল বাগাইয়া ধরিল—সম্মুখে বরের মাথা লক্ষ্য করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বন্দুকের ঘোড়া টিপিল—"দুম" করিয়া আওয়াজ হইল। বন্দুকের ধোঁয়া উড়িল—বরের মাথার পাশ দিয়া গুলি চলিয়া গেল। রাখাল তখন কাঁপিতে কাঁপিতে মুর্চ্ছিত হইয়া প্রমীলার কাছে পড়িয়া গেল। যেন রাখালকে কে গুলি মারিল, এই ভাবিয়া কয়েক জন; "সর্ব্বনাশ—হল সর্ব্বনাশ হল,—কে রাখালকে গুলি মারলে" বলিতে বলিতে রাখালকে তুলিয়া ক্রোড়ে ধরিল। তখন রাখালের দাঁতে দাঁত বসিয়াছে। রাখাল একবারে মুর্চ্ছিত—রাখালের কাছে বন্দুক ভূতলে পতিত।

তখন সেই স্থলে একটা ভীষণ কোলাহল উঠিল। "মার মার' "ধর ধর"—ঐ পালাল" এই প্রকারে কত শব্দ উঠিল। তখন একটা হুড়'হুড়ি ঠেলাঠেলি পড়িয়া গেল। মাথার উপরের দুটা লণ্ঠন ভাঙ্গিল। একটা সেজ উলটিয়া পড়িল - কলিকার আগুণ উড়িল, অনেকের জামা কাপড় চাদর পুড়িল। বিবাহ স্থলের বাতি নিবিয়া গেল। স্ত্রীলোকেরা ভয়ে ভয়ে সেস্থান হইতে সরিয়া বাড়ির ভিতরে গিয়া যে যার ঘরে খিল দিল। ছেলেপুলেরা ভয়ে চেঁচাইয়া উঠিল—ঘুমন্ত ছেলে জাগিয়া

কাঁদিয়া ফেলিল। কুকুরগুলা উঠানে—বাহিরে চীৎকার করিতে লাগিল। পুরোহিত একপাশে গিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। বর চুপ করিয়া জড়ভরতের মত বসিয়া থাকিলেন; মাথার কাছ দিয়া যে গুলি ছুটিয়াছিল আদতে বুঝেন নাই। বরযাত্রী ও কন্যা-যাত্রীর কেহ কেহ বন্দুকের ভয়ে সরিয়া পড়িল—দুখানা লুচির লোভে কে প্রাণ হারাইবে? কাহারও সর্ব্বনাশ কাহারও পৌষ মাস, ভাঁড়ার হইতে কেহ কেহ হাঁড়ি পুরিয়া লুচি সন্দেশ লইয়া সরিতে লাগিল। রান্নাঘর খালি দেখিয়া একটা কুকুর উদর পুরিয়া ভাত বেগুন খাইতে লাগিল। বিড়াল মাছের রাশি হইতে মুড়া লইয়া পলাইল; কোনটা বা দুগ্ধের কড়ায় মজা মারিতে থাকিল।

সেই বিবাহ স্থলে, লোকেরভিড়ে, সেই গোলযোগের সময়ে, হঠাৎ একটী তেজস্বিনী মূর্ত্তির আবির্ভাব হইল। সে মূর্ত্তি দেখিয়া সকলের প্রাণে ধাঁধাঁ লাগিল। অনেকে চমকিয়া উঠিল। সেই রমণী মূর্ত্তির ভিতর হইতে একটা জগৎমোহিনীশক্তি আবির্ভূতা হইয়া লোক সকলকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। পরিধান গৈরিক শাটি কপালে উজ্জ্বল সিন্দুর হাতে শাঁখা—আর মুখে চোখে স্বর্গীয় দীপ্তি। ইনি কে? ভগবতী নাকি? অনেকের বুক কাঁপিয়া উঠিল। সেই মূর্ত্তি নীরবে নিকুঞ্জর সম্মুখে প্রমীলার আসনে গম্ভীর ভাবে উপবেশন করিলেন। উপবেশন করিয়া নিকুঞ্জর হাত ধরিলেন—অনিমেষলোচনে রক্তিম চক্ষে অশ্রু-বিসর্জ্জন করিলেন—কাঁপিতে কাঁপিতে পতির চরণতলে লুণ্ঠিত হইলেন। তখন নিকুঞ্জ আপনাকে সেই স্বর্গীয় ভাবে হারাইয়া ফেলিলেন বিবাহ ভুলিলেন—আপনাকে ভুলিলেন কেবল সেই

দুঃখিনী কাদম্বিনীকে হৃদয় প্রাণের সমুদয় শক্তির সহিত ভাবিতে ভাবিতে অশ্রুমোচন করিলেন। এ দিকে প্রমীলার মূর্চ্ছা ভাঙ্গিল, রাখাল জাগিয়া উঠিল। রাখাল দেখিল, বরের সম্মুখে পদতলে লুণ্ঠিতা ওকে? প্রমীলা নাকি?

রাখালের মস্তিষ্ক তখন জ্বলিতেছিল—আরও জ্বলিয়া উঠিল রাখাল আবার মূর্চ্ছিত হইল।

তখন সতী কাদম্বিনী উঠিয়া দাঁড়াইলেন, স্বামীও সঙ্গে সঙ্গে উঠিলেন। তখন স্বামীর মনের সঙ্গে সঙ্গে চেহারাটাও ফিরিয়াছে। স্বামী তখন সতীমন্ত্রে মুগ্ধ অচেতন কথা কহিবার শক্তি নাই। যে স্ত্রীর ডাকে বনের পাখী গাছের ডাল ছাড়িয়া কোলে আসিয়া বসে, সে স্ত্রীর প্রেমে কোন পাষণ্ডস্বামীর হৃদয় বিগলিত না হয়?

কাদম্বিনী জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, স্বামীও কাঁদিতে কাঁদিতে রক্তিম মুখে, রক্তিম চোখে, স্ত্রীর পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। তখন দুজনের ভাবে তেজে যেন ঘর টলমল করিল। সকলে যেন ভেল্কি দেখিল। কেহ একটি কথা কহিতে পারিল না—ভাবা মুখে শক্তিহীন হইয়াই থাকিল। কাদম্বিনী একটি কথা কহিলেন না—কাহারও দিকে একটি বারও চাহিলেন না, সেই বিবাহ সভাকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া স্বামীকে হস্তে ধরিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন।

যাইতে যাইতে কেবল প্রমীলার পিতাকে লক্ষ্য করিয়া এক বার দাঁড়াইলেন, গম্ভীর ভাবে কহিলেন :—

"আমি আমার স্বামীকে লইয়া যাই, রাখালের সহিত প্রমীলার বিবাহ দাও"।

কথার বর্ণে বর্ণে মধু বর্ষিত হইল। সকলের প্রাণ সে কথার প্রেমস্পর্শে গলিয়া গেল। তখন প্রমীলার প্রাণে আশার সঞ্চার হইল, প্রমীলা আশার কান্না কাঁদিল। রাখাল আশায় দীর্ঘশ্বাস ফেলিল, রাখাল লাল চক্ষে কাঁদিতে কাঁদিতে কাদম্বিনীর দিকে ধাবিত হইল। প্রমীলার বাপ রাখালের দুহাত ধরিল, কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "ভয় নাই বাবা! আমি তোমাকেই কন্যা সম্প্রদান করিব"। কাদম্বিনী নিমেষ মধ্যে স্বামীকে লইয়া অন্তর্হিতা হইলেন। তার পর রাখালের সহিত প্রমীলার শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইল। বিধাতার লেখা কে খণ্ডাইতে পারে? গরলে অমৃত উঠিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বিবাহবাটী ছাড়িয়া রাস্তায় পড়িবা মাত্র নিকুঞ্জ অগ্রসর হইলেন, কাদম্বিনী ছায়ার ন্যায় পশ্চাতে পশ্চাতে চলিলেন। তখন নিকুঞ্জর মনের ভিতরে একটা মহাতুফান উঠিবার আয়োজন হইতেছিল। নিকুঞ্জ নীরবে যাদুতে মোহিত হইয়া স্বেচ্ছায় শ্বশুর বাটির দিকে চলিলেন। শ্বশুর বাটীতে পঁহুছিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। শ্বশুরের সেই বিদায় কালীন নিবেদন মনে পড়িল। নিকুঞ্জ কাঁদিতে কাঁদিতে বড় ঘরে উঠিয়া দাওয়ায় বসিলেন। মুখ হেট করিয়া থাকিলেন; চখের জল বর্ষার ধারায় ন্যায় ঝরিতে থাকিল! নিকুঞ্জ লজ্জায় ঘৃণায় অনুতাপে কাদম্বিনীর সহিত একটি কথা কহিতে সাহসী হইলেন না।

কাদম্বিনী স্বামীর পা ধুইয়া দিলেন। আঁচলে স্বামীর চোখের জল মুছাইতে মুছাইতে বলিলেন, "তুমি অমন করিয়া কাঁদিলে চলিবে না, একবার মার ঘরে চল, মাকে একবার পূজা করিয়া আমায় আশীর্ব্বাদ করিবে চল।

নিকুঞ্জর অশ্রুবেগ আরও বাড়িল। স্ত্রী কাছে বসিলেন, স্বামীর গলায় হাত রাখিয়া প্রেমের ঝঙ্কার তুলিয়া কহিলেন, 'তুমি মার পূজা করিলে, আমার এত দিনের পূজা সার্থক হইবে।'

নিকুঞ্জ ভাব সম্বরণ করিলেন—স্ত্রীর বুকে মুখ গুঁজিয়া কম্পিত স্বরে কহিলেন, "কাদম্বিনী! আমাকে তোমার ভাল লাগিবে কি? আমি কত পাপ করিয়াছি—কত লোককে পাপে ডুবাই-য়াছি—আমাকে ভাল লাগিবে কি?

কাদম্বিনীর তখন প্রেমের পাহাড়ে অগ্নি জ্বলিল। স্বামীর মনের ক্ষোভ দগ্ধ করিবার জন্য ধীরে ধীরে শক্তিরূপী ভাষায় কহিলেন, "তুমি আমার দেবতার উপর দেবতা। তোমার পূজা আগে করিয়া মার পূজা করি! মা তাই আমাকে আজ এত কৃপা করিয়াছেন"।

নিকুঞ্জ সে কথায় যেন চমকিয়া উঠিলেন—কহিলেন, এ পাপিষ্ঠকে পূজা করিয়াছিলে? কেন করিয়াছিলে? বলিয়াই অশ্রুবেগে মুখ অবনত করিলেন। কাদম্বিনী কহিলেন," কেন পূজা আগে করিতাম জানি না। যখন মার পূজা করিতাম, তখন মার পদতলে তোমার পায় মত কার পা দেখিতাম? আর কিছু দেখিতাম না। মার পায়ে ফুল ফেলিতে ফেলিতে, তোমার পায়েই যেন সব পড়িতেছে—এরূপ মনে হইত। একবার মার ঘরে গিয়া দেখিবে চল, কয় বৎসরের পূজার ফুল জড় হইয়া রহি

য়াছে। প্রথম প্রথম পূজার ফুল জলে ফেলিয়াছিলাম, কিন্তু এক দিন রাত্রে মা মাথার শিয়রে দাঁড়াইয়া কহিলেন, 'যাঁর পার ফুল তিনি যে দিন ঘরে আসিবেন. সেই দিন, সব ফুল মাথায় করিয়া জলে ফেলিবি। সেই অবধি পূজার ফুল একটি ও জলে ফেলি নাই; সব ঘরের কোণে জড় করিয়া রাখিয়াছি, আর সেই ফুলের এক পাশে মার পিছনে বাবাকে সমাধিস্থ করিয়াছি!

কথা শুনিতে শুনিতে নিকুঞ্জর মোহ হইল। নিকুঞ্জ কাদম্বিনীর বুকে ঢলিয়া পড়িলেন, অনেক্ষণ কাদম্বিনীর বুকে অচেতনের স্থায় থাকিলেন, মাঝে মাঝে হাঁপাইতে হাঁপাইতে দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। তার পর ধীরে ধীরে উঠিলেন—উঠিয়া উৎসাহের সহিত কহিলেন, "মাকে পূজা করিব। ভাল একখানা কাপড় দাও—এ পাপ কাপড় খানা কাল কাহাকেও বিলাইয়া দিও।"

কাদম্বিনী তৎক্ষণাৎ একখানি পবিত্র বস্ত্র আনিয়া দিলেন। নিকুঞ্জ কাপড় পরিয়া মার ঘরে গেলেন। ঘরে গিয়া দেখেন, আসন পাতা, কোষা কুষি, ফুল বিল্ব পত্র সব প্রস্তুত। কাদম্বিনী অনেক পূর্ব্বে সে সব ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন।

স্বামী কালী পূজায় বসিলেন। ভক্তির আবেগে, অনুতাপের তাড়নায়, মার মুখের দিকে তাকাইতে গিয়া মুখ হেঁট করিলেন. মার মুখের জ্যোতি সহ্য করিতে পারিলেন না। মার পার দিকে চাহিয়া অশ্রুমোচন করিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে মার পায়ে ফুল চন্দন অর্পণ করিতে লাগিলেন।

কাদম্বিনী দেবতার নিকট দেবতা দেখিয়া কৃতার্থ হইলেন। স্বামী কালী পূজা করিতেছেন, আর স্ত্রী স্বামীর একপার্শ্বে বসিয়া

মনে মনে স্বামী পূজা করিতে থাকিলেন। সেই কালী মূর্ত্তিতে এত বৎসর ধরিয়া যাঁহাকে দেখিতেছিলেন, তাঁহাকে আজ স্বামী মূর্ত্তিতে প্রকাশিত দেখিয়া ধন্য হইলেন। কাদম্বিনীর পূজা বৃক্ষে, ফুল এত দিন পরে যেন ফুটিয়া উঠিল—এত দিন পরে সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দের স্বামীমূর্ত্তি কাদম্বিনীর দর্শন হইল। আজ কাদম্বিনীর সাধনায় সিদ্ধি হইল—নারী ধর্ম্মের পুরস্কার ঘটিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

কাদম্বিনীর জীবনে নূতন প্রবাহ ছুটিল। কাদম্বিনী রমণী ধর্ম্মের শেষ সীমায় ফুটিয়া উঠিলেন। কাদম্বিনী স্বামীকে ঈশ্বর হইতে এবং ঈশ্বরকে স্বামী হইতে আদতে পৃথক করিতে পারেন না। স্বামীই ঈশ্বর এবং ঈশ্বরই স্বামী। কাদম্বিনী আকাশে যাঁহাকে দেখিতেন, ফলে ফুলে যাঁহাকে অনুভব করিতেন, তাঁহাকে স্বামীতে পূর্ণরূপে প্রকাশিত দেখিয়া স্বামীতেই আপনাকে হারাইয়া ফেলিলেন। কাদম্বিনীর স্বামীনাম ব্রহ্মনাম হইল। স্বামীধ্যান ব্রহ্মধ্যান হইল। স্বামীদর্শন ব্রহ্মদর্শন হইল। স্বামীকথা ব্রহ্ম কথা হইল।

স্বামী যেখানে বসেন সেখানে স্বর্গ ফুটিয়া উঠে—স্বামী যেখান দিয়া চলেন, সেখানকার মাটি কাদম্বিনী মাথায় মাখেন। উঠানে, পথে, স্বামীর পদচিহ্ন দেখিয়া প্রণাম করেন—চুম্বন করেন—তার উপরে কতই অশ্রু বিসর্জ্জন করেন। স্বামী যাহা স্পর্শ করেন তাহাই বৈকুণ্ঠ, তাহাই মহাতীর্থ। স্বামী যে জল

স্পর্শ করেন, তাহাই গঙ্গাজল, স্বামী যে গাছে একবার হাত দেন তাহাই বিল্ববৃক্ষ—স্বামী যে কথা কহেন—তাহাই বেদ বেদান্ত।

কাদম্বিনী আকাশে যে শক্তি দেখেন তাহা তাঁহার স্বামী-শক্তি—যে শোভা দেখেন তাহা স্বামীর চরণধূলি স্পর্শে অত সুন্দর। সূর্য্যে, চন্দ্রে, নক্ষত্রে, জলে, স্থলে স্বামীই আছেন, সেই অনন্ত সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম তাঁর স্বামী ভিন্ন আর কিছুই নহেন।

নিকুঞ্জ কাদম্বিনীর এই ভাবে দিন দিন মাজ্জিত হইলেন। স্ত্রীর সঙ্গে কিছু কাল থাকিবার পর নকু দেবতায় পরিণত হইলেন। স্ত্রীর সতীত্বের বাতাসে স্বামীতে দেবত্বের ফুল ফুটিল, নিকুঞ্জ বাস্তবিক দেবতা হইয়া উঠিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

রাখাল ও প্রমীলার বিবাহের পর, গ্রাম কাদম্বিনীর আকর্ষণে বড়ই আকর্ষিত হইল। কাদম্বিনী মহাসতী—কাদম্বিনী কালীর কৃপাপাত্রী, এইরূপ নানা লোকে নানা কথা কহিতে লাগিল। স্ত্রীলোকেরা ঘাটে মহা আলোচনা করিতে আরম্ভ করিল। বুড়ারা বৈঠকখানায়, যুবারা আড্ডায় কেবল প্রশংসার কথাই কহিতে লাগিল! কেহ বলিল পিশাচসিদ্ধ, কেহ বলিল ঈশ্বরজ্ঞানিক, কেহ বলিল কালীসিদ্ধ। গ্রামে আর দলাদলি থাকিল না। বিবাহের পরদিন বর কনে, বরের মা, মাসি পিসি কনের মা খুড়ী জেঠাই প্রভৃতিতে কাদম্বিনীর বাড়ী পুরিয়া গেল সকলে কাদম্বিনীকে প্রণাম করিল! তার পর কাদম্বিনীর দেব-

ষ্বের কথা চারি দিকে রাষ্ট্র হইল। কাদম্বিনী মাসে দুই একটি কঠিন রোগ রোগীর গায়ে হাত বুলাইয়া আরাম করিলেন। তখন আর কে কোথায় আছে, যে আগে নিন্দা করিয়াছিল সে কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া কাদম্বিনীর পায়ে জড়াইয়া পড়িল। যে গালী দিয়াছিল সে কাঁদিতে কাঁদিতে ক্ষমা প্রার্থনা করিল। অনুপমের মা, পিসি কাদম্বিনীর বাড়ীতে আসিয়া হত্যা দিল। গ্রামের লোক, দূরের লোক; কাদম্বিনীর বাটীর কালীকে তখন জাগ্রত দেবতা ভাবিয়া মহাভক্তি দেখাইতে লাগিল। দুবেলা পূজা আসিতেছে—নৈবেদ্য, কাপড়, ফল মুল, দুগ্ধ—এ সবে পূজার ঘর পুরিয়া যাইতে লাগিল। গরীব, দুঃখীগুলা ভোগের প্রসাদে উদরের জ্বালা থামাইতে লাগিল। পূজার সন্দেশ, আক কলা প্রভৃতি অনেক বালক বালিকার মনস্তুষ্টি করিতে লাগিল। কালী বাড়িতে যে আইসে সেই খাইতে পায়। কেহ লুচী মানসিক করিতেছে—কেহ দুগ্ধ, কেহ পাঁঠা, কেহ পাঁচ আনায় পয়সা কেহ টাকা কেহ সোণা রূপার খাঁড়া। দেখিতে দেখিতে কালীর ইষ্টক নির্ম্মিত মন্দির প্রস্তুত হইল—নাট মন্দির তৈয়ারী হইল। শ্রীধরের সেই ক্ষুদ্র বাটি "মহেশপুরের কালী বাড়ী" নাম ধারণ করিল!

নিকুঞ্জ আপনার সমুদয় বিষয় খুড়ার নামে লিখিয়া দিলেন। স্ত্রীর পবিত্রতায় দেবভক্তির মহিমায় শ্বশুরের ভিটায় কালী সাধনায় প্রবৃত্ত থাকিলেন। \

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

—:[•]:—

কাদম্বিনীদেবীর কক্ষ মধ্যে একখানি প্রকাণ্ড শালের তক্ত পোষ পাতা আছে। তাহার উপর একখানি প্রকাণ্ড কম্বল বিস্তারিত। তদুপরি বড় বড় দুখানি ব্যাঘ্রচর্ম্ম—সুন্দররূপে মার্জ্জিত হওয়ায় অতিশয় সুদৃশ্য। সেই ব্যাঘ্র চর্ম্মাসনে গৈরিক শাটি পরিধানে দেবী উপবিষ্টা। মস্তকের কাপড় উন্মুক্ত থাকায় শিথার সিন্দুর বিন্দুর সৌন্দর্য্য বালসূর্য্যের লোহিত কিরণছটার ন্যায় তেজস্বী অথচ নয়ন মন তৃপ্তিকর। তৈল বিহীন দীর্ঘকেশ রাশি আলুলায়িত ভাবে বৈরাগ্য আভায় গৃহমধ্যে তেজবিস্তার করিয়া কৃষ্ণ চামরের মত পৃষ্ঠদেশে লুটীতেছে।

দেবী চর্ম্মাসনে উপবেসন করিয়া ঝিনিলিত নেত্রে আপনার জীবলীলার পদচিহ্ন দেখিতে দেখিতে অন্যমনা রহিয়াছেন। গভীর স্মৃতিমুখে শত শত পূর্ব্ব জন্মের শত শত দ্বার উদ্ঘাটীত হইয়াছে, দেবী তাহার মধ্য দিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সমুদয় লীলা পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে মানব জীবনে ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতিতে বিভোর রহিয়াছেন। এক আত্মা অবয়ব ধারণ করিতে করিতে কত সূতিকাগৃহ—কত শ্মশান—কত জননী—কত বাল্য যৌবন বার্দ্ধক্য, কত সুখ দুঃখ শান্তি অশান্তিরূপ জীবন সংগ্রামের ভিতর দিয়া আজ এই শেষাবস্থায় পৌছিয়াছেন। দিব্য চক্ষে সে সমুদয় কল্যকার ঘটনার ন্যায় উজ্জ্বল দিবালোক সদৃশ দেখিতে দেখিতে প্রকৃতির জ্ঞান সমুদ্রের অতল তলে মহাতত্ত্বজ্যোতিতে বিভোর হইতেছেন। দেবী ইন্দ্রিয়াতীত জ্ঞান-পথে দাঁড়াইয়া উর্দ্ধপথে

দেখিলেন, আর তাঁহাকে জন্মদ্বার অতিক্রম করিতে হইবেক না, তাঁহার জঠর-যন্ত্রণার পরিসমাপ্তি হইয়াছে—তাঁহার জীবলীলার অন্তভাগে একটী শান্তিপূর্ণ রমনীয় জ্যোতির্ম্ময় ভুবন চক্‌মক্ করিয়া যেন হাসিতেছে। সেই দেশে জ্যোতির্ম্ময় দেহ সকল, সতত গভীর যোগে সচ্চিদানন্দ সম্ভোগে বিভোর। সেখানে আকাশে জ্ঞান—বায়ুতে চিন্তা—বর্ণে কবিত্ব—জ্যোতিতে প্রতিভা—জলে ভক্তি—আগুণে বৈরাগ্য। সেই মানব জীবনের পরপারে আপন স্বামীর ও আপনার চিরশান্তি-নিকেতন অবলোকনে স্বস্থির * হইয়া—মহাতেজে আপনার কেশরাশিকে কণ্টকিত করিয়া, অস্থি সকলকে ফুলাইয়া—জগতের সুধীর ধর্ম্ম স্রোতে মহাশক্তি সঞ্চালিত করিয়া, চক্ষুরুন্মিলনে বাহ্য ও অন্তর্জগতে একাকার করিলেন। একটী স্বর্গীয় জ্যোতি সেই চক্ষু ও দেহ হইতে বাহির হইয়া গৃহালোকের সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি করিল—বাহিরে ধ্যান নিমগ্ন কোন পুরুষের হৃদয়ে অমনি ধর্ম্মস্রোত প্রবলতর হইয়া উঠিল।

তখন নিকুঞ্জদেব, দেবপূজার পর ধীরে ধীরে সেই দেবী-গৃহে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন সেই পবিত্র দেবী-তনু হইতে উষা-লোকের মত এক প্রকার নূতন জ্ঞান-প্রভা ফুটিয়াছে—দুই চক্ষু দুটী জ্ঞান-সূর্য্য-স্বরূপ সতেজে জ্ঞানাগ্নি উদ্গীরণ করিতেছে। সে চক্ষুস্পর্শে আঁধারে আলো—অজ্ঞানতায় জ্ঞান—পাপে পুণ্য জ্বলিয়া উঠিতেছে। নিকুঞ্জদেব দেখিলেন, স্ত্রীর সিঁথার সিন্দুরে পতিভক্তি পতিপ্রেম ফুটিয়া বাহির হইয়াছে—যেমন সূর্য্যে রৌদ্র, চন্দ্রে জ্যোৎস্না—সেইরূপ সতীর সিন্দুরে সতীত্ব ও মাধুরি ফুটিয়া পড়িতেছে।

* আপনাতে স্থির—স্বস্থির।

নিকুঞ্জদেব দেবীর নিকটে যাইবামাত্র, দেবী মৃদুমধুর স্বরে, যেন সমুদয় শাস্ত্রের ঘনীভূত রাগিণীকে সুকোমল কণ্ঠে নিঃসৃত করিয়া বলিলেন "আমার কাছে একটু বোস।"

নিকুঞ্জদেব কাছে বসিলেন। জ্যোৎস্নাময়ী রজনীর পার্শ্বে সূর্য্যালোকপূর্ণ দিবা উপস্থিত থাকিলেন। দেবীর পৃষ্ঠস্বর্গে বামকর সংস্থাপনে অমৃতস্পর্শ করিয়া দক্ষিণ করে দেবীর দক্ষিণ কর-পল্লব ধারণ করিলেন। দেবীতনু স্পর্শ মাত্র পবিত্রতার প্রবল বন্যায় নিকুঞ্জর জীবন-স্রোত পরিপ্লুত হইল; স্বর্গীয় গন্ধে, স্বর্গীয় সঙ্গীতের তালে যেন তিনি বিভোর হইয়া পড়িলেন। দেবীর মুখনিঃসৃত বাক্য তখনও গৃহমধ্যে স্বর্গসঙ্গীতের সুর বর্ষণ করিতেছিল। নিকুঞ্জর চক্ষু বৈরাগ্য প্রেম ও জ্ঞান তেজে প্রজ্বলিত হইল—সমুদয় অবয়ব ভক্তিতনু-স্পর্শে কণ্টকিত হইয়া উঠিল। সাধুস্বামী সাধ্বী স্ত্রীর উন্মাদক স্বর্গ সহবাসে, প্রেম-ভারে অভিভূত হইয়া, দেবীকে এক দৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতে করিতে সেই ধর্ম্মজ্যোতিতে আপনাকে হারাইতে থাকিলেন।

নিকুঞ্জদেব আজ স্ত্রীর অপূর্ব্ব শ্রী, অপূর্ব্ব তেজ, অপূর্ব্ব পাপ-নাশী ধর্ম্মদৃষ্টি দর্শন করিয়া মনে মনে ভাবিলেন "আজ আমায় সতীহারা হ'য়ে মহাদেবের মত পাগল হ'তে হবে নাকি? হঠাৎ জগৎ শ্রীভ্রষ্ট হবে বলে বোধ হচ্ছে কেন?"—ভাবনার সহিত দু বিন্দু অশ্রু পতিত হইল। দেবী তদ্দর্শনে আপনার গাম্ভীর্য্য মধ্যে মৃদু হাসিয়া, পতির গলদেশে দক্ষিণ কর স্থাপন করিলেন। বলিলেন, "আজ যদি সতীহারা হও তো ভাবনা কি? আমি স্বর্গে গিয়া ঘর পরিষ্কার করিয়া শান্তি শয্যা বিছাইয়া রাখিব, আর তুমি এই পুরাতন বস্ত্রখানা ছাড়িয়া সূক্ষ্ম বস্ত্রে সেখানে গিয়া আমার

উপসংহার।

পাঠক পাঠিকা! পুনর্জ্জন্ম মানেন কি? যদি মানিতে কিছু আপত্তি থাকে তো শেষের কথা কটা পড়িবার দরকার নাই। আর যদি হিন্দুর সে বিশ্বাসটুকু থাকে তো "অবলা বালা"ই "কাদম্বিনী" এবং যোগেশই "নিকুঞ্জ" রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন—এ কথাটা মনে করিলে "অবলাবালা" ও "কাদম্বিনী" চরিত্রের সংযোগে একটা সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিয়া কাব্যামৃত পানে মোহিত হইবেন এবং মনে মনে ভাবিবেন :—

"Our birth is but a sleep and a forgetting;
The soul that rises with us, our life's star
Hath had elsewhere its setting
And cometh from afar,

(Wordsworth.)

বাসাংসি জীর্ণানি যথাবিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥

(গীতা অং ২, শ্লোক ২২।)

সমাপ্ত।

আমার প্রণীত পুস্তকঃ—

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস ... ... ১৲

বড় বউ বা সুধা বৃক্ষ (৩য় সংস্করণ) ... ... ।৹

সহমরণ (৪র্থ সংস্করণ) ... ... ১৲

অবলাবালা (নূতন সংস্করণ) ... ... ১।৹

উপন্যাস মালা (৩য় সংস্করণ) ... ... ।৹

শকুন্তলা (কালিদাসের সমস্ত ভাব বজায় রাখিয়া উপন্যাসিত) ।৹

হিন্দু-তত্ত্ব বোধিনী (হিন্দু ধর্ম্মের বড় বড় কথার দার্শনিক আলোচনা) (যন্ত্রস্থ) ১৲

আমার ঠিকানা :—

শ্রীসত্যচরণ মিত্র।

হিন্দু ধর্ম্ম-প্রচারক।

বরাহনগর।

কলিকাতা।